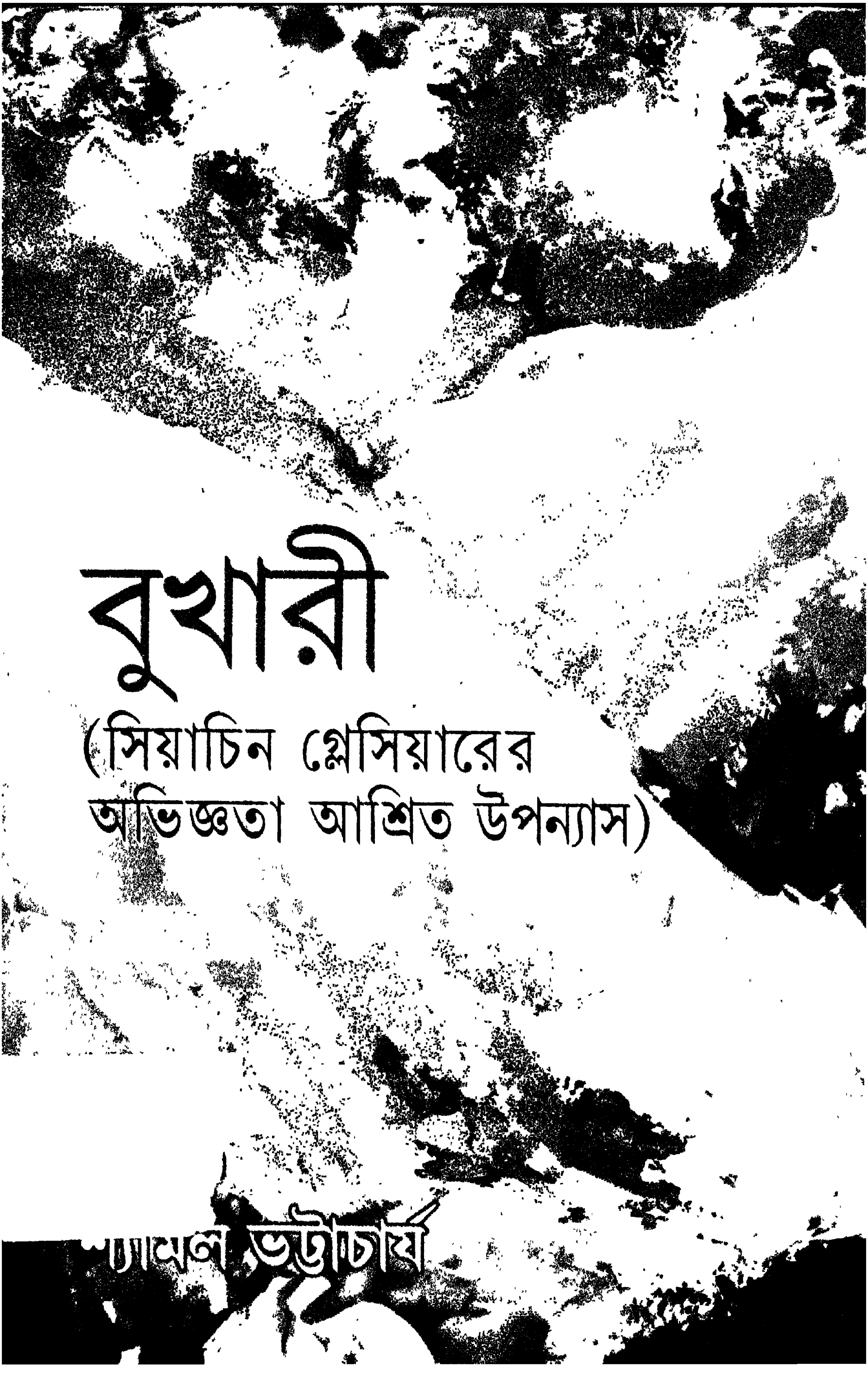


বুখারী

(সিয়াচিন গ্লেসিয়ারের অভিজ্ঞতা আশ্রিত উপন্যাস)

শ্যামল ভট্টাচার্য

বুখারী

(গ্রেসিয়ার যুদ্ধের রূপকথা)

শ্যামল ভট্টাচার্য

অক্ষর পাবলিকেশনস্
প্রধান কার্যালয় ঃ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

Bukhari
(A patriotic novel by
Shyamal Bhattacharja)

ISBN- 81-86802-64-9

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৭

প্রথম অক্ষর সংস্করণ
জানুয়ারী ২০০৩
কলকাতা বইমেলা

প্রচ্ছদ
মনোজ ঘোষ

টাইপ সেটিং ও মুদ্রণ
ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা এবং ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র ঃ অক্ষর সেলস্ কাউন্টার, প্যালেস কম্পাউন্ড, প্রেস ক্লাব রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা
কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান ঃ ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২
সার্বিক যোগাযোগ
অক্ষর পাবলিকেশনস, জে. বি. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা
দূরভাষ □ ২৩০-৭৫০০, ২৩২-৪৫০০, *email : raixxxx@.dte.vsnl.net.in*

মূল্য □ ৭৫ টাকা

উৎসর্গ

আমার ব্যক্তিত্বময়ী মা

ও

তাঁরই মতন

সমস্ত শান্তিকামী মানুষদের উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য বই

গল্পগ্রন্থ ঃ

চিলতে দাগ (১৯৮৩)

ফুলমতির বসন্তকাল (১৯৯৪)

জামিছলঙ (১৯৯৯)

উপন্যাস ঃ

বুখারি (১৯৯৭)

ঐ হিন্দী অনুবাদ (২০০২)

ঐ পাঞ্জাবী অনুবাদ (যন্ত্রস্থ)

লোদ্রভার কাছাকাছি (যন্ত্রস্থ)

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ

ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার (১৯৯৯)

অনুদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ

সমকালীন পাঞ্জাবী গল্প (২০০২)

কোন ভোরে বোঁচকা খুলি - কর্তার সিংহ দুগ্গল (২০০৩)

কুমারী হরিনীর চোখ — মোহন ভাণ্ডারী (২০০৩)

❑ কিস্ মিট্টি কে বনে হো চিড়িয়া !

গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে আকাশে ওড়ে গজরাজ। রূপালি ডানা মেলে দ্রুত উড়তে থাকে। সিমলা পাহাড়ের আকাশে তখন ঘন সাদা নিচু মেঘ। বিশাল পাখিটার পেটে ১৮০ জন তাগড়া সৈনিক। সিমলা পেরিয়ে আরো উঁচুতে উঠে গেলে সকালের আলো উজ্জ্বল হয়। পূর্ব দিগন্ত থেকে সূর্যের প্রখর কিরণ আকাশকে রাঙিয়ে দেয়। রঙিন মেঘমালা ছাড়িয়ে ক্রমে অনেক উঁচুতে একদম সোনালি মেঘে পাখিটা ডানা ছোঁয়ায়। তখন নিচে কুলু মানালির আকাশ। হিমালয়ের সারি সারি শৃঙ্গগুলি জেগে থাকে রঙিন মেঘের সমুদ্রে বিশাল ঢেউয়ের মতন। এমনি চলতে থাকে প্রায় আধঘন্টা।

তারপর ধীরে পাখিটা আবার পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যায়। এখন চারিদিক ধূ-ধূ সাদা। লাদাখ রেঞ্জ আর জাঁসকর পর্বতমালার উঁচু উঁচু শৃঙ্গের মাঝে এক ধূসর উপত্যকা। ছোট ছোট বাড়িঘর-পথঘাট-সিন্ধুনদের নীল শরীর। সরু কালো পিচের রাস্তাগুলিতে খেলনার মতন কিছু রঙিন গাড়ি।

পাখিটার পেট থেকে কুড়িটা চাকা বেরিয়ে আসে। তখনই ও জানালা দিয়ে এক ঝলক দেখতে পায় পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু বিমানবন্দর। হেঁড়ে গলায় ফৌজি ঘোষক মাইকে বলে, বাইরে তাপমান এখন মাইনাস সাত দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস! জ্যাকেটের পকেট থেকে কানঢাকা টুপিটা বের করে পরে ও। জ্যাকেটের চেন গলা অব্দি টেনে গ্লাভস দু'টি হাতে পরে। রানওয়ে ছোঁয়ার পরই একটা ঝাঁকুনি। তারপর শব্দের পরিমাণ কমে যায়। টারম্যাকে পৌঁছুতেই পেছনের ডালাটা খুলে যায় ধীরে। যন্ত্রপাখি আই এল ৭৬ এর দু'টো ইঞ্জিন থেমে গেলেও বাকি দুটোর আওয়াজ ডানা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লাগিয়ে দেয়। এখন ও দুটোও থেমে যাবে।

স্যুটকেস, ব্যাগ, বেডিং নিয়ে ধীরে ধীরে ও অন্য সৈনিকদের সঙ্গে লাইন দিয়ে নিচে নামে। টারম্যাকে থ্রি টনার ট্রান্সপোর্ট দাঁড়িয়ে। রানওয়ের কিনারায় জমে থাকা বরফে জুতোর চাপ পড়তেই ও শিউরে ওঠে। শরীরে কয়েকপ্রস্থ গরম কাপড়। শুধু গালদু'টি আর নাকের ডগা এক অভূতপূর্ব ঠাণ্ডায়।

ট্রান্সপোর্টের পেছনে মালপত্র চাপিয়ে নিজে উঠে বসতেই হাঁপানির মতন শ্বাস ফুলে উঠতে থাকে। গলা দিয়ে হাক্স ফাক্স ধরণের শব্দ বেরোতে থাকে। অলোক ঘাবড়ে যায়। কাউকে চেনে না ও। মনে হয় চারিদিকে শূন্যতা। সাদা বুদবুদের ভেতর কালো বেয়নেটের মতন কিছু মাথায় ঢুকছে। ঢুকেই যাচ্ছে। সে এখন কী করবে? অলোক অন্ধকার দেখে। যন্ত্রণায় হাত শূন্যে তুলে ডুবতে থাকা মানুষের মতন আর্তনাদ করার আগেই টের পায় একজন ওর বুকে ম্যাসাজ করছে। অন্যজন পিঠে হাত দিয়ে ঘষে। একজন ফ্লাস্ক থেকে গরম জল খেতে দেয়। ও আবার চোখ বন্ধ করতেই দেখে বেয়নেট ফিরে যাচ্ছে সেই সাদা গোলকে। গোলকটাও বুদবুদের মতন মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখ মেলে বুঝতে পারে ও দমবন্ধ হতে হতে বেঁচে গেছে। গাড়িটা চলতে শুরু করে। তিনজনই ওকে ধরে থাকে। হাত পায়ের পেশীগুলি থির-থির করে কাঁপতে থাকে। ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়। সরোজ কুমার ঝা ওর ডানপাশে বসে। পেছনে দাঁড়িয়ে ভিনোদ কুমার। আর বাঁপাশে

দাঁড়িয়ে তখনও ওর বুক ম্যাসাজ করছে সার্জেন্ট নন্দ সিং। ওরা সবাই ছুটি থেকে ফিরেছে। অলোক বাইরে তাকায়। সারি সারি আর্মির ব্যারাক রাস্তার ডানপাশে। ব্যারাকগুলির ছাদ থেকে নল দিয়ে বেরোনো কালো ধোঁয়া সাদা পরিবেশকে বিদেশী ছবির কারখানা এলাকার মতন করে দিয়েছে। যদিও গাড়ির ইঞ্জিন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

বিলেটের সামনে ওদেরকে ছেড়ে গাড়িটা ভারি শব্দে চলে যায়। তখন দুই লাদাখি কিশোর দু'টো কেরোসিন ব্যারেল এক-এক করে সিঁড়ি ভেঙে নামাচ্ছে। ওরা বিলেটে ঢুকতেই হৈ-হৈ করে এগিয়ে আসে কয়েকজন। হাতে-হাতে ওদের মালপত্র যথাস্থানে চলে যায়। একটি চোঙাকৃতি পাত্রের চারপাশে পাতা স্টুলে গেজেগুঁজে বসে পড়ে সবাই। এখানে উষ্ণতা। এই পাত্র থেকে একটা সরু চোঙ উঠে গেছে সিলিং-এর ফাঁক দিয়ে। ছাদের উপর কালো ধোঁয়া। ট্রান্সপোর্টে আসার সময় এই ধোঁয়া-ই ও দেখেছে! এই তাহলে বুখারি! জানালার শিকের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি জেরিক্যান থেকে রাবারের পাইপ আগুন জিইয়ে রাখে। অসুস্থ মানুষের ধমনীতে যেমন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত কিম্বা সেলাইন। ওরা হাত সেঁকে। একজন মগে করে চা দেয়। চা খেয়ে শরীর গরম হয়ে যায়। বেশ ভাল লাগে। এতক্ষণে মনে হয় বেঁচে আছে।

তখুনি বিকট শব্দে বিলেটের ফ্লোর ও কাঁচের জানালা কাঁপিয়ে যন্ত্র-পাখিটা উড়ে যায়। আর্মির ব্যাকলোড নিয়ে চণ্ডিগড় ফিরছে। অলোকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। মা-বাবা-ভাই-বোন ও প্রিয় শহর ছেড়ে যেদিন প্রথম বেলগামের ট্রেনিং সেন্টারে পৌঁছোয় সেদিনও কি এমনি লাগছিল? হঠাৎ করে অনেক মানুষের মাঝেও নিজেকে ভীষণ একা মনে হয়।

হঠাৎ চোখে পড়ে সামনের স্টুলে বসে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মিটমিটি হাসছে একজন। ওর সঙ্গে একটু আগেই অলোক হ্যাণ্ডশেক করেছে। তখনই চেহারা ও দৃষ্টি চেনা চেনা লাগছিলো। কোথায় যেন দেখেছে। এখন ওকে এমন মিটিমিটি হাসতে দেখে হঠাৎ স্মৃতির জানালা খুলে যায়। জয়ন্ত না? আলোকের চোখে বির্দ্যুৎ খেলে।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে মুচকি হাসে। যার আবেগ গাঢ় আর উল্লাস অনন্ত সেই এতটা মাথা নেড়ে কথা বলে। —শালা, চিনতে এতক্ষণ লাগলো!

— তোকে এরকম গোঁফদাড়িতে কল্পনাও করা যায় না যে-রে! কেমন করে চিনবো?

— তুইও তো অনেক পাল্টে ছিস! আমি কিন্তু চিনেছি! — হা — হা এয়ারফোর্সে হাফপ্যান্টের বন্ধু যে! অলোক দারুণ খুশি হয়। সেই কণ্ঠস্বর, সেই হাসি— এত বছর পর — ভাবাই যায় না — সশব্দে হাসে অলোক। স্মৃতির ঘরে অতীত জেগে ওঠে। কদম-কদম বাঢ়ায়ে যা! একসঙ্গে হাজার ঘন্টা প্যারেড আর ড্রিল শেখা। একসঙ্গে জঙ্গল ট্রেনিং। সেই নৃশংস ড্রিলশিক্ষক কারপোরাল মুখুর মুরগা ওরা। কয়েকশো ঘন্টা ফ্রগজাম্প রোলিং কিম্বা ক্রোলিং-এর বীভৎস সব স্মৃতি! তখন ওরা সবে কৈশোর পেরিয়ে এসেছে। স্কুল আর বাড়ি-ঘরের গল্প প্রায়ই কান্নার মতন। পরস্পরের মাঝে দোলনায় দুলতে থাকে ভাললাগা কোন রূপসীর গল্প। একের ভাললাগা কন্যা অনায়াসে অন্যের স্বপ্নে ঢুকে যায়। চোখে না-ই বা দেখলো তাকে!

নতুন শহর নতুন জনপদ তার উচ্ছলতম যুবতী সম্পদ নিয়ে পরিবেশিত হয়। কত সাধ,

কত গোপন ইচ্ছা ! পাশাপাশি শাসনের রক্তচক্ষু। ঘন্টার পর ঘন্টা লাগাতার শাস্তি। কনুই এবং হাঁটুর ছড় উঠে রক্ত মিশে যায় বেলগামের পাথুরে লাল মাটিতে। লাল-মাটি ঢুকে যায় শরীরে। মাথা ঘোরে। বমি হয়। একে অন্যের শুশ্রূষা করে সুস্থ করে। এমনি করে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে সংঘাতে পেটানো লোহার মতন হতে থাকে একেকজন। কিছুদিন পর সব গা-সওয়া হয়ে যায়। সব রকম শারীরিক কষ্ট থেকে একটা আলাদা স্বাদের আনন্দ নেয়ার ক্ষমতা ওরা অর্জন করে। আজ এতবছর পর জয়ন্তকে পেয়ে ওর সেই সব স্মৃতি জেগে ওঠে।

গল্পে গল্পে দুপুর গড়িয়ে যায়। বিকেলে স্পেশাল ক্লদিং ইস্যু হয়। স্টোর থেকে কাঁধে করে দশ পা হেঁটে বিলেটে ঢুকেই আবার দমবন্ধ হবার জোগাড়। আবার সাদা গোলক তা থেকে বেরিয়ে আসা কালো সঙ্গিন ক্রমে লম্বা হয়ে ছুটে আসতে থাকে ওর দিকে। ও বিছানায় লম্বা হয়ে যায়। জয়ন্ত বুকে ম্যাসাজ করতে থাকে। সরোজ গরম জল এনে খাওয়ায়। জয়ন্ত চোখ বড় করে বলে, একদম মস্তানি না, পাঙ্গা নিলেই মরবি এখানে! সাবধানে থাক! এক্লিম্যাটাইজেশান হতে তিন-চারদিন লেগে যাবে।

সন্ধ্যায় ও কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে। প্রিয়তমা, ...প্রাকৃতিক কোন শব্দ ছাড়া যে এত বিশাল প্রকৃতি থাকতে পারে আমার জানা ছিল না। শুধু কঠিন পাথর, ধূ ধূ বরফ আর বরফচাপা বালি। ঠাণ্ডায় গাছপালা সব মরা খাম্বার মতন দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে একা একা। একটা একটা করে পাখা ওদের শরীর থেকে খসে পড়ছে। শুধু স্মৃতির মতন শুকনো পাতা ওড়ে। কোন পাখি নেই। অন্ততঃ আমি দেখতে পাই নি এখনো। শুনতে পাইনি কোন কলকাকলি।

বিমানবাহিনীর প্লেনে উঠতে নিজের মালপত্র কাঁধে নিয়ে চলতে হয় সে জ্ঞান ছিল না বলে এত ভারি ট্রাংক এনেছিলাম। চণ্ডিগড়ে কিছু সহকর্মীর কাছে শুনি গ্রীষ্ম ছাড়া পড়াশোনা অসম্ভব। বইয়ের ট্রাংকটা এক বন্ধুর ঘরে রেখে এসেছি!

এটুকু লিখে অলোক উদাস তাকায়। ট্রাঙ্কটা ওর বহুদিনের সঙ্গী। একটা-একটা করে বই কিনে জমিয়েছে। অনেক এয়ারম্যানের মতন অলোকও অবসর সময়ে পড়াশুনো করে। আজ ট্রাঙ্কটা রেখে এসে বেশ কষ্ট হচ্ছে। এখন আর লিখতে পারে না। চিঠি ও কলম ডায়েরিতে ঢুকিয়ে ব্যাগে রেখে দেয়। আজ আর কিছুই পারবে না ও। দুপুরে বিশেষ কিছুই খেতে পারেনি গা গুলোনোর জন্যে। এখন মাথা এবং গায়ে ব্যথা। অক্সিজেন স্বল্পতার জন্যেই নাকি এসব হচ্ছে।

পরণে লুঙ্গি নেই। একযুগেরও বেশি সময় ধরে ওর ঘুমের সঙ্গে লুঙ্গির ভালবাসা। এখন উলের ইনার। কেমন আষ্টেপৃষ্ঠে নিম্নাঙ্গ সাপটে রয়েছে ইনারটা। চুলকাচ্ছে পা ও উরু। চুলকাতে-চুলকাতে হঠাৎ না জানি কেন কেঁদে ফেলে অলোক। অন্তরার চেহারা ভাসে চোখে। আজ ও পাশে নেই। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে বুকটা। এক অব্যক্ত অস্বস্তিকর সময়ের পিঠে চেপে স্ত্রী অন্তরা ও আত্মজা তোড়াকে নিয়ে ঘন্টাখানেক আকাশ-পাতাল সফরের পর একসময় ঘুমিয়ে পড়ে ও।

স্কুলের সামনে মন্টুর আইসক্রিম। জোড়া পাঁচ পয়সা— লালা ও সাদা। চুষতে চুষতে কাঠির একপাশে বরফ ঝুলে পড়তেই লেইজার সমাপনের ঘন্টা বাজে ঢং ঢং। সুযোগ পেলেই কোন সহপাঠি বা সহপাঠিনীর জামার কলার গলিয়ে বরফ ঢুকিয়ে দেয় অলোক। শুরু হয়ে যায়

ছটফট তিড়িং বিড়িং হা-হা উল্লাসে ছোটে ও। —বদমাইশ কোথাকার! নিজের পিঠেও এমনি অনেকবার—

বরফ প্রীতিটা কিন্তু অনেক পরে জন্ম নিয়েছে। উনিশ'শ আশির পরই প্রথম দূরদর্শন দেখেছে অলোক। সাদা কালো স্ক্রিনে বরফের দেশে কুকুরের স্লেজ নিয়ে অভিযানের এক বিদেশী সংবাদচিত্র। সেই থেকে একটা ফ্যানটাসি ওর নিজস্ব গোপনে লালন করে। সিনেমায় দেখা সিমলা ও শ্রীনগর, সঙ্গীত ও প্রেম; বদলির আদেশ পেয়ে উষ্ণ গ্যাসে সেই বেলুন ভরে ওঠে। ফুলে ফেঁপে ওকে নিয়ে উড়ে চলে আকাশে। সেই থেকে প্রতিটি মিনিট অন্যতর। ভাল লাগে, কি লাগে না, নিজেই জানে না। শুধু অবাক বিস্ময়ে গহণ করে সময় ও প্রকৃতির কারুকার্য।

বাথরুমে একটা অ্যালুমিনিয়ামের গামলায় সবসময় জল ফোটে। খাওয়া স্নান সব ঐ থেকেই। ও একবার বালতি করে পায়খানায় ঠাণ্ডা জল ঢালতে যেতেই সরোজ রে-রে করে ওঠে, বরফ জমে ব্লক হয়ে যাবে যে!

— ওখানেও গরম জল ঢালতে হবে? অলোক অপ্রস্তুত।

— জী হা! সরোজ হেসে বলে, এজন্যেই এখানে ফ্ল্যাশ সিস্টেম করা হয়নি!

চিঠি লিখতে বসে বারবার কলম থেমে যায়। বুখারির উপর গরম করে তবেই আবার লেখা যায়। তাপমান মাইনাস এগারো দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস। শরীরে ঠাণ্ডা লাগে, অথচ মন মেনে নেয় না যে এত কম তাপমানে আছে। অবিশ্বাস্য!

চারপাশের পাহাড়গুলিতে বরফের চাদর আর প্রতিফলিত সূর্যালোক এক উজ্জ্বল রোদের জন্ম দেয়। চোখ ধাঁধানো। প্রতিদিন তাপমান কমছে। বরফের চাদর ক্রমে পাহাড় থেকে উপত্যকায় ঘন হয়ে সাম্রাজ্য প্রসারিত। দু'দিন আকাশ পরিষ্কার তো চার-পাঁচদিন ঢাকা। দিনরাত ঝিরিঝিরি তুষার-বৃষ্টি। এক স্বপ্নের দেশ যেন। কেমন ঘোরের মধ্যে কাটছে দিনরাত। উপত্যকায় কোন গাছেই আর সবুজ পাতা নেই। গাছেরা সমস্ত রস কাণ্ডে ধরে রাখতে চায়। পাতা থেকে কোন রস যাতে বাষ্প হয়ে না যায় সেজন্যে সব জল টেনে কাণ্ডে জমা রাখে। পাতারা হলদে, ফ্যাকাশে হলদে হতে হতে ক্রমে ধূসর বাদামি হয়ে যায়। জোরে বাতাস বইলে একসময় ঝরে পড়ে। উড়ে যায়। গাছেরা এখানকার লাদাখি তিব্বতীদের মতনই শুধু কাণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে উষ্ণ সুদিনের। এমনি অপেক্ষায় মাসের পর মাস পেরিয়ে যায় অনেক কষ্টে। শিশুরা বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কৈশোর-যৌবনের অপেক্ষায় থাকে।

অলোক মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে হিমবাহে যাওয়ার জন্যে। এখানে স্ট্রাটেজি বুঝে নিতে হবে; যতটা ওর জানা প্রয়োজন। কী কৌশলে পূর্ববর্তীরা লড়াই করেছে, বর্তমান কৌশলই বা কী? কী ধরণের আক্রমণের প্রতি আক্রমণ কী রকম হবে! শত্রুসৈন্যের অবস্থান এবং অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষমতা — আরও কত কী! প্রতিদিন ক্লাশ অ্যাটেন্ড করছে। সত্যিকারের যুদ্ধে যেতে পারার আবেগে ও ডুবে আছে। এক অদ্ভুত উত্তেজনা সবসময় আরো একাগ্র করে তোলে। সামনে বিশাল কুরুসৈন্য। মনে হয় এতদিনে সৈন্যদলে নাম লেখানো সার্থক হতে চলেছে। ছোটবেলায় পরস্তাবে শোনা ও পরে বইয়ে পড়া সমস্ত যুদ্ধের স্মৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

চারপাশ সাদা। ক্রমাগত ঘন তুষারবর্ষণ। পাহাড়গুলি কোথায় শুরু, কোথায় শেষ, প্রেক্ষাপটে কোথায় আকাশ, কিছুই বোঝা যায় না। তাপমান মাইনাস উনিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল থেকেই বুকে একটা ব্যথা। তোড়ার কথা এত বেশি মনে পড়ে!

দুপুরে একটা আজব পাখির ডাক শুনতে পায় ও। দু'বার শোনার পর বাইরে বেরোয়। কোথায় পাখিটা? দোয়েলের শিস্ আর কোকিলের কুহু মিশ্রিত এক করুণ ডাক। বিলেটের ছাদ, কার্নিশ, গার্ডরুমের দেওয়াল, চারপাশে আতিপাঁতি খুজেও পাখিটাকে পায় না। অথচ খানিক বাদে বাদেই পাখিটা ডাকছে। বিলেটে ফিরে সবাইকে বলে কথাটা। কেউই বিশ্বাস করে না। তবু সরোজ ও জয়ন্ত বাইরে গিয়ে দেখে এসে বলে, ধুস্!

সেদিন সন্ধ্যায় ওর অস্থিরতা চরমে পৌঁছায়। হাত থেকে পড়ে চারটে সুন্দর কাচের গ্লাস ভেঙে যায়। ছটফটানি দেখে জয়ন্ত বলে, অস্থির হোস্ না, কাল থেকে চল হাঁটতে যাব, দেখবি ভাল লাগবে। সব সময় যুদ্ধ নিয়ে ভাবিস্ না! — তুই বললেই কি, না ভেবে পারবো, রে? তুই পারিস? যুদ্ধ তো চলছেই! ওর কথায় জয়ন্ত'র দৃষ্টি আরো করুণ হয়ে যায়।

তখন বিলেট সাজানো চলছে। সবার বাক্স একলাইনে লাগিয়ে সাদা কাপড়ে ঢাকা। সরোজ রুম-রিফ্রেশার স্প্রে করে। প্রাত্যহিক বোঁট্কা গন্ধটা থেকে সাময়িক মুক্তি। মনটাও একটু তারতাজা হয়ে যায়। যদিও এই প্রচেষ্টা মৃতদেহের পাশে ধূপকাঠি জ্বালানো বা কোলন ছিটানোর মতনই সাময়িক গন্ধমুক্তির চেষ্টা মাত্র তবু ....! ভিনোদ সাজায় সারি সারি কাচের গ্লাস আর নানা জাতের মদের বোতল। ককটেল হবে। আলু, পেঁয়াজ, ডিম আর লঙ্কার পাকৌড়া, বাদাম-ভাজা, চানাচুর এবং সফ্‌ট ড্রিংক্স। চারপাইগুলিকে বুখারির চারপাশে রেখে বসার ব্যবস্থা। একটা গোল কাচের পাত্রে সাহেব-মেম কোমরে হাত দিয়ে ধীরগতিতে বল নাচে। দেওয়ালে সাঁটা সামান্থা ফক্সের ন্যুড ছবিতে আলোর ফোকাস। এই আলোক-সম্পাতে মেয়েটি দারুণ খুশি। এয়ারম্যানরা যতবার আলোকিত শরীরের ভাঁজে ভাঁজে চোখ রাখে সামান্থা আরো প্রস্ফুটিত হয়। হাসির মানে পাল্টে যায় মুহূর্মুহু। এই ব্যাপারটা অলোক বেশ উপভোগ করে। মনে মনে শিহরিত হয় বারবার।

কমান্ডিং অফিসার ঢুকতেই নন্দ সিং সমস্ত আলো নিভিয়ে দেয়। শুধু অনির্বাণ টেবিল ল্যাম্প। মাদক আলোয়— চিয়ার্স! সবকটা গ্লাস শূন্যে, একত্রিত ছলক। সামান্থা ফক্সের শরীরে আলো জ্বলে ওঠে। সবাই প্রথম চুমুক দিতেই জ্বলে ওঠে ঘরের বাকি আলো। শুরু হয় নানা ভাষার নানা সুরের গান। তারপর শায়েরি।

কারপোরাল সরোজ কুমার ঝা ওরফে 'বব্‌লা' এই জমায়েতের একমাত্র শায়ের। সবাই উৎকর্ণ। সরোজ ইজাজৎ চাইলে সমস্বরে বলে, ই-র-শা-দ্! সরোজ মহ্‌ফিলি কায়দায় আদাব করে শুরু করে, ইস্ মহ্‌ফিল মে কোই তরহ্ কে লোগ পীতে হ্যায়, / কুছ্ খুশিয়া মনানে কে লিয়ে,/ কুছ গম ভুলানে কে লিয়ে / তুম কিস্ মিট্টি কে বনে হো বব্‌লা, /জো পীতে হো অপনে গম মে ডুব জানে কে লিয়ে— বাহঃ বাহ্, বাহ্ শায়ের বব্‌লা — সমস্বর উৎসাহে সরোজ বলে, — অব মেঁ মীর তঁকী মীর কী নর্জম পেশ করতা হুঁ!

সবাই একসঙ্গে বলে, — 'ই-র-শা-দ!"

সরোজ বলে, — "সাজ্জিশে দিল জ্বলাভরা মন সে মুফ্‌ত গলতে হ্যায়ঁ,
দাগ, জেইসে চিরাগ জ্বলতে হ্যায়ঁ!
ইস্‌ তরহ্‌ দিল গয়া কি হম অব তক,
বেইঠে রোতে হ্যায়ঁ, হাত মলতে হ্যায়ঁ।
ভরী আতী হ্যায়ঁ আজ ইয়ুঁ আঁখে,
জেইসে দরিয়া কহী উবলতে হ্যায়ঁ।"
— এই শের শুনে মনে হচ্ছে সরোজ ভীষণ দুঃখী মানুষ।

পেটে মদ ঢুকলে বিরহের তিরতিরে নদীতেই প্লাবন এসে দুঃখের সাগর হয়ে যেতে পারে।

এবার ভিনোদ কুমারের পালা। সে সবাইকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করে, —

"সগরী রেইন মোটে সংগ্‌ জাগা,
ভোর ভই তো ভাগন লাগা,
কা সখি সাজন?
কা সরিত ...." সে সবার দিকে ভ্রূ তুলে তাকিয়ে রহস্যজনক হাসে। তখনই সরোজ ঝট করে জবাব দেয় — 'চিরাগ! রাত-ভর জলকর সুবহ্‌ বুঝ গয়া!"

ভিনোদ মাথা নেড়ে, পরের ধাঁধা জিজ্ঞেস করে, —

"বিসোঁ কা সির কাট লিয়া

না জান গয়ী, না খুন বহা।" এই ধাঁধা শুনে সবাই থ'। কারো গালে হাত, কেউ বা মাথা চুলকোয়। কমাণ্ডিং অফিসারও বালকাঁলোভার নীচে আঙ্গুল ঢুকিয়ে গোপনে মাথা চুলকান। কিছুক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধ বিলেটে সবার শ্বাসের শব্দ আর কারো-কারো মদের গ্লাসে মৃদু চুমুকের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। তখনই হঠাৎ জয়ন্ত বলে ওঠে,— "নখ, নাখুন!"

ওর জবাব শুনে সবাই হাততালি দেয়।

এরপর সার্জেন্ট বান্‌সল হিন্দীতে 'কাকা হাহরসী'র কিছু হাস্য-কবিতা শোনায়। কাকীকে নিয়ে লেখা এই কবিতাগুলি ভীষণ মজার। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার উপক্রম হয় কারো কারো। কত সরল ভাষায় সমাজকে নগ্ন করে এই ব্যঙ্গগুলি লিখেছেন কবি। নন্দ সিং নিজে সর্দারজী। সে সর্দারদের বোকামির জোকস্‌ শোনায়। জয়ন্ত শোনায় মুকেশের গাওয়া কয়েকটা হিন্দি গান। হৈ চৈ হাঙ্গামায় সাড়ে দশটা বাজতেই আলো নিভে যায়। দিলকুমার ও নন্দ সিং তখন ছোট শ্রীরাম হোণ্ডা জেনারেটর চালিয়ে আবার আলো জ্বালায়। আবার হৈ হুল্লোড়। সঞ্জয় কুমার পাঠক ভোজপুরি বিরহগীত শোনায়।

"হঁসী-হঁসী পনওয়া, খিঅওলে বেইমানওয়া,
কী আপন বসেরে পরদেশ।
কোরী রে চুনরিয়া মে, দগিয়া লগাই গইলে,
মারী রে করেজবা মে ঠেস।।

কজরী নজরিয়া সে, খেলে রে বদরিয়া,

কী বরসে রকতওয়া কে নীর।

সর্দী কে মারে, ছায়ী জরদী চনরমা পে,

গরদী মিলী রে তক্‌দীর।। ..."

কেউই সমস্ত শব্দ বুঝতে পারে না। কিন্তু সঞ্জয়ের আবেগ সবার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সেজন্যেই বোধহয় কমাণ্ডিং অফিসার সরাসরি রোমান্টিক গান গাইতে শুরু করে। তারপর সবাই সমস্বরে। লায়লা ও লায়লা-লায়লা, কেইসি তু লায়লা, হর কোই চাহে তুঝ সে মিলনা অ-কেলা-ও লায়লা-কুলু কুলু ....

এগারটা পঞ্চান্ন থেকেই চোখগুলি ঘড়ির দিকে। চোখগুলি দূরদর্শনের পর্দায়। একটা দু'টো অবশিষ্ট স্ন্যাকস্ চিবোয় কেউ কেউ। দূরদর্শনে নানা বিচিত্র পোশাকে নাচনকোঁদনের লয় দ্রুত হয়। কোৎ কোৎ শব্দ করে গ্লাসের রাম শেষ করে আবার গ্লাস ভরে দিলকুমার। আট পেগ শেষ করেছে ও অলোকের সামনেই। সাতান্ন-আটান্ন-উনষাট হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ — শুভ নববর্ষ— করমর্দন ও আলিঙ্গন। বব্‌লা নতুন বছর উপলক্ষে মাখনলাল চতুর্বেদীর কবিতা শোনায়—

"মুঝে তোড় লেনা বনমালী, ওস পথ পর দেনা তুম ফেঁক

মাতৃ ভূমি পর শীষ চড়ানে, জিস পথ জায়েঁ বীর অনেক ।।..........."

সরোজের উদাত্ত উচ্চারণে এই কবিতাটি অলোকের খুব ভাল লাগে। কবি একটি ফুলের মনের কথা শোনাতে গিয়ে দেশপ্রেমের অভিলাষের কথা বলেছেন, ঐ ফুলটিও সৈনিকদের মতনই নিজস্ব সবকিছু দেশের জন্য উৎসর্গ করে দিতে চায়। এই কবিতা শুনে দিলকুমার সরোজের গলা জড়িয়ে-চকাস-চুমু খায়।

সরোজ বলে, — ধ্যাৎ! সে বাঁ-হাত দিয়ে গাল থেকে দিলকুমারের লালা মোছে। সবাই হাততালি দেয়। উত্তেজিত দিলকুমার একটি তামিল পপসঙ গেয়ে ওঠে,—

সুরঙ্গিনী, সুরঙ্গিনী, সুরঙ্গিনী কা মাল কন্‌বাওয়া

মাল মাল মাল, সুরঙ্গিনী কা মাল ,

সুরঙ্গিনী কা মাল কন্‌বাওয়া। ...."

সবাই হাততালি দিয়ে অজানা ভাষার গানে সুর মেলায়। ভিনোদ আর দিলকুমার হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করে। ওদেরকে নাচতে দেখে সবাই উঠে নাচতে শুরু করে, এমনকি কমাণ্ডিং অফিসারও শুধুমাত্র সরোজ বারবার ওভারঅলের হাতা দিয়ে গাল মোছে। দিলকুমারের গান আর শেষ হয় না। একই পঙ্‌ক্তি বারবার গাইতে থাকে। সবাই হাততালি দেয়। অলোকের সন্দেহ হয়, হাতগুলি এখন মস্তিষ্কের নির্দেশে চলছে কি না! হাওয়ার দাপটে ছাদের অ্যাস্‌বেস্‌টসের শিটগুলি সশব্দে কাঁপছে।

আজকের মেনু মুরগি, পনির, পাঁপর, পোলাও আর রায়তা। কে সি দাশের কৌটা কেটে একটা করে রসোগোল্লা। অনেকদিন পর পেট টিমটিম। অলোকের আইঢাই অবস্থা। এরকম সময়ে

বিদায় নিতে নিতে কমাণ্ডিং অফিসার ওকে বলে, শুধু মিত্রই কিছু শোনালে না! ও লাজুক হাসে। — আমার যে এসব কিছুই আসে না স্যর, আমি আপনার লায়লার গানে নেচেছি! এ কথায় বাকি সবাই হেসে ওঠে। কমাণ্ডিং অফিসার চলে গেলেও হুল্লোড় চলে। সার্জেন্ট বান্‌সল ও নন্দ সিং ওকে নিয়ে অশ্লীল মজা করে। এই পরিবেশে এসব খারাপ লাগে না। বরং অনেক আন্তরিক মনে হয়। দিলকুমার বমি করতে শুরু করলে সব হুল্লোড় থেমে যায়। নন্দ সিং ওকে জোর করে লেবুর রস খাওয়ায়। ভিনোদ মুখ ধুইয়ে দেয়। তারপর ধরাধরি করে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তখন ভিনোদ-সরোজরা যে যার বিলেটে চলে যায়।

অলোকরা শুয়ে পড়ে। নতুন বছর জেগে থাকে স্লিপিং ব্যাগে। ঘুম আসে না। সবার কথা মনে পড়ে। মা-বাবা-ভাই-বোন-স্ত্রী-কন্যা। তোড়ার কথা মনে পড়তে ক্রমে ও-ই সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে থাকে। ওর আধো কথাবার্তা, বিজ্ঞের মতন চিন্তা-ভাবনা করে সব প্রশ্নের গুছিয়ে জবাব দেওয়ার চেষ্টা, মায়ের মতন সব জিনিস গুছিয়ে রাখার প্রবণতা— সব মনে পড়ে। তখনই দুপুরে শোনা সেই পাখিটার ডাক আবার শুনতে পায়। এত রাতে এত ঠাণ্ডায় কোন্ পাখি ডাকবে? অলোক নিশ্চিত— এটা ওর ভ্রম মাত্র। তবু পাখির ডাক চলতে থাকে। অলোক ছটফট করে। কেমন করুণ ভাবে ডাকছে পাখিটা। ওর মনের পাখি বা ভ্রমপাখির এই ডাক এতক্ষণে উপভোগ করতে শুরু করে ও। ঝিম মেরে পড়ে থাকে বিছানায়। প্রবল বাতাসে চারপাশের কোন কাণ্ডে আর একটাও পাতা থাকবে না। সব ঝরে যাবে। সব ঝরে যাচ্ছে আজ। খুব কষ্ট হয় ওর।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর সবে চোখ লেগেছে তখনই চেঁচামেচি। —আগ লগ্ গয়া, আগ-আগ — চিৎকার ধড়মড়িয়ে ওঠে অলোক। তাড়াতাড়ি ওভারঅল পরে ছুটে বেরোয়। পাশের বিলেটে আগুন। যেরকম হাওয়া চলছে ওদের বিলেটে লাগতেও দেরি লাগবে না। আশেপাশের সমস্ত বিলেটের এয়ারম্যান ও লাদাখি বাচ্চরা কাঁচা বরফ ও বস্তা-বস্তা বালি ছোঁড়ে। অলোকও হাতের সামনে যা পায় তাই ছুঁড়ে আগুনে ফেলে। তখনই শোর ওঠে — ভি-নো-দ, ভি-নো-দ— ক্যায়া হুয়া?

কেউ আর্তস্বরে বলে, জ্বল গয়া, ভি-নো-দ—

ভিড়ের দিকে ছুটে যায় অলোক। সবাই ধরাধরি করে বালির উপর শুইয়েছে। যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার করছে ভিনোদ। ছুটে গার্ডপোস্টে টেলিফোন করতে গিয়ে অলোক দেখে সরোজ তখন ক্র্যাডল হাতে অ্যাম্বুলেন্স ডাকছে। ও আবার ছুটে আসে। আর তারপরই আবার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ওর। তাড়াতাড়ি গিয়ে জয়ন্তকে জাপটে ধরে। জয়ন্ত ওর বুক ম্যাসাজ করে। ভিনোদের আর্তনাদ এখন গোঙানিতে পরিণত হয়েছে। চামড়া পোড়া গন্ধ বেরিয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স এসে তখুনি ওকে নিয়ে জেনারেল হাসপাতাল ছোটে।

ঘন্টাখানেক পর আগুন নেভে। ততক্ষণে বিলেটটি প্রায় ভস্মীভূত। কুড়িজন এয়ারম্যানের সব জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। ওরা হয়ত শোয়ার আগে বুখারি বন্ধ করে নি। কোথাও কার্বণ জমে বুখারি ফেটে গিয়েই এই অগ্নিকাণ্ড। বিলেটে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে আরো কিছুক্ষণ বুক মালিশ করে জয়ন্ত। জল গরম করে খেতে দেয়। তারপর গিয়ে ও স্বাভাবিক হয়। অলোকের মনে পড়ে

প্রথম দিন প্লেন থেকে নেমে থ্রি টনারে উঠে বসার পর সেই যে মরে যাচ্ছিল ও, সাদা বুদবুদের মতন আশ্চর্য গোলক থেকে ছুটে আসছিল কালো কালো সঙ্গিন— এই ভিনোদই সেদিন ওকে ধরে বুক মালিশ করে ফিরিয়ে এনেছে জীবনে। আজও নিজে অগ্নিগোলক থেকে পঞ্চাশ-ষাট শতাংশ ঝলসে বেরিয়ে এল অথচ অলোক কিছুই করতে পারলো না। এই ঘটনায় যেন ওর সত্যিকারের মৃত্যু হল আরেকবার।

— আমার কিন্তু মনে হয় মানুষ মরে একবার, কাপুরুষেরা বারবার— প্রবাদটি সত্যের একপিঠ মাত্র !

— আমার কিন্তু মনে হয় মানুষ মরে একবার, কাপুরুষেরা বারবার — প্রবাদটি সত্যের একপিঠ মাত্র !

— আরেক পিঠ কি? উপত্যকার বুক চিরে অনেকদূর ছুটে যাওয়া পিচের রাস্তায় অবাক বিস্ময়ে অলোক প্রশ্ন করে জয়ন্তকে? ও কী বলতে চায়?

— এই যে কালরাতে তুই যেতে পারিস নি ভিনোদের সঙ্গে, সেই থেকে এখন অব্দি, একটা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তুই জীবনের সঙ্গে, আগের থেকে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠহলি! না হলে কনফেশান তোর মুখ দিয়ে বেরোতো না।

অলোক ভাবে, সত্যি কি তাই ? বোধহয় না। আবার হয়তো তাই। এই দুপুর যেমন। পথের সমান্তরালে একটি খাল পুরো জমে গেছে। স্থানীয় শিশুরা কাঠের তক্তায় পেরেক লাগিয়ে স্কেটিং করছে। ওরা খালের উপর হাঁটে। জলজ উদ্ভিদ এবং ছোট ছোট মাছগুলির শ্লথ গমন স্বচ্ছ বরফের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। সে এক অভিনব দৃশ্য। মনে হয় যুদ্ধ। প্রকৃতির নির্মমতার সঙ্গে জীবনের যুদ্ধ। — তোরা কেমন করে বেঁচে আছিস, ছোট মাছেরা? ওর প্রশ্নে বরফের নিচে থেকে মাছেরা তাকায়, কিন্তু কোন সাড়া দেয় না।

— আমরা বেঁচে আছি এবং থাকবো, কেন না আমাদের বেঁচে থাকতেই হবে যতদিন সম্ভব! জয়ন্তের মুখে মাছের জবাব শুনে অলোক হাসে। আধ মাইলটাক এগিয়ে একটা সেতু। লছমনঝোলার ক্ষুদ্র সংস্করণ। সবসময় দুলছে। দোল দেখে মনে হয় সেতুটা জীবন্ত। ওপারে অনেক দূরে পুরণো লেহ্ শহর। ঘন কুয়াশায় ঝাপসা দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে লেপটে থাকা মেঘের ভালবাসা। আরো দূরে স্তুকা রাজপ্রাসাদ চুগ্‌লামশরের কাছাকাছি। সবকিছু স্বপ্নের মতন। অলোকের মনে হয় বর্তমান আর অতীতের মধ্যে সেতু তৈরি হয়েছে। সে বলে, দুপুরে খেয়েই আমরা জেনারেল হাসপাতালে যাব! ভিজিটিং আওয়ারস্ তো চারটায় শুরু!

নিচে প্রবহমান সিন্ধু। বিশাল-বিশাল বরফের চাঁই নদীপারের বরফ-সীমাকে কচকচ কেটে নিয়ে যায়। জয়ন্ত বলে, অন্যবছর এ সময় জমে থাকে!

—একদমই জল থাকে না?

— পনেরো-কুড়ি দিন পুরো বরফ হয়ে সিন্ধু স্থির হয়ে যায়।

— এবার কি ঠাণ্ডা কম? অবাক তাকায় অলোক।

জয়ন্ত হাসে, তাই তো দেখছি! ওর দাঁতে বরফের প্রিজম থেকে প্রতিফলিত হয় আলো। জীবনে এই প্রথম কারো দাঁতে সাতরঙা ঝিলিক দেখে থ' হয়ে যায় ও।

ঘড়িতে দেখে তখন দুপুর বারোটা। প্রবহমান বরফের প্রিজমে প্রিজমে প্রতিসারিত বিচিত্র সব ছটা দেখে মনে হয় অদৃশ্য কোন জাদুকরের কীর্তি । চিচিং ফাঁক বলে খুলে দিয়েছে জাদুগুহার দরজা। সেখান থেকে রাশি রাশি মণিমাণিক্য ভেসে চলেছে । জয়ন্তর ইচ্ছে করে প্রিয়জনদের সব্বাইকে ডেকে দেখায়। অলোক ভাবে, তোড়া দেখলে কী আনন্দই না পেত! একটি ছোট্ট নাম না জানা কালো ঠোঁট স্টিলরঙের পাখি ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে সেতু ও বরফে। কিন্তু ডাকছে না। অনেকদিন পর পাখি দেখে অলোক হা হয়ে যায়। খোলা মুখ দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া গলায় ঢুকে পড়ে। তাড়াতাড়ি ঠোঁট বন্ধ করে ও। ঢোঁক গেলে। কাল কি এই পাখিটাই ডাকছিলো? অলোক উৎকর্ণ থাকে।

তখনই তিন লাদাখি যুবতী সেতু দুলিয়ে যায়। পায়ে নর্থস্টার জুতো। হাতে বোনা ভারি মেরুণ উলিকোট গোড়ালি অব্দি লম্বা। তার উপর রঙিন সোয়েটার। নানা রঙের কোমরবন্ধ। মাথায় রঙিন মখমলের কানঢাকা টুপি। টুপি ঢাকা ওড়নার ঘাড় ও পিঠ ঢাকা। দু'দিক থেকে রাজহংসের পালক গুঁজে ওড়না সামলানো। লাল আপেলের মতন গালগুলি ঠাণ্ডায় ফেটে গেছে। তার উপর পুরু করে মাখন বা স্বচ্ছ কোন ক্রিমের আস্তরণ। ওদের দিকে একবার তাকায়। তারপর ওরা আগের মতন গল্প করতে-করতে এগিযে যায়। দুলিয়ে যায় শীতল সময়।

এই উদাসীনতা জয়ন্তকে কষ্ট দেয়। আর একবার তাকালে কী ক্ষতিটাই হতো? কী এমন আলোচনায় নিমগ্ন ওরা? এত হাসি, এত প্রাণচঞ্চল্য নিয়ে সশব্দে সেতু দুলিয়ে যেতে-যেতে একটু কৌতুহলী দৃষ্টিও অন্তত সন্তুষ্ট করতো ওকে।

অলোকের একটি মেয়েকে ভীষণ পরিচিত লাগে। কোথায় যেন দেখেছে । হঠাৎ মনে পড়ে ত্রিপুরা রাজবাড়ির মেয়ে স্নিগ্ধা ওদের সঙ্গে পড়তো। ওর সঙ্গে এই মেয়েটার চলার ছন্দ, উচ্চতা ও চেহারার মিল। যদিও স্নিগ্ধা অনেক লাস্যময়ী। হয়ত সুদূর অতীতে ওদের পূর্বজরা একই ঘরের লোক ছিল। স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা হলে বলতে হবে এই মেয়েটির কথা । ও এখন উইমেনস্ কলেজে পড়ায়। একটা ফটো তুলে নিয়ে যেতে পারলে আরো ভাল হয়। — কোনদিন দেখা হলে মেয়েটা কি রাজি হবে? জয়ন্ত জবাব দেয় না। সন্দেহ হয়। যেরকম উদাসীনতা দেখিয়ে মেয়ে দু'টি বেরিয়ে গেল! এখন অনেক দূরে পুরণো লেহ্র কাছাকাছি পুতুলের মতন দেখতে লাগছে। স্তব্ধ মৌন পাহাড় ওদের চলায় প্রাণ পেয়েছে যেন । প্রাণ পেয়েছে ধূসর সাদা উপত্যকা আর পুরণো লেহ্ শহর। এই দুই আধুনিকাকে অলোকের মনে হয় প্রকৃতির নর্থস্টার । আদিম উপত্যকা ও পুরণো রাজধানীকে বয়ে চলেছে।

স্টিল-রঙের পাখিটা সেতুর স্তম্ভে পাথরের মতন বসে। যেন জমে গেছে। ওরা- ও নড়তে গিয়ে আর পারে না। ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে দু'জনেরই পা অবশ হয়ে গেছে। আঙুলগুলিতে শিনশিনে ব্যথা। জয়ন্ত মেয়ে তিনটির চলার পথে তাকিয়ে কী যেন এক ঘোরে ডুবে আছে। ওকে ধাক্কা দিতেই চমকে লাজুক হাসে। পা দেখিয়ে অলোক জিজ্ঞেস করে, এখন কী হবে? জয়ন্ত প্যারেড

গ্রাউণ্ডে কদমতোল করার মতন পা তুলে, নামিয়ে সেতুর শক্ত কাঠে সচল হয়ে উঠতে থাকে ধীরে-ধীরে। দেখাদেখি অলোকও তাই করে। জীবনে প্রথম নিজের ইচ্ছায় কদমতোল। জয়ন্ত সেতুর লোহার রেলিং-এর গায়ে ধীরে ধীরে লাথি মারে। অলোকও এরকম করতে থাকলে ধীরে সামান্য ক্ষমতা ফিরে আসে। ওরা এক পা এক পা এগুতে থাকে। অলোক জয়ন্তকে নিশ্চল পাখিটা দেখায়। জয়ন্ত হুসহাস শব্দ করে ঢিল মারার ভঙ্গি করে। তবু নড়ে না পাখিটা। তখুনি সেতুর দোলায় দেখতে পায় বুড়ো ছোগুলকে।

বুড়ো একজন পারদর্শী বুখারি ক্লিনার। ওদের দেখেই হাত কপালে তুলে বলে, জুলে সাব! ওটা অন্ধ পাখি, আপনাদের দেখতেই পাচ্ছে না! — জুলে, জুলে! কোথায় যাচ্ছেন ছোগুল? ছোগুল একগাল হেসে সাইডব্যাগ থেকে একটা রামের বোতল বের করে। ওতে সাদাটে ছাঙ ভরা। হলদেটে শ্যাওলা -রঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাসে থুতু ছিটিয়ে ছোগুল বলে, জমে গেছেন তো আপনারা? আধা বোতল করে মেরে দিন দেখবেন চলার শক্তি ফিরে আসবে!

জয়ন্ত খুশি হয়ে একটা কুড়ি টাকার নোট বুড়োর দিকে বাড়িয়ে দেয়। বুড়ো জিভ কাটে, যখন আপনাদের কাজ করে দেব তখনই পয়সা দেবেন সাব!

জয়ন্ত ঢকঢক করে অর্ধেক বোতল ছাঙ খেয়ে অলোকের দিকে বাড়িয়ে দেয়। জৌ থেকে তৈরি হালকা মদ। জয়ন্ত বলে, এই ছাঙের দামটা?

—আপনারা মেহ্মান!

— এই সেতু কি আপনার ঘর ছোগুল, মেহমান বলছেন? বুক ফুলিয়ে বলে ছোগুল, এই সেতু মাত্র ছ'জন মিলে তৈরি করেছি। তখন জোয়ান ছিলাম, হাতে তাকৎ ছিল! বলতে বলতে বুড়োর চোখে অশ্রু চিকচিক করে ওঠে। আজকালকার ছেলেপিলেরা বিনা মেহনতেই রোজগার করতে চায়, আমাদের সময় ছিল আলাদা, কাজের সঙ্গে ভালবাসা, কত ভালবাসা দিয়ে তৈরি হয়েছে এই সেতু!

— সে কবেকার কথা বাবা? অলোকের প্রশ্নে খানিক চুপ হয়ে ভাবে ছোগুল। ঘাড় চুলকায়। কী যেন বিড়বিড় করে। তারপর বলে, চিনাযুদ্ধের পরে তখন দালাই লামার সঙ্গে তিব্বতিরা দলে দলে এই উপত্যকায় চলে এলো, লোকবসতি বাড়লো, তখনই তৈরি হলো এই সেতু। সেই ছয় জোয়ানের কেউই আজ বেঁচে নেই। একাত্তরের যুদ্ধে তাক্সী তুরতুক ফ্রন্টেই নিহত হয়েছেন তিনজন। আর দু'জনকে তথাগত স্বর্গে ডেকে নিয়েছেন!

— পাখিটা কি করে অন্ধ হলো বাবায়

— ওই পাখিদের চোখই থাকে না — তাই সহজেই শিকার হয়ে যায়। ডিমও পাড়ে না। বাচ্চা পাড়ে। আজকাল আর দেখাই যায় না ওদের। শেষই হয়ে আসছে প্রায়! দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পাখির জন্য বুড়োকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে অবাক হয় অলোক। তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে ডেকে ওঠে পাখিটা। ঠিক কালকের সেই অদৃশ্য পাখির ডাক। জয়ন্তও চমকে ওঠে। বুড়ো তখন এই পাখির গল্প শোনায় আরো। বাদুড়ের মতন খাবার সংগ্রহ করে এরা। পেটে ছাঙ গেছে বলে কিনা জানে না বুড়োর কথাগুলি শুনতে ভাল লাগছে ওদের। লাদাখ স্কোয়াডের রিটায়ার্ড সৈনিক।

চুপচাপ বসে থাকতে জানে না। কথা বলে সে-ও হাত পা ঘাড় মাথা নাড়িয়ে। চোখের কোণে পিচুটি, গালে বলিরেখা তবু এই বুড়োই আজ সেতু থেকে বিলেট মাইলদুয়েক পথ ফিরে আসার শক্তি জোগায়।

বিলেটে ঢুকে ওরা বুখারির তিনপাশে জমায়েত শ্লীল-অশ্লীল আড্ডায় ঢুকে পড়ে। একটি পর্ণো ম্যাগাজিন হাতে-হাতে ঘুরছে। ছুটির দিনে এমনি চলে। ঘন্টাখানেক গণগণে আঁচে শরীর গরম করে ওরা খেতে যায়।

মেসে ঢুকতেই সরোজের সঙ্গে দেখা। ও এখন মেস মেম্বার। কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে অলোক ওর কাঁধে হাত রাখতেই সরোজ বলে, এইমাত্র ফোন এসেছে, ভিনোদ আর —, কথাটা শেষ না করেই ভেউ-ভেউ কেঁদে ফেলে সে। এরপর আর ভাল করে খাওয়া হয় না। নেহাৎই শারীরিক ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে কিছু রুটি তরকারি গলাধঃকরণ করে ওরা বিলেটে ফিরে আসে। পা-গুলি চলতে চাইছে না। সবার মুখ অন্ধকার। শুধু বুখারি উত্তপ্ত ও লাল।

সকালেই হাসপাতালে টেলিফোন করেছিল অলোক। ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার জানায় ভিনোদকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে, কিছু বলা যাচ্ছে না। সেই থেকেই একটা অস্বস্তি ওর মধ্যে কাজ করছিলো।

মৃত্যু যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে ও ভাবেনি। সকাল থেকে সমস্ত চিন্তার মাঝে কাল রাতের অগ্নিকাণ্ড। অথবা বলা যেতে পারে সমস্ত অস্তিত্বে জ্বলতে থাকে এক অভিনব প্রাকৃতিক জ্ঞান। শুধু সেতুর উপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে ছিল সবকিছু! বর্তমান ও অতীতের যোগসূত্র এই দোদুল্যমান সেতুটা মোহময়। মনে পড়ে সেই নাম না জানা কালো ঠোঁট স্টিল-রঙের আজব পাখিটাকে। ছোগুলকে পাখিটার নাম জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছে অলোক। এরপর দেখা হলেই জেনে নেবে ওর নাম। আরো অনেক কিছু জানার বাকি। ওটাকে দেখে জয়ন্ত শায়ের বব্‌লার মতন বলেছিল— কিস্ মিট্টি কে বনে ইয়ে চিড়িয়া?

আগামীকাল থেকে হিমবাহের আবহাওয়া, ধস, তুষারপাত, হিমাংক,উইণ্ড চিল ফ্যাক্টর ইত্যাদির উপর বিস্তারিত জ্ঞান দেবেন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা। তারপরই অলোককে পাঠানো হবে বেস ক্যাম্প। সেখানে এক্লিম্যাটাইজেশান হলে পরে ওকে হিমবাহের ফ্রন্টে পাঠানো হবে।

❑ অভিসার

সমস্ত এয়ারফোর্স স্টেশান লেহ্ এখন শোকবিহ্বল। সবার কথায় সেই অগ্নিকাণ্ড। অলোকও বিমর্ষ। ভিনোদের আর্তনাদ এখনো কানে লেগে আছে। চোখে ভাসে চাঁদের আলোয় বরফের উপর পোড়া দেহের ছটফট। ওর মৃত্যু কেড়ে নিয়েছে পুরো এয়ারফোর্স স্টেশানের হাসি। আজ এয়ার অফিসার কমাণ্ডিং সাহেব ছুটি ঘোষণা করেছেন। তিনি হয়ত ভেবেছেন, আজ আর কারো প্রাত্যহিক চর্চায় মন বসবে না। এমনিতে পুরো স্টেশানের প্রায় সবাই ফিউনারেল প্যারেডে যাবে।

গতকাল ঘুরে আসা থেকে অলোকের আর বুক ব্যথা করেনি। ক্লান্ত শরীরে ঘুমও আসে

শরীর অবশ করে। কিন্তু খুব সকালেই ঘুম ভেঙে যায়। বুখারি জ্বালিয়ে বিলেটের সবাইকে বেড-টি দিয়ে যায় ওয়াংচুক। ও কখন মেস থেকে বিশাল কেটলিভরা চা নিয়ে এসেছে। ছেলেটি বেশ চটপটে। ঘন্টাখানেক পর বাথরুম ইত্যাদি সেরে সবাই যখন বুখারির চারপাশে গোল হয়ে বসেছে ওয়াংচুকই অলোককে স্পিতুক মেলার কথা বলে। অন্য সহকর্মীরা সবাই ভিনোদের স্মৃতিচারণ করছে। সরোজ, নন্দ সিংরা শোনাচ্ছে নানা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা। এসব শুনে অলোকের খুবই খারাপ লাগে। ও পাশে বসা জয়ন্তের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে ধীরে বলে, চল্, স্পিতুকের মেলা ঘুরে আসি। ফিউনারেল প্যারেড তো সেই দু'টোয়। ওয়াংচুক তখন বলছে, আত্মারা মানুষের পোশাক পরে এ সময় স্পিতুকের মেলায় ঘুরতে আসে। অন্যদিন হলে ওর কথা নিয়ে সবাই এখন হাসি-ঠাট্টা করতো। কিন্তু আজ সবাই নীরবে শুনছে। প্রিয়জন বিয়োগের পর হয়ত এরকম গল্প কেউ-কেউ বিশ্বাসও করে।

না জানি কেন মনে হয় ঐ মেয়ে তিনটির সঙ্গে আবার দেখা হবে। আজই। এখানে ট্রেন নেই, যে, হঠাৎ কোথাও দূরে চলে যাবে। আজ ভোরে কোন বিমান আসেনি। বরফের ধসে সড়কপথে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন। ওরা মেলাতে আসবেই। সেদিন দ্বিতীয়বার মুখ ঘুরিয়ে তাকায় নি বলে কষ্ট হয়েছিল। এবার দেখা হলে নিশ্চয়ই হাসবে। অন্তত সেই মেয়েটি। আসবেই।

অলোক এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে। এখানকার সবচাইতে ছোট পাহাড়ের উপর কয়েকশো বছরের পুরণো স্পিতুক গুম্ফা। গুম্ফার পাশে কালীমন্দির। অনেকটাই চড়াই। বরফ ও পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠে যায় ওরা। ইউনিট থেকে ঐ পথই সংক্ষেপ। না হলে লেহ্ থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে পাহাড়ের কোমরে পৌঁছে বাকিটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হতো। একটি গুহায় বিশাল সব বিকট চেহারার মূর্তি। বাইরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের নোটিস্ বোর্ডে লেখা—কালীমন্দির নয়, একটি বৌদ্ধ-স্থাপত্যের অন্যতম......... হয়ত সব ক'টা কালো, জিহ্বা বের করা এবং একটার ছত্রিশটা হাত বলে হিন্দু পর্যটকরা নিজেদের মনগড়া নাম দিয়েছে।

ওর চোখ চঞ্চল। এত মেয়ের মাঝে খুঁজে পাচ্ছে না, নাকি আসেই নি ওরা আজ। কাছাকাছি অনেক ক'টা কৃত্রিম গুহা। লাদাখে কোথাও এত ভিড় হতে পারে ভাবাই যায় না। ছাগলের ছাল দিয়ে তৈরি লম্বা কোট আর চামড়ার লম্বা নাগরাই জুতোর খচরমচর, অনেকের নিঃশ্বাসে নির্গত স্থানীয় মদিরা ছাঙের গন্ধ গুহাগুলির আলো-আঁধারিতে এক আদিম আবহের সৃষ্টি করছে। প্রবহমান মেয়েগুলিকে দেখলে মনে হয় ঐ মেয়ে তিনটির পূর্বজা-রা বুঝি! টুটরিয়ন মঙ্গোলিয় চেহারা। নেশায় লালচে। চোখগুলিও লাল। অলোকের গা ছমছম করে।

গতবছর এই মেলার তথ্যচিত্র ও দূরদর্শনে দেখেছে। তবু নিজের চোখে দেখা কিন্তু অন্যরকম। প্রশস্ত উঠোনের একদিকে সব গেরুয়াপরা লামার বসে। চারপাশে গিজগিজ করছে নারী-পুরুষ-শিশু। কোথাও নিশ্চয়ই রয়েছে ঐ তিনটি মেয়ে। অথবা নেই। সানাই আর বিশাল সব করতালের আওয়াজ। বিকট সব মুখোশ। ঢাল-তলোয়ার। যাত্রাগানের যুদ্ধের মতন নাচ। সিংহের ছাল পরা মানুষটির নাচ দেখে ছিনাথ বহুরূপীর কথা মনে পড়ে। এ সব দৃশ্যের মাঝে ঢুকে যায় পরশু রাতের অগ্নিদগ্ধ ছটফট। মনে হচ্ছে ওরা যমপুরীতেই পৌঁছে গেছে। ভিনোদও

এখানেই কোথাও আছে। যারা দাঁড়িয়ে আছে সবাই অতীতের মানুষ। আজ এরা কেউ বেঁচে নেই। এজন্যই ওরা সেই তিনটি জীবন্ত মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে না।

না, ওরা এখানে আসেনি। জয়ন্ত'র কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সবসময় আনমনা। ও যেন শুধু সঙ্গ দিতেই এসেছে। অলোক ভাবে, সময় মানুষকে কিরকম বদলে দেয়। এই জয়ন্তই কত উচ্ছল ছিল। বেলগাম এবং ব্যাঙ্গালোরে নানা রঙের বিচিত্র ইনল্যাণ্ড লেটার পাওয়া যেত। স্ট্যাম্প লাগিয়ে পাঠাতে হতো। জয়ন্ত লিখত ছোট ছোট মুক্তোর মালা। কালো কালিতে লিখে নামের নিচে সবুজ ঢেউ। বাঙালি ছেলেরা 'কালোর বুকে সবুজ ভালবাসা' বলে খ্যাপাত।

ওর চিঠি আসত সবচাইতে মোটা খামে। ও বসতো প্যারেড গ্রাউণ্ডের বাঁধানো কমাণ্ডিং ডায়াসের পেছনে। অন্যরা কচ্ছপের মতন গুঁড়ি মেরে দেখতো লাল পাহাড়ে প্রতিফলিত সূর্যের আলো অথবা চিঠির বাক্যগুলি নানা রঙে উদ্ভাসিত করছে ওর মুখ। সেই জয়ন্তের মুখে আজ কোন দীপ্তি নেই। কী নিরাসক্ত! এই বয়সি সৈনিককে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে এত মৃদু সংবেদন! স্পিতুক পাহাড়ের নিচে প্রথম মুদিখানা থেকে দশ টাকার টফি কিনে একটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলে হাতে নিয়ে মুখে দেয়।

—প্রচণ্ড অশান্তি-এখনও, আসলে খুবই বোকা ছিলাম, পৃথিবীটা নিষ্ঠুর-রে! সবাই স্বার্থের! অভিনয় করে-সব্বাই! জয়ন্ত'র আওয়াজ ভারি হয়ে আটকে যায়। সশব্দে টফিটা চিবিয়ে খায়। গালের ঢালে বরফ। উলের টুপিতে বরফ। স্পিতুক ডেয়ারির লাদাখি বুড়ি শুকনো ঘাস কুচি কুচি কেটে গামলায় ঢালে গভীর মমতায়। জয়ন্তের কথামতন পৃথিবীকে নিষ্ঠুর বলে মানতে পারে না অলোক। ওর মনে হয় প্রতিকূলতা তো থাকবেই, অতিক্রম করতে হবে, জয় করতে হবে। ও মনে মনে শব্দাবলী সাজায়, ওকে ধন্যাত্মক করে তুলতেই হবে। একটা বড় লোমঅলা কুকুর বরফে মুখ দিয়ে কী যেন খায়, নাকি বরফ খায়।

— তোর বউ-বাচ্চা চণ্ডিগড়ে একা, নাকি কাউকে শেয়ারিং? অলোকের প্রশ্নে যেন সম্বিত ফিরে পায় জয়ন্ত।

— রবিকে মনে আছে? রেডিও'র রবীন্দ্রনাথ পাল, এখন এ.এম.আই.ই. করে ইঞ্জিনিয়ার। ওই আছে অভিভাবক —

— রবি কবে বিয়ে করেছে?

— করেনি, এই তো নতুন চাকরি, আমার থেকে ধার নিয়ে স্কুটার কিনেছে, তুই তো জানিস ও কত ভাল, অনুরোধ ফেলতে পারেনি —

এই বাচ্চার প্রসঙ্গ আসায় এই প্রথম ওর মুখে দীপ্তি দেখা যায়। অলোকের মনে একটা কথা জেগে ওঠে। রেডারে যেমন আকাশ-বিদারী বিমানের ছায়া পড়ে, তেমনি একটা আশংকার ছায়া প্রস্ফুটিত হয়ে উত্থিত থাকে। কিন্তু বন্ধু'র স্বর্গীয় বিশ্বাসের উদ্যানে বেমানান ধুতুরার মতন মনে হওয়ায় চুপ্ থাকে। ভাইদের স্বার্থপরতা, একান্নবর্তী পরিবার থেকে ছিটকে পড়ার দুঃখ এমনিতেই ওকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। অলোক ওর কাঁধে হাত রাখে। জয়ন্ত ছেলের গল্প শোনায়। শুনতে-শুনতে ওর মনে জাগে তোড়ার গল্প। অলোকও গল্প শোনায়।

এয়ারফোর্স গেটের সামনেই স্পিতুক বাস স্যাণ্ড। সেখানে পুরণো একটা অজিত বিমানের খোল সিমেন্ট বাঁধানো। দু'টি লাদাখি শিশু ঐ পাথরের বেদিতে খেলছে। এখানে বাচ্চারা দুপুর-বেলায় খেলে। ওদেরকে দু'টো করে টফি দেয় অলোক। ওরা বেশ মিষ্টি গলায় বলে, থক্ছে জা— থ্যাংক উ! তোতাপাখির মতন আওয়াজ। সত্যি শৈশব কত সুন্দর! হিংসা নেই, লোভ নেই, যুদ্ধ নেই, যুদ্ধের চিন্তা নেই। রোদ উঠলে রোদের খেলা, বরফ পড়লে বরফের খেলা। খেলতে খেলতে ক্ষিদে পাবে। তখন মায়ের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এয়ারফোর্স গেট দিয়ে ঢুকতেই চোখে-মুখে একটা শীতল হাওয়ার ঝাঁপটায় চোখ বন্ধ হয়ে যায়। চোখ খুলতেই এক ঝটকায় ওরা বর্তমানে ফিরে আসে। একটা হুডখোলা থ্রী-টনার ট্রাকের ডালায় ভিনোদের মৃতদেহ জাতীয় পতাকায় ঢাকা। ওর মাথার কাছে কপালে হাত দিয়ে মৌন বসে আছে সদ্যবিধবা স্ত্রী। ভিনোদ চণ্ডিগড়ে সেপারেটেড ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রেখেছিল বলেই বউটিকে এত তাড়াতাড়ি দুপরের আই-এল -৭৬ বিমানে আনানো গেছে। সঙ্গে ওঁর বাবাও এসেছেন। তিনিও মাথায় হাত দিয়ে লেপ্‌টে বসে আছেন। কিন্তু বউটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতন কোন মহিলা এখন এই এয়ারফোর্সে স্টেশনে নেই । এই শীতে এখানে কারো ফ্যামিলিই থাকে না। সরোজ, দিলকুমার, সার্জেন্ট বান্‌সল, সঞ্জয় পাঠকরা মুখ অন্ধকার করে আশেপাশে দাঁড়িয়ে।

অলোক আর জয়ন্ত পরস্পরের দিকে তাকায় তারপর ঐ গাড়ির ডালায় উঠে পড়ে। বাকীরা অন্য দু'টি গাড়ির কোন একটিতে উঠে পড়ে । শবযাত্রা শুরু হয়। শববাহী গাড়ীর পেছনে পেছনে বায়ুসেনা পুলিশের জীপসী, তার পেছনে এয়ার অফিসার কমাণ্ডিং এর জিপসী, অবশেষে অন্য দু'টি থ্রী-টনার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে।

সিন্ধুনদের তীরে শ্মশানঘাট এয়ারফোর্স ব্যাণ্ড কোন এক শোকগানের সুরে ধীরলয়ে বাজতে থাকে। প্রতিটি বাদকের চোখে জল মৃতদেহের উপর থেকে জাতীয় পতাকা সরানো হয়। চিতা সাজিয়ে তার উপর মৃতদেহটি শুইয়ে দেওয়া হয়। ফিউনারেল প্যারেডের লাইনে দাঁড়ানো তরুণ এয়ারম্যানরা আকাশে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছোড়ে। তারপর উল্টাশস্ত্র করে। তারপরই ভিনোদের পার্থিব শরীর অগ্নিকে সমর্পণ করা হয়। অর্ধেক থেকে বেশী তো আগেই জ্বলে গেছিল। এই দৃশ্য অলোকের কাছে অসহনীয় ঠেকে। ভিনোদের বিয়ের এক বছরও পেরোয় নি। ওর চিতার আগুণ দেখে এই প্রথম বউটি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। ওর বাবা নিজের বুক চাপড়ে-চাপড়ে হাহাকার করে ওঠে । তারপর নিজেকে সামলে ততক্ষণে আছাড়ি বিছাড়ি করতে শুরু করা সদ্যবিধবা কন্যাকে সামলাতে চেষ্টা করে। অলোকের ভয় হয় বউটি'র গর্ভপাত না হয়ে যায়।

এখানে একজনও মহিলা না থাকাকে অদৃষ্টের পরিহাসের মতন নির্মম লাগে। এয়ার অফিসার কমাণ্ডিং সাহেবের মনেও বোধহয় এই ব্যাপারটা প্রভাব ফেলে। তিনি এগিয়ে গিয়ে পিতার মতন সস্নেহে বউটির মাথায় হাত রেখে বলেন, রোনা মৎ বেটি, হাম সব তুম্‌হারে সাথ্ হ্যায়। তখুনি না জানি কেন অলোকের মনে হয়, — এ যেন ভিনোদের স্ত্রী নয়, এ যেন অন্তরা কাঁদছে, আর চিতার আগুণে দাউদাউ জ্বলছে ওর নিজের মৃতদেহ। সারা শরীরে জ্বলন টের পায় সে। আর থাকতে পারে না। এই মৃত্যু-চেতনা থেকে রেহাই পেতে পা টিপে টিপে শ্মশানঘাট থেকে বেরিয়ে বিলেটের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু এতদূর ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে হেঁটেও জ্বলন থামে না।

তখন থেকে এখন অব্দি বাইশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও সেই জ্বলন টের পাচ্ছে অলোক। সে কি পাগল হয়ে পড়বে।

সার্জেন্ট অঞ্জন কলিতার বাড়ি আসামের নওগাঁও। চেহারা ও কথাবার্তায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। ভীষণ অগোছালো মানুষ। প্রতিদিন অফিসের পর বারে ঢুকে দু'চার পেগ রাম চড়িয়ে তবে মেসে খেতে যায়। খাওয়ার পর সারা দুপুর-সারা সন্ধ্যা ঐ বারে বসেই ঝিমুতে থাকে। রাতে টলতে-টলতে বিলেটে ফেরে। অলোকের পাশেই ওর বিছানা। ভীষণ খারাপ লাগে। এরকমই দুই-হাত দূরত্বের বিছানায় যদি একটা মানুষ এরকম গুমসুম থাকে। মনে হয় এই দুই-হাত এক প্রবল খরস্রোতা দূরত্ব। যার শব্দে অন্য পাড়ের মানুষটি অচেনা। অন্য সহকর্মীরা কেউ ওকে পছন্দ করে না। কেউ বা আবার সহানুভূতিশীল, কিন্তু দূরত্ব রেখে চলে। অলোক পার্বত্য ত্রিপুরার মানুষ। প্রতিবেশী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রতি এক সহজাত টান রয়েছে। কৌতূহলও। অঞ্জন হয়ত তা লক্ষ্য করেছে।

দুপুরে খাওয়ার পর সবাই যখন বুখারির পাশে, হঠাৎ সব্বাইকে অবাক করে অলোকের দিকে তাকিয়ে ও হেসে ফেলে। অলোকও অবাক। ওকে এত সুন্দর হাসতে দেখেনি আগে। বেশ সরলভঙ্গীতে বলে, আপনি লেহ্ যাননি কখনো, চলুন ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। এই সুন্দর প্রস্তাব ওর ভাল লাগে। অন্যরা রহস্যময় তাকায়। মুখ টিপে হাসে। অলোক ভাবে দেখাই যাক না। এতদিন পর মানুষটা হেসেছে। আজ সারাদিন মদ খায়নি। পা একদমই টলছে না। হয়ত গতানুগতিক সময়ের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসতে চায়।

এই মৌন পর্বতশৃঙ্গ ঘেরা বিস্তৃত উপত্যকা, কালো পিচঢাকা রাস্তার দু'পাশে সারি-সারি গাছ পাতাহীন। রাস্তায় কোথাও কোথাও বরফ জমে আছে। ধূ-ধূ বরফ আর ঠাণ্ডা হাওয়া ভেদ করে ছোট-ছোট বাসগুলি যেন প্রাণপ্রবাহ। দুঃখী কলিতার হেসে ওঠার মতন সময়ের মৌনতা ভাঙতেই যেন বাসগুলিতে হিন্দি সিনেমার চটুল সংগীত। যাত্রীদের রঙচঙে পোশাকও মনে হয় চারপাশের খটখটে প্রকৃতির রঙহীনতা থেকে একটা রিলিফ। কিন্তু বোঁটকা গন্ধ! দীর্ঘ অস্নাত মানুষজনের ভিড়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়েও রেহাই নেই।

শহরের পথগুলিতে এমনকি বাজারেও নানা রকম ঝাঁঝালো আঁশেটে গন্ধ। শাকসব্জি সব ধূসর এবং কালশিটে দাগভরা। ঘুরতে ঘুরতে তিব্বতী মার্কেটের পাশে হঠাৎ ঐ মেয়ে তিনটি। হৃদপিণ্ডে কিছু একটা ছলকে ওঠে। ওরা দুলতে-দুলতে ডান-দিকের একটা দোতলা বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় অলোক ঐ ঝুলন্ত কাঠের সেতুতে দাঁড়িয়ে। নিচে প্রবহমান সিন্ধু। বিশাল সব বরফের চাঁই দু'পাশে জমা বরফের শরীর কচকচ কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রবহমান অজস্র প্রিজমে সাতরঙা ছটা, মণিমাণিক্যের প্রবাহ। ও কলিতার হাত ধরে টানে। কলিতা দু' একবার জিজ্ঞেস করে কোন জবাব না পেয়ে অগত্যা অনুসরণ করে।

বাড়িটা লাদাখ বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের অফিস। ওরা ভারি ভারি পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে। বাইরের ঘরটায় সারা দেওয়াল জুড়ে এক বিশাল ড্রাগন। তার উপরে দালাই লামার বাঁধানো ফটোতে প্লাস্টিক ফুলের মালা। একটি ড্রাগনখোদিত টেবিলের চারপাশে চারটে বড়

ভারি কাঠের হাতলঅলা বেঞ্চ। ওরা ঢুকতে দু'জনে উঠে দাঁড়ায়। ওরা এদিকে তাকিয়ে ছিল। মেয়ে-তিনটির পেছন ওদের দিকে। অলোক নিজেদের পরিচয় দেয়। মেয়ে-তিনটি ঘুরে তাকাতেই নমস্কার জানায়। ওরা সমস্বরে বলে, জুলে! এদেরকেই আজ সকালে মনে মনে খুঁজছিল অলোক। এখন একটা অস্বস্তির শিকার সে। মরিয়া হয়ে বলে, আপনাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী । কলিতা মৃদু হেসে মাথা নাড়ে। ডানদিকের দেওয়ালে খোদিত বুদ্ধের সোনালি মূর্তি হাসে ।

মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হাত মেলায়।

— আমার নাম থুপস্তান ছেবাঙ। আমি অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি। ও অন্য চারজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ন্যাশানাল স্কুল অফ ড্রামার স্নাতক নাবাঙ গিয়াৎসো, নাট্যকর্মী তাশি ছোগুল, ওয়াঙ সো ও ইয়ান ছান।

ওরা কাঠের চেয়ারে বসতে বলে। নিজের সপ্রতিভ ব্যবহারে অলোক অবাক। শিল্প সংস্কৃতির লোকজনদের সঙ্গে এত কথা বলতে পারবে কখনো ভাবেনি। বাদল সরকার ও আধুনিক নাট্যচর্চা, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধধর্ম, শীলভদ্র-হিউয়েন সাঙ, নেতাজি ও রেনকোজির গুম্ফা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা ক্রমে ত্রিপুরা, বোড়োল্যাণ্ড, দার্জিলিং, কাশ্মীর, বিচ্ছিন্নতা-সন্ত্রাস ও আভ্যন্তরীণ বিবাদে সৈনিকদের ব্যবহার ইত্যাদি রাজনৈতিক দিকে প্রবাহিত হতে থাকলে একসময় ওরা উঠে পড়ে। মেয়েগুলি নীরব শ্রোতা। কোন উচ্ছ্বাস নেই চোখ-মুখে। কোন উদ্বেগ বা আনন্দের অভিব্যক্তিও খেলা করে না। ওরা কি অন্য কিছু ভাবছে? খারাপ কিছু? এই নীরবতায় অলোক হতাশ। একরকম জোর করেই দেরি হয়ে যাওয়ার অজুহাতে অলোকরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসে।

ছেবাঙ ও গিয়াৎসো আবার আসতে বলে। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় অলোক আবার পেছনে তাকায়। ওরা কেউ বেরিয়ে আসেনি । ভারি পর্দায় একটি বিশাল রঙিন রাক্ষসের হাসিমুখ। ও বোকার মতন হেসে ফেলে। রাস্তায় নেমে কলিতা বলে, মিশন আনসাকসেস্‌ফুল। অলোক ঘুরে তাকায়। কলিতা হাসছে। না জানি কেন তখন হঠাৎ ওর লজ্জা করে। ভদ্রলোক কী ভাবলো কে জানে! ঝিরিঝিরি তুষারবর্ষণ শুরু হয়।

— কিসের ব্যর্থতা কলিতাসাহেব?

— এই যে আপনি হাসিখুশি ছিলেন, ওরা পাত্তা দিলো না, আপনি ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন! মুখে চু-চু শব্দ করে কলিতা। অলোক কী বলবে! নিজেই জানে না, কেন, ওদেরকে দেখে ছুটেছে। এখন অনেক কষ্টে পা টিপে টিপে বরফের আস্তরণে পিচ্ছিল চড়াই ভাঙে। একটু বেসামাল হলেই পিছলে পড়বে।

কয়েকটা কিশোর শিস্‌ দিয়ে-দিয়ে স্কিড করছে। ধপ্‌ ধপাস আছাড় খচ্ছে। একে অন্যকে ধরে উঠে পাছায় বরফের গুঁড়ো ঝেড়ে আবার স্কিড। এই বয়সটাই এরকম আনন্দের। বেপরোয়া চেষ্টার।

বাস-স্যাণ্ডে কলিতা সিগরেট কেনে। তারপর বাঁদিকে হাঁটে। বাঁদিকে চড়াই।

— কোথায় যাচ্ছেন স্যার? ভদ্রলোক জবাবে হাসে। একটা সিগারেট অফার করে। কী মনে করে অলোক সিগারেট নেয়।

— চলুন একটা জায়গা দেখিয়ে আনি। কলিতার চোখে রহস্য। অলোকের মনে তখন অভূতপূর্ব শহুর দেখার কৌতুহল। রাস্তাটা একেবেঁকে উঠে গেছে পৃথিবীর ছাদে। একটা স্তম্ভে প্রজেক্ট হিমাংক এর সগর্ব বার্তা। কত সহস্র শ্রমিক ও সৈনিকের প্ররিশ্রম ও আত্মবলিদানের ফসল এই পথ।

একটু দূরেই বাঁদিকে একটা হস্টেলের মতন বাড়ি। কলিতার পেছন-পেছন ও গেট ঠেলে ঢোকে। কয়েকজন আর্মির লোক এমন চোখে তাকিয়ে হাসে যেন অনেকদিনের চেনা। লোকগুলির মুখচোখে এক অদ্ভুত রিক্ততা অথবা পাপবোধ। অবাক লাগে।

বারান্দায় টানা তারে ঝুলছে মেয়েদের জামাকাপড়। ঘরগুলি থেকে খিলখিল হাসির শব্দ। আঁশটে আঁশটে উৎকট গন্ধ। তার সঙ্গে মিশে আছে ছাঙ ও রামের মিলিত দুর্গন্ধ। ওর কেমন অস্থির-অস্থির লাগে। — এ কোথায় নিয়ে এলেন স্যার? জবাবে কলিতা সাহেবের চোখ চকচক করে ওঠে। ফিসফিসিয়ে বলে, আপনি যে ধান্দায় ঘুরছিলেন, এখানে এক-একটা বড়িয়া মাল আছে!

তখনই, ভোজবাজির মতন দুই যুবতি বেরিয়ে ওদের হাত ধরে টানে। অলোক হতভম্ব। ঢুকেই কম পাওয়ারের বাল্বের আলোয় যে দৃশ্য দেখে-কল্পনাতীত। পাশাপাশি অনেক ক'টা খাট। প্রত্যেক খাট দু'পাশে ঝোলানো বস্তার আড়ালে স্বতন্ত্র। সামনেটা খোলা। পাশাপাশি খাটে দুই ফৌজি সংগমরত। ওর নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যেন একটা উদ্‌গার উঠে আসে। ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। পেছন থেকে কলিতা ডাকে। ঠোঁটে ওরই দেয়া সিগারেট। রাস্তায় নেমেই ছুঁড়ে ফেলে। তারপর থুতু। থুতু ফেলতে গিয়ে বমি বেরিয়ে আসে। রাস্তার পাশে বসে বমি করে ও। নাভির কাছ থেকে উগরে দেয় সব। আচ্ছা, ঐরকম দুর্গন্ধময় পরিবেশ না হলে কি অলোকও কলিতার মতন ....?

পৃথিবীর ছাদে যাওয়ার শুরুতেই নরক। আর ভাবতে পারে না সে। অন্তরার মুখ মনে পড়ে। মন খারাপ লাগে। বাসে বসে খোলা জানালার হু-হু বাতাসে হিম হতে ভাল লাগে। পেছনের সীট থেকে নারীকণ্ঠ, ভাইয়া খিড়কি বন্ধ করো। আবার থুতু ফেলে জানালার কাচ নামিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে চমকে ওঠে। বাসের স্পিকার সরব হয়ে ওঠে সরোদের ঝংকারে।

মেয়ে তিনটি মিটিমিটি হাসছে। দীর্ঘদিন তুষারপাতের পর হঠাৎ রোদ ওঠার মতন হাসে তাশি ছোগুল। অলোকও হেসে ফেলে। এতক্ষণে হালকা লাগে। হিন্দি ফিল্মি গানের চটুল ছন্দও ভাল লাগে। অন্তরার মুখটা এত দূরে, কেমন কুয়াশাঢাকা! এই দূরত্বই আজ বাস্তব। শরীর কাঁপিয়ে কোন্ গভীর অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে স্পিতুকের মেঘে ঢাকা আকাশে হঠাৎ একটি তারা, একটিমাত্র তারা দেখতে পায় অলোক।

পরদিন রোদ ওঠে। আকাশ পরিষ্কার। তাপমান নেমে যায় মাইনাস তেইশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অলোক চিতা হেলিকপ্টারে লেহ্ ছেড়ে তুষার-মণ্ডিত খরদুঙলা পেরিয়ে পৌঁছে যায় বরফাবৃত নুব্রা উপত্যকায়। অন্তরা, তুমি দেখছ না এই অপূর্ব দৃশ্য! চারিদিক শুকনো। বর্ষার মেঘ দক্ষিণ হিমালয়েই নিঃস্ব হয়ে গেলে সালতোরা কারাকোরাম— লাদাখ রেঞ্জের জন্য আর ছিটেফোঁটাও বাকি থাকে না। বৃষ্টি নেই। গাছপালা, ক্ষেত খামার নেই। নেই লোকবসতি। কোথাও দুই শৃঙ্গের

মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসা ক্ষীণধারা এখন জমে বরফ। কাছেপিঠে হয়ত দুষ্প্রাপ্য একটু সমতল। গ্রীষ্মে এখানে হয়ত সামান্য চাষবাস হয়। অদিগন্ত রুক্ষতায় মরুদ্যানের মতন দু'একটা গ্রাম। এ ধরণের গ্রাম ওরা ছোটবেলায় ঝুলনমঞ্চে সাজাত। তবে এরকম ন্যাড়া পর্বতশৃঙ্গ থাকতো না। ওদের কল্পনাতেও এরকম দৃশ্য ছিল না যে! এখনো মনে হচ্ছে স্বপ্ন। এ কোন্ অভিসারে উড়ে চলেছে অলোক?

ঘন্টাখানেক পর হেলিকপ্টার বেস ক্যাম্পে নামে। সঙ্গে আনা নতুন থার্মোমিটারের রিডিং তখন মাইনাস তেইশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখানেই খরস্রোতা নুব্রার উৎস। এখন বরফে ঢাকা। উপরের আকাশ আর ওদের বাসস্থান ছাড়া সবখানে ঘন বরফ।

বিকেলে কাছে-পিঠে কোথাও গোলাবর্ষণের গদাম-গদাম গুর্ম-গুড়ুম শব্দ শোনা যায়। বুক কেঁপে ওঠে ওর। জীবনে এই প্রথম এত কাছে গোলা পড়ছে। তলপেটে কেমন একটা টনটনে ব্যথা শুরু হয়। ঘাড় ব্যথা করে। সার্জেন্ট দুবে ওর চেহারা পাংশু হয়ে যেতে দেখে অভয় দেয়, কোই বাৎ নেহী, এইসে চলতাই রহ্‌তা হ্যায়। তবু অলোকের শরীর কেমন অস্থির-অস্থির লাগে! কোন্‌টা শত্রুর গোলা আর কোন্‌টা নিজেদের বুঝে উঠতে পারে না ও। কান পেতে বোঝার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে কানটাকে তৈরি করতে হবে ভেটেরানদের কাছে শুনে-শুনে।

বেশির ভাগ ভেটেরানরাই অবশ্য খুব কম কথা বলে। কারো চেহারায় তেমন দীপ্তি নেই। এত হতাশ, এত বিষণ্ণ সৈনিক ওর ভাল লাগে না। বিষণ্ণতা যে ভীষণ ছোঁয়াচে। একাকী সময়ে খুব সহজেই একজনের ভাল না লাগা অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। তখন আর কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। অলোক ভাবে, কবে যে বাড়ির চিঠি পাব! না জানি কেমন আছে সবাই! সার্জেন্ট দুবে ও বিলেটের অন্য এয়ারম্যানরাও চিঠির অপেক্ষায় দিন গুণছে। আজ অলোকের সঙ্গে কিছু অফিসিয়াল মেল ছাড়া কারো কোন ব্যক্তিগত চিঠি আসে নি বলে সবার মন খারাপ। সে যেন এক বিরহের দেশে এসে পড়েছে। এখানে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বয়সী জাহাঁবাজ দামাল মানুষগুলি এসে একেকজন বিরহী যক্ষ হয়ে পড়েছেন।

❑ মৃত্যুসীমান্তে বাঁচার লড়াই

বেস-ক্যাম্পে অলোক জামাকাপড় খোলারই সুযোগ পায়নি। জুতো খলে স্লিপিং ব্যাগে ঢোকা আর সকালে বেরিয়ে জুতো পরা। সবচাইতে বড় সমস্যা প্রাকৃতিক ডাক। খোলা হাওয়ায় ভীষণ কষ্ট। সব বরফ হয়ে যায়। পশ্চিম মধ্য এশিয়ার পুঞ্জীভূত হাওয়া যখন তখন আছড়ে পড়ে। কথায় কথায় তুষার প্রলয়। দশ-বারোদিন দাপট চলতে থাকে। কখনো কোথাও দশ-পনের হাজার টন বরফের চাঁই, গুঁড়ো বরফ পাহাড় গড়িয়ে ধসে পড়ে। পরমুহূর্তেই মনে হয় কিছুই হয় নি। জ্যাইসে থে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পায়খানা করতে বসে মনে হয় একটা ছোট্ট ধস্ যদি মাথার উপর হুড়মুড়িয়ে পড়ে! হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে যায় অলোক। আর পায়খানা হয় না। কোনমতে শৌচকর্ম সেরে ছুটে বিলেটে ফেরে। একটা অস্বস্তি থেকেই যায়।

কয়েকদিনের জন্যে এসে চারপাশের পর্বত শিখরগুলি, আকাশ আর বিচিত্র মেঘমালা মুগ্ধ করে। কিন্তু বেশিদিন হলেই কেমন পাগল-পাগল লাগে। পাহাড়গুলি সারা বছরই বরফে ঢাকা। উপত্যকায় সাত মাস বরফ । অক্সিজেনের অভাবে স্মৃতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে । নাকি এরকম মনে হচ্ছে! সিন্ধুনদের খালে স্বচ্ছ বরফের নিচে দেখা ছোট মাছেদের শ্লথ চলা চোখে ভাসে। অলোক ভাবে, আমিও কি ওরকম হয়ে পড়বো? ভাবতেই শিউরে ওঠে সে। ভয় হয় । এখন কোথাও ছুটে পালাবে? হায়, পালানোর কোন উপায় নেই।

কেমন একটা জবুথবু অবস্থা। খোলা বরফে কষ্টকর ব্যাপারটা সেরে আসার পর প্রচণ্ড ব্যথা এবং ফোঁটা ফোঁটা রক্তপাত। বিভীষিকা! অলোক ভাবে, আমার প্রতিরোধ-ক্ষমতা দেখছি ঐ পুঁচকে মাছেদের থেকেও অনেক কম! কত ক্ষুদ্র আমি, কত অসহায়! প্রতিদিন ডাক্তার,ঔষধ আর প্রতি-মুহূর্তে যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই। সহসৈনিকদের কাছে বিদ্‌ঘুটে সব রোগ আর ভয়ংকর পরিণতির গল্প শুনে-শুনে দিনগুলি আরো বেশি অসহনীয়। মাঝে-মধ্যেই মনে হয় এমনি রক্তক্ষরণ হতে-হতে অচিরেই সে বরফ হয়ে যাবে। তের জানুয়ারি ডাক্তার ঘাবড়ে গিয়ে মিলিটারি হাসপাতালে পাঠায়— হুণ্ডর। এম.আই. ১৭ হেলিকপ্টারে উড়ে যায় সে।

জীবনে এই প্রথমে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে খুবই খারাপ লাগছে। হাসপাতালে ভর্তি হলে প্রিয়জন দেখতে আসে, ফলটল নিয়ে আসে, সমবেদনা সহানুভূতি জানায়— ছোটবেলা থেকে ও এরকমই দেখে অভ্যস্ত। এখানে কেউ আসে না। আকাশকে আড়াল করে থাকে স্তব্ধ পর্বতশৃঙ্গ। পাদদেশে পাতাঝরা গাছগুলি অতীতের প্রতিনিধি। শো-শো হাওয়া চলে। হাসপাতালের পারপ্লেক্স মোড় দেওয়ালগুলি নড়ে ওঠে সশব্দে। কিন্তু একটি গাছের ডালও নড়ে না। ছায়া নড়ে না। শুধু কাকেরা ডাষ্টবিনে কুকুরদের সঙ্গে আপোষ করে খায় আর মানুষের লাগানো ঐসব গাছের শরীরে বিষ্ঠা সারে। কিন্তু একটা কাকাও ডাকে না। এখানে এসে অব্দি অন্য কোন পাখির ডাক তো দূরের কথা কাকের ডাকও শোনে নি অলোক। মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে, ইস্ এখন যদি একটা কাক ডাকে! পরদিন সতের জানুয়ারি অপারেশন। কি জানি কী হবে!

সারারাত ছটফট করে অলোক। ভোররাতে শেভিং করিয়ে, ডুস্ দিয়ে পেট খালি করিয়ে, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্টরা ওকে তৈরি করে দেয়। প্রভাতের আলো ফুটতেই সেদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে কাক ডেকে ওঠে। সেই শুনে আরো কিছু কাক একসঙ্গে ডেকে ওঠে। কা-ক্কা-কা-আ হা হা! কী যে ভাল লাগে এই হঠাৎ কাকের ডাক । আনন্দ হয়। পৃথিবীর সমস্ত গাইয়ে পাখির প্রতিনিধি হয়ে ডেকেছে এই কাক! ওর জন্যেই ডেকেছে। মনে হয়, মা ডাকছে, সোনা-আ —

নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট অলোকের জামাকাপড় খুলে একটা সাদা আলখাল্লা মতন পরিয়ে দেয়। কী মিষ্টি ইনজেকশন দেয় অপারেশান থিয়েটারে ঢোকানোর আগে। মনে হয় দু'পেগ-এর নেশা। সার্জন মেজর সাহেব কী মিষ্টি কথা বলে! আমর্ড ফোর্সে এরকম চিকিৎসক বিরল। কথা বলতে-বলতেই টেবিলে শুইয়ে আরেকটা ইনজেকশান পুশ্ করে ধমনীতে। সামান্য টের পাওয়া যায়। গল্প করতে-করতেই সবকিছু আবছা লাগে। আওয়াজ জড়িয়ে আসে। আরো কিছু আওয়াজ অস্তিত্বে জুড়ে যায়। অন্তরার হাসি না তোড়ার কান্না! সবকিছু ছাপিয়ে মায়ের মুখটাই তখন সমস্ত

চেতনায়। ও পিনপিন করে তলিয়ে যেতে থাকে । জিহ্বা ভারি। তবু টের পায় ওকে উপুড় করানো হয়। অনেক দূর থেকে শুনতে পায় ভাল লাগা কাকের ডাক। এরপরই এক গাঢ় অচেনা রঙের সুড়ঙ্গে অলোক হারিয়ে যায়।

ব্যারাক আর হাসপাতালের সব নিয়মকানুন একইরকম। ব্যতিক্রম শুধু ঔষধ আর ফিনাইলের গন্ধ। কিন্তু আসল পার্থক্য বোঝা যায় রাতের বেলায়। সন্ধে আটটার পর থেকেই ওয়ার্ড যেন মৃত্যুপুরী। সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। দু'একজন উঃ আঃ কোঁকায়। যত রাত বাড়ে কোঁকানি তত বাড়তে থাকে। সবাই ঘুমিয়ে আছে, অথচ সবাই কোঁকাচ্ছে। শুনতে-শুনতে অজান্তেই কখনো নিজের নাভি থেকেও একটা কোঁকানি নাক দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। অলোক চমকে ওঠে সমস্ত চেতনা দিয়ে সেই কোঁকানিকে সামলায়। গত দু'দিন ধরেই চলাফেরা করতে পারছে। দু' চামচ করে সাবুর লেই তিন-বেলা খাচ্ছে। আর রক্তপাত হচ্ছে না। কোন সেলাই কাটার ব্যাপার নেই। গরম জলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে ড্রেসিং রুমের গামলায় দু'বেলা বসে থাকা বিরক্তিকর। অলোক তবু বসে থাকে সকালে-সন্ধ্যায়।

একুশ দিন হলো ও স্নান করেনি। চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া স্নানের কোন সুযোগ নেই। জল কই? খাওয়ার জল, রান্নার জল জোগাড় করাই এ সময়ে কষ্টকর। হাসপাতালের গা ঘেঁষে প্রবাহিত শীয়োক এখন জমে বরফ। অন্যপাশে বড় পিচ ঢালা রাস্তা পেরিয়ে অনেকদূর গেলে তবে পাওয়া যায় লাদাখ রেঞ্জের দুই শৃঙ্গের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসা ঝর্ণার ক্ষীণধারা। তার উপর একটি লোহার বিমের সেতু বানিয়েছে গ্রেফের জওয়ানরা। সেই সেতুর নিচে থেকে থ্রী টনারের পেছনে চাপিয়ে ছলকাতে-ছলকাতে হাসপাতালে পৌঁছায় প্রায় অর্ধেক হয়ে যাওয়া ব্যারেলগুলি। একটু সুস্থ হয়ে যাওয়া পেশেন্টরা তখন বালতি নিয়ে যুদ্ধ করে। এতকষ্টের জল নিতান্ত প্রয়োজনে ছাড়া খরচ করতে মনে একটা অপরাধবোধ জাগে। সেজন্যই সবাই হয়তো কিপটের মতন জল খরচ করে। কাজেই বিকেলের দিকে ফিনাইলের গন্ধ ফিকে হয়ে এলে অন্যান্য ঔষধের গন্ধ ছাপিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে নানা জনের অস্নাত শরীরের মিলিত বোঁটকা গন্ধ। স্নো বাইট অথবা চিগু ব্রেইন আক্রান্ত রুগিদের কোঁকানি। প্রথম পর্যায়েই শুধু এখানে চিকিৎসা হয়। বাকিদের চণ্ডিগড়ে পাঠাতে হয়। ফুসফুসে ফ্লুইড জমে হাই অলটিচিউড পালমোনারি ওডেমা আক্রান্ত রোগীদেরকেও চণ্ডিগড়ে পাঠাতে হয়। এই ভয়ংকর রোগের ডাকনাম হ্যাপো।

কারো এমন মর্মান্তিক প্রয়োজনেও কোন কারণে কাছাকাছি এয়ারবেস থয়েসে উড়োজাহাজ না আসতে পারলে হাত, পা কিম্বা নাক কাটা যায়। অনেক সময় রোগেরা মিলেমিশে শেকড়-বাকড় গজিয়ে মহীরুহ হয়ে পড়ে। তখন তিলে-তিলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে শেষ হয়ে যায় একেকটি যুবক। মেডিক্যাল অফিসার, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অন্য রোগীরা শোকে ডুবে থাকে, আরেকটি মৃত্যু এসে যতক্ষণ না এই মৃত্যুর ব্যথাকে আরেক পরত তুষারপাতে ঢেকে দেয়! এক সদ্য যুবক অলোকের চোখের সামনেই এরকম হ্যাপোয় মারা গেছে। আরেকজন এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মেডিক্যাল অফিসার ও নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্টরা। এমনকি নিজের শরীরের উত্তাপ দিয়ে হলেও রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন ওরা। এসব দেখে-

দেখে সবসময় একটা অজানা উৎকণ্ঠা চেতনায় চেপে বসে থাকে।

সবার কথা খুব মনে পড়ে। এই দুর্বল সময়ে নিজের পরিচর্যা করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। সারাদিনের ক্লান্তি সমস্ত দুশ্চিন্তাকে জাপটে ধরে একসময় ঘুমের দেশে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু স্বপ্নে জেগে ওঠে নানা বাজে দৃশ্য। তুষারপাত হতে থাকে। ঘন তুষারপাতে ঢেকে যায় চারপাশ। বাইরে থেকে দরজা ঠেলে ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে তাল তাল গুঁড়ো বরফ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। সমস্ত রোগিরাই তখন অক্ষম। কেউ উঠে বুখারি জ্বালাতে পারে না। সবার চোখে কাতর আর্তনাদ। অলোক নড়তেও পারে না। বুখারিটা এত কাছে তবু! ওর এই কষ্ট দেখে বুখারিটাই ধীরেধীরে কাছে এগিয়ে আসে। অলোক দেশলাই জ্বালাতে যায়। কাঠি দিয়ে ঘষে-ঘষে দেশলাইয়ের শরীর থেকে ছালবাকলা উঠে যায়। তবু আগুন জ্বলে না। ততক্ষণে বরফ ঘিরে ধরে সমস্ত অক্ষম সৈনিক ও বুখারিকে। সবাই গোঙাতে থাকে। সেই অপার্থিব গোঙানিতে ঘুম ভেঙ্গে অন্ধকারে টর্চ জ্বালে। হাত কাঁপে। আলো কাঁপে। কম্পিত আলোতে দেখতে পায় দরজা বন্ধ। বুখারি যথাস্থানেই নীরব। তবু কাঁপুনি থামে না।

তখন থেকে দিনের আলো ফোটা, মানুষের কথাবার্তা শুরু হওয়া, বুখারির উত্তাপ পাওয়া অব্দি এক নিদারুণ সময়-যাপণ! ফিনাইল ডেটলের গন্ধময় দিনগুলি এই দুগর্ন্ধময় রাতগুলির চাইতে অনেক ভাল। পাশের বিছানায় চন্দ্রভান খকখক কাশে। অলোক ভাবে, কখন জাগবে লোকটা! তাহলে বুখারি জ্বালিয়ে বসে গল্প করা যাবে। একা-একা আর পারা যাচ্ছে না। চন্দ্রভান শক্তসমর্থ, প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা মানুষ। নিজেদের হরিয়ানি মোষের দুধ-ঘি-এ কসবৎ কবা পেশিগুলিকে শক্তিশালী করে তুলেছে। ওকে দেখে অলোকের প্রায়ই মনে পড়ে মহাভারত সিরিয়ালে ভীমসেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছে সেই পরভীন কুমারকে।

এহেন চন্দ্রভান হিমবাহে একটা ফৌজি আক্রমণে জয়ী হয়ে বীরদর্পে লিংকে ফেরার সময় পা পিছলে অগভীর খাদে পড়ে গেছিল। তখন ওর একটা মাইনর স্ট্রোক হয়।

— বাঁচলে কেমন করে তুমি?

— আমার ইয়ার, সহকর্মী বাবলু বল্মীক ছিল যে সঙ্গে! ও-ই আমার কোমরের দড়িতে হাত ঢুকিয়ে বরফের উপর দিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে প্রায় পাঁচশো মিটার দূরে মেডিক্যাল ইনভেস্টিগেশান রুমে নিয়ে যায়। ওখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আমার জ্ঞান ফিরলে তখুনি র‍্যাশন পৌঁছুতে আসা হেলিকপ্টারে চড়ে বেস ক্যাম্প চলে আসি, আর আধ ঘন্টার মধ্যে এখানে!

— তোমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে!

— ভালই তো, এর থেকে কত সাংঘাতিক বিমারিতেও সৈনিকের কোন সহায় থাকে না। বাবলুর মতন শক্তিশালী ইয়ার থাকে না যে অতটা হিঁচড়ে নিয়ে যাবে!

— হাত ভাঙলো কেমন করে?

— ঐ তখনই! প্লাস্টারের ফাঁক দিয়ে একটি স্পোক ঢুকিয়ে চুলকাতে চুলকাতে বলে চন্দ্রভান, খাদে যখন পড়েছি তখন না ভাঙলে ঐ বরফের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সময় কোথাও বেকায়দায় লেগেছে!

— এখন কোথায় আছে তোমার বাবলু বল্মীক?

— ঐ গ্লসিয়ার পোস্টে, নিশ্চিত ছটফট করছে ও আমার জন্যে. ট্রেনিং সেন্টার থেকে সেদিন অব্দি আমরা কাছ-ছাড়া হইনি, একসঙ্গে ছুটিও যাই আমরা, পাশের গ্রামের ওদের বাড়ি! এমনি গল্প চলে প্রতিদিন। এমনি নিজেদের কথা বলে একেক জন বুখারির তিনদিকে গোল হয়ে বসে। নার্সিং অ্যাসিস্টেন্টরাও সন্ধ্যার দিকে ওদের পাশে বসে যদি মারাত্মক কোন পেশেন্ট না থাকে। এমনি দীর্ঘ কতকগুলি দিন পেরিয়ে অবশেষে ডিসচার্জ পায় অলোক।

পঁচিশে জানুয়ারি থ্রি-ট্রনার ট্রান্সপোর্টে লেহ্ যাত্রা শুরু। আহা মুক্তি! হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সাময়িক মুক্তির স্বাদ ওকে এত উল্লসিত করে তোলে যে হেলিকপ্টারের আসার অপেক্ষা করে না। থয়েসে খবর নিয়ে জেনেছে আঠাশ কিম্বা ঊনত্রিশে হেলিকপ্টার আসবে। এই প্রতীক্ষা অসম্ভব। এখানে এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা দিন, আর প্রত্যেকটা দিন এক-একটা দীর্ঘ মাস। কী দীর্ঘ সব দিনরাত! দুপুর দেড়টায় রওনা হয়ে গাড়িটা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ডিস্‌কিট গ্রামে পৌঁছোয় বিকেল চারটেয়। ডিস্‌কিটে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের রিলে অ্যানটেনা দেখে ভাল লাগে। তারপর শুধু উৎরাই। যেখানে পাহাড় শেষ আঁকাবাঁকা পথও শেষ। সোজা উপত্যকায় নাক বরাবর চলতে চলতেই সূর্যাস্ত। খালসার ট্রানজিট ক্যাম্পে রাত্রি-যাপণ। সেই রাতের কষ্টের কথা মনে পড়তে আজও শিউরে ওঠে অলোক। বাপ্‌রে কী বিভীষিকা!

সন্ধ্যার পর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। শুধু সহযাত্রী সৈনিকদের ব্যক্তিগত স্টোভের বার্ণারের আলো। উষ্ণতাও ততটুকুই! আর বিড়ি ধরিয়ে মানসিক উষ্ণতা অনুভবের চেষ্টা। সবাই দুই হাঁটুর ফাঁকে স্টোভ রাখে আর হাঁটুর উপর তোয়ালে। তোয়ালে ঢাকার নিচে হাতের তেলো এবং আঙুল সেঁকা। ঠাণ্ডা ফ্লোরে বেডিং খুলে বিছানা। অলোকের নিজস্ব স্টোভ নেই। এখানেও পাশে হাবিলদার চন্দ্রভান। ও এখন লেহ্ জেনারেল হাসপাতালে যাচ্ছে। দু'জনেই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়েছে গত চার-দিনে। খালসারের সেই নিদারুণ ঠাণ্ডায়ও ওর স্টোভ এবং তোয়ালে, ওর ভালবাসা অলোককে রক্ষা করে। এভাবেই চন্দ্রভান ওর আত্মীয় হয়ে যায়।

তখন ট্রানজিট ক্যাম্পে রুম টেম্পারেচার মাইনাস থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঐ স্টোভে, ঐ তোয়ালে ঢাকা একটা সান্ত্বনা মাত্র। বিড়ি খেয়ে আর গরম জল খেয়ে কি ঠকঠকি থামে? অন্যপাশে নির্বিকার বসে আছে নাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এক সৈনিক! অলোক যতবারই তাকায় দেখে লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে মিটমিট হাসছে! এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাসে কেমন করে! অনেক কষ্টে ঠোঁট ফাঁক করে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে হাসির জবাব দেয় অলোক। লোকটি স্টোভা উঠিয়ে কাছে এসে বসে।

— এত কাঁপছো কেন সাহেব? এই বয়সে এত কাঁপুনি শোভা পায় না! লোকটার কথায় শ্লেষ নেই। ভোজপুরি মেশানো হিন্দিতে বেশ উদ্দীপ্ত করার মতন ভাষা। মুখের পেশীগুলি দৃঢ়, শক্ত চোয়াল, বিশাল হাঁ মুখ, হলদেটে শ্যাওলাজমা দাঁত, চোখদুটিও বড় বড়। কিন্তু দৃষ্টিতে একটা প্রছন্ন বিষণ্ণতা অলোকের চোখ এড়ায় না। ও হেসে বলে, খুব সহজে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে আপনার।

— অপরিচিত কোথায়, আমরা সবাই একই লড়াইয়ের ইয়ার-দোস্ত, একে অন্যের জন্যে জান্ দিই, দেশের জন্যে—

—আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না ?

— লাগবে না আবার, কিন্তু ঠাণ্ডাকে আমি ভয় পাই না।

এরপরই উপেন্দ্রপ্রসাদ শোনায় এক রোমহর্ষক কাহিনী। শুনতে শুনতে ঠক্-ঠক্ আওয়াজে শিহরিত হয় সমবেত সৈনিক। বারো জনের এগারোটা স্টোভ কাছাকাছি রেখে মাথার উপর দু'টো বেডশিট চাঁদোয়ার মতন টাঙিয়ে তৈরি অভিনব বুখারির উষ্ণতায় কিছুটা ধাতস্থ হয়ে সবাই গল্প শোনে। এই ঠাণ্ডায় কারো চোখে ঘুম নেই—

বরফের দেওয়ালে পেরেক ঠোকে উপেন্দ্রপ্রসাদ। পাথরের দেওয়ালে ঠোকা হয়ত আরো সহজ হতো। হিমবাহের ফাটলে বরফের তাপমান তখন মাইনাস দুশোর মতন। আপাদমস্তক শীতনিবারক পোশাকে ঢাকা। নাকে অক্সিজেন মাস্ক। ডুবুরিদের মতন পিঠে ঝোলানো সিলিণ্ডার। একেকটা পেরেক ঠোকার পর ঐ পেরেকে দড়ির গিট জড়ায় এবং ঝুঁকে পরবর্তী পেরেক ঠোকে। ফাটলের নানা জায়গায় নাকের মতন বা চমরি গাইয়ের শিঙের মতন বেরিয়ে থাকা বরফ ইস্পাতের ফলার মতন ক্ষুরধার। এত সাবধান থেকেও ওর জ্যাকেট কয়েক জায়গায় ফালা ফালা হয়ে গেছে।

খনি-শ্রমিকদের মতন হেলমেটের নিচে নাইট ভিশন চশমা। চশমার মাঝখানে বোতামে কপালের চাপ লেগে নির্গত আলোয় অতিকষ্টে সে নিচে নেমে যাচ্ছে। এতক্ষণে অনেকটা নেমেছে, প্রায় সত্তর ফিট। মাসখানেক আগেই বিয়াল্লিশ ফিট নিচে নেমে ফাটল থেকে এক সৈনিককে বাঁচিয়েছে উপেন্দ্রপ্রসাদ। প্রায় বাহান্ন ফিট নিচে আরেক মৃত সৈনিকের কোমরে দড়ি বেঁধে বেরিয়ে এসেছে দিন দশেক আগে। এত গভীরে পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি নামছে। হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে ক্রমে। ও উপরে ফিরতে পারবে তো? আবার কব্জিতে বাঁধা অলটিমিটার দেখে। আশি ফিট কমে গেছে উচ্চতা। এবার ওর মনে পড়ে মায়ের মুখ, স্ত্রীর চেহারা আর ছোট্ট কন্যাটির আদর। গতবার ছুটি থেকে ফেরার সময় ওর গালে কত আদার করেছে পুতুলটি!

না, মরলে চলবে না! ঐ পুতুলটার কথা মনে পড়তেই ও উদ্যম ফিরে পায়। আবার সন্তর্পণে নামতে থাকে উপেন্দ্রপ্রসাদ। কয়েক কদম নামার পর জমাট কালো কিছু একটা দেখতে পায়। অনেক আশা নিয়ে নিচে নামে। আরো কাছে যেতেই বুঝতে পারে একটা কালো কুকুর। ছুঁয়ে দেখে লোহার মতন কঠিন হয়ে আটকে আছে সেটা।

হিমবাহে সারিবদ্ধ হয়ে সৈনিকরা নিজেদের কোমরে দড়ি বেঁধে আট-দশজন একসঙ্গে পায়ে-পায়ে চলে। সামনে পথ দেখিয়ে চলে অভিজ্ঞ কুকুরেরা। দূর থেকে বরফের ধস্ নেমে আসার সংকেত এই কুকুরেরা জানান দেয় বিশেষ চিৎকারে। এরকম এক-একটা দলকে বলা হয় লিংক। শত্রুর গোলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে বেশির ভাগ লিংকই রাতের আঁধারে চলে। ওদের সঙ্গে থাকে একটা স্টিলের মই, কাঁধে রাইফেল এবং পিঠের রুকস্যাকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও কেরোসিন স্টোভ। লিংকে গিয়ে সৈনিকরা সহকর্মীদের রিলিভ করে। আবার রিলিভ হয়ে ওরা

লিংকেই নিকটবর্তী বেসে ফিরে যায়। তাছাড়া হেলিকপ্টার থেকে যেসব ড্রপিং জোনে খাবার-দাবার, কেরোসিন ইত্যাদি প্যারাশুটে বেঁধে ফেলা হয়, সেখান থেকে আনতে যায় এই লিংকেই।

অনেকসময় তাজা তুষারপাতে এই গভীর ফাটলগুলির মুখ ঢেকে যায়। আজ শেষ-রাতের লিংকে এই কুকুরটি সঙ্গে ছিল। পাশাপাশি চলছিলো লিংক নায়কের সঙ্গে। সেজন্যেই হয়ত কুকুর ও লিংক নায়ক একসঙ্গেই ফাটল ঢাকা তুষারে পা দিয়ে ফাটলে চলে যায়। তখনই শত্রুর গোলা আসতে শুরু করে। ভোর হয়ে আসছে। লিংকের অন্য সহকর্মীরা ওকে টেনে তোলার অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে অবশ্যম্ভাবী পতন অথবা গোলার হাত থেকে দ্রুত শেল্টার নেওয়ার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দড়ি কেটে চোখের জল মুছতে-মুছতে এগিয়ে যায়। সহসৈনিক মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন, প্রত্যেক সৈনিকের জীবনে সবচাইতে আপন, বছরে দশ মাস ওদের সঙ্গে কাটিয়ে সৈনিক দু'মাসের জন্যে নিজের গ্রামে-নিজের পরিবারের সঙ্গে কাটায়। সেজন্যে এই দড়ি কেটে এসে লিংকের বাকি সৈন্যদের এই দুঃখ, এই হাহাকার ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। গন্তব্যে পৌঁছেই ওরা পোস্ট কমাণ্ডার তথা টাইগারকে সব জানায়। আর তারপর হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস চলতে থাকে।

টাইগার রেডিও টেলিফোন সেটে বেসে জানালে বেস কমাণ্ডার সিয়াচিন ব্যাটল স্কুলের প্রশিক্ষক হাবিলদার উপেন্দ্রপ্রসাদ এবং সুবেদার তরসিম সিংকে আদেশ দেয়। ওদেরকে বিমানবাহিনীর এম.আই ১৭ হেলিকপ্টারে এনে এখানে প্যারাড্রপ করেই হেলিকপ্টার চলে যায়। দু'ঘন্টা পর ওদের নিতে চিতা হেলিকপ্টার আসবে পেছনের শৃঙ্গ এবং পাঁচটা কুতুবমিনারের মতন উঁচু বরফের দেওয়ালের কিনারা দিয়ে ঘুরে বাঁ পাশের শৃঙ্গের আড়ালে গড়া একমাত্র হেলিপ্যাডে। এখানে ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশি উড়লেই হেলিকপ্টার শত্রুর গোলার শিকার হতে পারে। তাই এই সতর্কতা।

তখন তরসিম সিং উপরে দাঁড়িয়ে নিজের কোমরে দড়ি বেঁধে কাছেরই একটা বিশাল বরফের চাঁইয়ে একপ্রান্ত পেঁচিয়ে স্তম্ভের মতন দাঁড়িয়ে। দড়ির অন্যপ্রান্ত উপেন্দ্রপ্রসাদের কোমরে বাঁধা। দড়ি নেমে যাচ্ছে তো নেমেই যাচ্ছে। একসময় থামলে তরসিম আশান্বিত হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার টান পড়ে দড়িতে। তরসিমের বুক ধক্ ধক্ করে। উপেন্দ্রপ্রসাদ এত ঝুঁকি নিচ্ছে কেন? এরপর তো ওকেই বাঁচানো কষ্টকর হবে।

এরপর আবার দড়ি নামতে থাকলে তরসিম দড়ি নাড়িয়ে সংকেত পাঠায়। তাড়াতাড়ি ফেরার সংকেত। দূরবীন দিয়ে শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য রাখে। ওরা কামান তাক করছে। তরসিমের নাভির কাছটা টনটন করে। বুকের পাঁজরে কী এক আশ্চর্য মৃত্যু-চেতনা ঠেলা দেয়। তখুনি, প্রায় এক মিনিট পর উপেন্দ্রপ্রসাদের জবাব আসে। কী দীর্ঘ সময় তারপর! সংকেত পেয়ে তরসিম খানিক উৎফুল্ল। যদিও ওদিকে কামান তৈরি। ও টার্গেট হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গোলা আসবে।

তরসিম অনেক ভারি ওজন টানার জন্যে দড়িটাকে আরেক প্যাঁচ কোমরে জড়ায়। পেছনের বরফের চাঁইয়ে বাঁধা প্রান্তটা টেনে দেখে নেয় একবার। সংকেত পেয়েই ধীরে ধীরে দড়ি টানা শুরু

করে। ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রচণ্ড গতি, ধাক্কায় বারবার পড়তে পড়তে নিজেকে সামলাতে কষ্ট হয়। শরীর মন একাগ্র করে ধীরে ধীরে দড়ি টানে তরসিম। এই সামান্য পরিশ্রম করেই ওর মাথা ঘোরে। অথচ প্রি-অলিম্পিকে ও ম্যারাথন দৌড়েছিল। সেকথা মনে পড়তেই শরীরে জোর পায় যেন । অক্সিজেন নেই তো দমে যাবে নাকি ! নতুন উদ্যমে দড়ি টানতে থাকে। ম্যারাথন থেকে এই দড়িটানা অনেক বেশি কষ্টের। অবশেষে উপেন্দ্রপ্রসাদকে দেখা যায়। তরসিম আরো সন্তর্পণে ওকে কাছে টানে। ফাটলে এতক্ষণ কাটিয়ে উঠে আসার পর হাঁটার শক্তিও থাকার কথা নয় ওর। একটু বাদেই ফাটল থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে এলে উপেন্দ্রপ্রসাদ ধপ্ করে বরফের উপর বসে পড়ে।

তরসিম কোমর থেকে দড়ি খুলে টলতে টলতে ওর কাছে গিয়ে বসে। মাস্ক সরিয়ে উপেন্দ্রপ্রসাদের কপালে চুমু খায়। ও মৃতদেহ তুলে আনতে পারে নি। নীল নাইলনের দড়ি মৃতদেহের কোমরে বেঁধে উঠে এসেছে। তরসিম পকেট থেকে একটা লাল পতাকা বের করে ঐ দড়ির অন্যপ্রান্তে গিঁট দিয়ে সেটাতে বিশাল বরফের চাঁইয়ে বেঁধে টাঙিয়ে দেয়। জুলাই আগস্ট মাসে যখন এই ফাটল কিছুটা চওড়া হবে, সৈনিকেরা এই পতাকা দেখে অবিকৃত মৃতদেহ টেনে তুলতে পারবে।

তখনই, ওদের দু'জনের মাঝখানে একটা পিলে চমকানো গোলা এসে পড়ে । তরসিম গড়াতে শুরু করে। বিপদ দেখে উপেন্দ্রপ্রসাদও গড়িয়ে যায়। ওরা গড়াতে গড়াতে ঐ বরফের বিশাল চাঁইটার পেছনে লুকোয়। তারপর কখনও বুকে হেঁটে কখনো হামাগুড়ি দিতে দিতে তিনঘন্টায় অতিক্রম করে প্রায় এক কি.মি পথ। এভাবেই সালতোরোর একটা শৃঙ্গের আড়ালে পৌঁছে যায় ওরা। মিশন পুরো করে এখানেই ফেরার কথা ছিল। যদিও নির্ধারিত সময়ের প্রায় একঘন্টা পরে পৌঁচেছে ।

ওদের দেখে আট-দশ জন জওয়ান এসে চ্যাংদোলা করে নিয়ে অপেক্ষারত চিতা হেলিকপ্টারে চড়িয়ে দেয়।

মন খারাপ হলে শরীর ভারি। তখন সুরিন্দরের চলতে ইচ্ছা করে না। কিছুই করতে মন চায় না। কিন্তু হিমবাহে নিরুপায়। বেঁচে থাকতে জল চাই । এক টিন কাঁচা বরফ গলালে হাফ লিটার জল হয় মাত্র। পাকা বরফ গলালে টিনের দুই তৃতীয়াংশ ভরে। কিন্তু আশপাশের সব পাকা বরফই কার্বনময়। পানীয় জলের জন্যে দরকার পরিত্যক্ত তাঁবুগুলির নিচে জমে থাকা পাকা বরফ। সুরিন্দর সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যায়।

সামনে সালতোরা পর্বতমালার সাদা শরীর ছুঁয়ে সদ্য উদ্ভুত হালকা মেঘমালা দ্রুত ভেসে যায়। স্মৃতিও ভাসে। কতদিন হয়ে গেছে। সেই নীরব চাহনি, ছুটি থেকে ফেরার সময় ফিরে ফিরে দেখা গ্রামের মেঠোপথ। ভাবতে ভাবতে সুরিন্দর সেই চাহনিতে ডুবে যেতে থাকে।

মন খারাপ হলে যে-কোন পথ অনিচ্ছায় ডুবে যায়। যে-কোন দূরত্ব দীর্ঘতর হয়। উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো বরফের পথ পেরিয়ে পুড়ে যাওয়া রাশিয়ান হাটের নিচে জমা কঠিন স্তম্ভের

কাছে দাঁড়িয়ে ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কেমন সুন্দর সদ্য তুষারপাত ঝলসানো বিকৃত অঙ্গগুলোকে ঢেকে ফেলেছে আগুণে পোড়া বধূর শরীরে ঢাকা সাদা চাদরের মতন।

আইস-অ্যাক্স উঁচিয়ে ধরেও ও একবার নামিয়ে নেয়। কষ্ট হয়। ভীষণ কষ্ট বিরহের চাইতেও তীব্র। অথবা তীব্র বিরহ। একদমই ইচ্ছে করে না ওই নিটোল বরফের স্তম্ভে কুড়ুলের দাঁত বসাতে। নিজের কাছেই এই অনিচ্ছার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। অথচ চারপাশে আর কোথাও এমনি নির্মল বরফ নেই। সপ্তাহখানেক ওরা কাঁচা বরফই বারবার গলিয়ে খেয়েছে। আজই প্রথম স্তম্ভটার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পারবে না। এই স্তম্ভের গায়ে আঘাত করা ভীষণ কঠিন। একদমই ইচ্ছে করছে না। এরকম হলে চলবে কেমন করে!

সুরিন্দর আইস অ্যাক্সটা সমস্ত শক্তি দিয়ে চাগিয়ে তোলে। কয়েকগুণ ওজন বেড়েছে এটার। সমস্ত মনোযোগ স্তম্ভের শরীরে কেন্দ্রীভূত করে কোপ বসায়; এক, দুই ....কুড়ি-একুশবার। একদমে জান লাগিয়ে বরফ কেটে মাথা ঘোরায়। খানিক দম নিয়ে একটা টিন শুইয়ে টুকরোগুলি ভেতরে নেয়। তারপর আইস-অ্যাক্সের উপর ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় যেন বুড়োমানুষ। অনেকক্ষণ হাঁপানি রোগীর মতন শ্বাস নেয়। আবার বরফ কাটে। পঁচিশ বছরের যুবকটি এখন মরিয়া।

টিন দু'টি ভরতে আধ-ঘন্টারও বেশি সময় লাগে। আরো কিছুক্ষণ জিরিয়ে এবার অ্যাক্সটিকে জ্যাকেটের হুকে ঝুলিয়ে বরফ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে টলমল পায়ে তাঁবুতে ফেরে। ততক্ষণে রবিশংকর ফিরেছে। জেনারেটার চালিয়ে বাল্ব জ্বেলেছে। সুরিন্দর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে মনে-মনে। হ্যাঁচকা দড়ি টেনে অনেক কষ্ট করে চালাতে হয় ওটা। এত কম তাপমানে যন্ত্রটি যে চলছে তাই অনেক। রবিশংকর এখন স্টোভের উপর ডালে তরকা মারছে। বরফ হয়ে যাওয়া ডাল গরম করতেই হতো, এখানে কুচি কুচি পেঁয়াজ মশলা ঘিয়ের প্রয়োগে একটু স্বাদ আনার চেষ্টা।

সুরিন্দর ঘরে ঢুকে দম নিতেই নাকে মশলার ঝাঁঝ লাগে। একটা বিরাট হ্যাঁচ্চো! সঙ্গে-সঙ্গেই পেটে খিল। একহাতে পেট চেপে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ও চিৎ হয়ে পড়ে বিছানায়। হায়-রে বিছানা! অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে সুরিন্দর। বিছানা ওকে নিয়ে তলিয়ে যেতে থাকে কোন্ অতলে।

রবিশংকর স্টোভের পাশে রাখা কিসমিস টিনের উপর থেকে দ্রুত উঠে এসে পাশে বসে। হা-করা মুখে অল্প অল্প ঢেলে দেয় গরম জল। সুরিন্দরের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। রবিশংকর ওর জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুক মালিশ করে।

অনেক পরে বিছানা আবার স্থির হয়। অন্ধকার দূরে সরে গিয়ে বাল্বের আলোয় দেবদূতের মতন রবিশংকরের মুখ দেখতে পায় সুরিন্দর। খানিক বাদে শক্তি ফিরে পেয়ে দুই হাতে বিছানায় ভর দেওয়া রবিশংকরের হাতটা জড়িয়ে ধরে। মনে হয় জন্মান্তরের সম্পর্ক এই ভিন-রাজ্যের সহকর্মীর সঙ্গে। রোজ পাশাপাশি শুয়ে ওর শরীরের এতদিন ধরে অসহ্য লাগা বোটকা গন্ধটাও আজ কত আপন! না জানি কেন, হঠাৎ ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ওর হাত জড়িয়ে ধরায় রবিশংকর মিষ্টি হেসে বলে, কী, বহুর কথা মনে পড়ছে বুঝি ? সুরিন্দর লজ্জা পায়। সত্যি মনে পড়ছে। সবসময়ই মনে পড়ে। দেবকী সবসময়ই স্মৃতিতে অম্লান । সুরিন্দর কৃতজ্ঞতা ভরে তাকিয়ে থাকে রবিশংকরের দিকে। ভাবে, নিশ্চয়ই আগের জন্মেও আমার খুব ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল!

ও এখনও বুক মালিশ করে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর সুরিন্দর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। সুরিন্দর স্টোভের দিকে এগিয়ে যায়। ডাল রাখে নিচে। না, ব্যথাটা আর নেই। পর্দা ঠেলে রামস্বরূপ ঢোকে। রামস্বরূপ মীনা। ওরা তখন রুটি সেঁকছে। একটা খালি জেরিক্যান টেনে নিয়ে রামস্বরূপও মাঝখানে বসে গ্লাভস্ খুলে হাত সেঁকতে শুরু করে। এই দুর্গম অঞ্চলে স্নো অ্যাণ্ড অ্যাভলাঞ্চেস্ স্ট্যাডি এস্টাব্লিশমেন্ট টাস্ক ফোর্সের নায়েক রামস্বরূপই ইদানিং একমাত্র সঙ্গী। এয়ারফোর্স টেন্টের পাশেই ওর তাঁবু। দূরবর্তী তাঁবুগুলিতে পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈনিকরা থাকে।

সেদিন এমনি হাত সেঁকছিলো সুরিন্দর। রামস্বরূপ ডোলচি নিয়ে গেছিল লঙ্গর। তখন ওরা রাশিয়ান হাট-এ থাকত। প্যারাশুটের তাঁবুর চাইতে ভ্যাকুয়াম দেওয়ালঅলা রাশিয়ান হাট কায়েকগুণ গরম। বুখারিও ছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে সারাইয়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে নীরব হয়ে গেছিল। বেস-ক্যাম্প থেকে খারাপ আবহাওয়ায় নতুন বার্ণারি আসতে পারছিল না। বুখারিটা ভাল থাকলে হয়ত সেদিন এই দুর্ঘটনা হতো না। এত দুর্ভোগও সইতে হতো না। ভীষণ আফশোস হয়। পুরো সাপ্লাই বেসে টাইগার বা পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার, অ্যাড জুটেন্ট আর ডাক্তার ছাড়া একমাত্রা এয়ারফোর্স হাটেই বুখারি ছিল। সুরিন্দর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এখানে দিন-তারিখ-তিথি-নক্ষত্র একাকার। আজ সোম না শনি ? দ্বিধান্বিত সৈনিক বোকার মতন হেসে বলবে, রবি অথবা মঙ্গল ! দিন-তারিখ জানতে হলে যাও রেডিওঅলার কাছে। এখানে ফিসফিস করে কথা বলা নিয়ম। রেডিও শুনতে হয় মৃদু আওয়াজে। সবসময় সতর্কতা। কোন শব্দ যাতে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে শত্রুপক্ষের কানে না পৌঁছোয়।

রেডিও বলেছে, আজ দীপাবলি। ওরা প্রস্তুত থাকে। দীপাবলি উপলক্ষে কয়েক রাউণ্ড গোলা উপহার অস্বাভাবিক নয়। প্রায় প্রতিদিনই গোলা বিনিময় হয়। তখন পোর্টেবল সেটটাকে নিয়ে আইস্-কেভ -এ গিয়ে ঢুকতে হয়। নাহলে যে কোন মুহূর্তেই কোন শেল বা স্প্লিন্টার জখম করতে পারে। মরে যাওয়ার চাইতে প্রতিবন্ধি হয়ে বেঁচে থাকার ভয় বেশি তাড়া করে। প্রতিবন্ধি হয়ে কোন সৈনিক বাঁচতে পারে না।

দীপাবলির খবর স্মৃতিভারাক্রান্ত করে। ওরা একে অন্যকে অতীতের রঙিন গল্প শোনায়। তারপর আনমনা রবিশংকর উঠে যায় জেনারেটরে পেট্রল ভরতে। সুরিন্দর স্টোভে হাত সেঁকে। এরকম নিস্প্রভ দীপাবলি জীবনে আসবে— কোনদিন কল্পনাও করেনি ওরা।

তখন বিকাল প্রায় পাঁচটা। হিমবাহে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। শ্রীরাম হোণ্ডা ভেতরে চালালে নির্গত ধোঁয়া চোখে জ্বালা ধরায়। বাতাসে অক্সিজেন নামমাত্র। তার উপর কার্বণ মনোক্সাইড আরো ক্ষতি করবে বলে এই ঠাণ্ডায়ও দরজার বাইরেই চালাতে হয়। ড্রপিং জোন্ থেকে কুতিয়ে হেঁচড়ে আনা পেট্রল ও কেরোসিন ভরা জেরিক্যানগুলি বাইরে সারি দিয়ে রাখা। তারই একটা থেকে পেট্রল ঢালতে বসেই চিৎকার শোনে, — গুপ্তা-গুপ্-তা-আ-আ-গ্-আ-আ-গ্......

ফানেল ফেলে ছুটে ঘরে ঢুকে দেখে স্টোভের আগুন নিচু ছাদে লেগে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। স্টোভের নিচে কাঠের ফাট্টাতেও আগুন। সুরিন্দর একটা ছালার বস্তা দিয়ে কখনো নিচে, কখনো

উপরে বোজাবার চেষ্টা করছে। বরিশংকরও আরেকটা বস্তা নিয়ে একই চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু আগুন ক্রমে সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। হঠাৎ এত অক্সিজেন এল কোত্থেকে? ও ভাবে, স্টোভটার হাওয়া খুলে দেবে। কিন্তু পৌঁছায় কার সাধ্য! ধোঁয়া আর পারপ্লেকস্ পোড়া গন্ধ আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হয় ওর বুকের বাতাসটুকুও বুঝি আগুন শুষে নেবে! অনেক দূর থেকে চিৎকার শোনে, গুপ্তা ছোড়্-ভাগ্-দরওয়াজা মে আগ্ —

সুরিন্দর ছুটে বেরিয়ে যায়। গুপ্তাও পেছন পেছন। দরজা দিয়ে বেরোতে দু'জনেরই জ্যাকেটে আগুন। ওরা বরফে গড়াতে থাকে। তখুনি বিশাল বিস্ফোরণ। গড়াতে গড়াতে বরফের ঢালে একজায়গায় আটকে দেখতে পায় ওদের জেনারেটার বোমার মতন ফেটে চারদিকে ছিটিয়ে পড়েছে। রাশিয়ান হাটের লেলিহান শিখা ছাড়া চারপাশে দর্শনীয় আর কিছু থাকে না। ওরা চোখ বন্ধ করে দেখতে পায়, অ্যাডজুটেন্ট ও কমাণ্ডিং অফিসারের রক্তচক্ষু। কিভাবে এই দুর্ঘটনার সাফাই দেবে কেউ ভাষা খুঁজে পায় না। দু'জনেই শীত— ভয়ে থরথর কাঁপতে থাকে।

ততক্ষণে হৈ-চৈ। এখানে মানুষ ছুটতে পারে না। কিন্তু আগুনে প্রায় পঞ্চাশেক কোফ্যাখ ঘন হয়ে একত্রিত। ঊষর মরুর উটের মতন এই বিস্তৃত হিমবাহে সৈনিকরা।

অপারেশান মেঘদূতে এটি অন্যতম সাপ্লাই বেস। এয়ারফোর্স হাট এখানে র‍্যাশন ড্রপিং এবং হেলিকপ্টার ফ্লাইং-এর নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য খবরের উৎস। ইনফেন্ট্রির কমাণ্ডিং অফিসার, অ্যাডজুটেন্ট এবং সৈনিকরা, এয়ার ডিফেন্স গান এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সৈনিকরা ও তরুণ সামরিক চিকিৎসক; মিনিট-কুড়ির মধ্যে সব্বাই সেখানে পৌঁছে যায়। জোয়ানরা কাঁচা-বরফ ছুঁড়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ও যে জতুগহ। সম্পূর্ণ ভস্ম না করে থামবে না অগ্নিদেব! বরিশংকর ওর কাঁধে হাত রাখে।

রামস্বরূপ এক মাইল দূরের লঙ্গর থেকে হৈ চৈ এবং আগুন দেখতে পেয়ে ছুটতে থাকে। অথচ পারে না। বরফের উঁচু নিচু পথে বারবার আছাড় খেয়ে ডোলচির ডাল জ্যাকেট ও প্যান্টের গায়ে মাখামাখি। তার সঙ্গে কাঁচা বরফ। একজায়গায় আবার দড়ি ঝুলে ধোঁয়া ওঠা বরফের ফাটল পার হয়ে আসতে হয়। অনেক কষ্টে রামস্বরূপ কাছে এসে দেখে, না, তার তাঁবুতে আগুন লাগেনি।

—এয়ারফোর্সের ছেলে দু'টি কোথায়? টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নায়েক মহাদেব আঙুল তুলে দেখায়, উধার-! সি.ও. সাহাব পুছতাছ কর রহা হ্যায়!

ভিড় ঠেলে দেখতে পায় দু'জনেরই চোখের পাতা এবং ভুরুর লোম ঝলসানো। পেছনে দাউ দাউ আগুন। রবিশংকর মাইনাস পঁচিশ-ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গ্লেসিয়ার প্যান্টের উপর শুধু ফৌজি সোয়েটার গায়ে ঠকঠক কাঁপছে। ও নিজের ডাল ও বরফ-মাখানো জ্যাকেটটা খুলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়। কোম্পানি হাবিলদার হাত টেনে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে, — সি-ও-সাব!

মাথায় কারেন্ট আসে। মীনার ছেলে নিজের অজান্তেই বাজ পড়ার মতন চেঁচিয়ে বলে, তো ক্যায়া হুয়া? সাহাব ভি ইনসান হ্যায়, দেখতে নেহি দোনো ক্যাইসে কাঁপ রহা হ্যায়! ওর কথায় সি.ও এবং অ্যাডজুটেন্ট যেন সম্বিত ফিরে পায়। ওরা এতক্ষণ পুছতাছেই ব্যস্ত ছিল।

অ্যাডজুটেন্ট সঙ্গে-সঙ্গেই সিনিয়র জি.সি.ও.- কে বলে, সাহাব, জলদি ইনতাজাম কিজিয়ে, আউর তুমহারা ক্যায়া নাম, আজ তুম ভি আপনা টেন্ট মে নেহি শোওগে, ক্যায়া মালুম রাত কো যব তেজ হাওয়া চলেগা তো—

ঢুম-ঢাস্ শব্দে রাশিয়ান হাটের মেঝে কিম্বা দেওয়ালের পাশে রাখা জেরিক্যানগুলির বিস্ফোরণে সবাই কেঁপে ওঠে। যেন আর্টিলারি ফায়ারিং। রামস্বরূপ অ্যাডজুটেন্ট সাহেবের পুরো কথা না শুনেও ঘাড় নাড়ে। স্যালুট ঠোকে। ফৌজে মুখে-মুখে কথা বলার আদব নেই।

তখুনি ভোজবাজির মতন ঐ আগুণের আশেপাশে দু'টি পাকিস্তানি গোলা এসে পড়ায় সবাই দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে বরফে গড়াতে থাকে। তবু মহাদেবের পায়ে একটি স্প্লিন্টার লাগে। একটা চাপা অথচ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনে সবাই। সুরিন্দর দেখে স্প্লিন্টারে ক্ষতবিক্ষত গ্লেসিয়ার প্যান্ট ফেটে রক্তমাখা পালক উড়ছে।

ডাক্তার ক্যাপ্টেনসাহেব ও নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সঙ্গে-সঙ্গে মহাদেবকে ধরাধরি করে এম.আই রুমে নিয়ে যায়। এম.আই. রুমটি পাহাড়ের অন্যঢালে সবচাইতে বড় বরফের গুহায়। দেওয়ালে চট ও প্যারাশুটে পেরেক ঠুকে চারপাশ ঢাকা। গোটা চারেক ক্যাম্পখাট পাতা। ক্রমাগত শত্রুর গোলা আসতে থাকলে সবাই শেলটার নেয়। একটু পরেই এ পক্ষের কামান গর্জে ওঠে। ঘন্টাখানেক গোলা বিনিময় চলতে থাকে। তারপর একসময় প্রবল তুষারঝড় এসে দু'পক্ষকেই চুপ করিয়ে দেয়। ঐসময় কামান চালায় কার সাধ্য! প্রকৃতির তাণ্ডব চলতে থাকে।

❑ মাগো আমি নাম লেখাবো..........

সকালে চন্দ্রভানের স্টোভেই জল গরম করে বোতলে ভরে অলোক মাঠে যায়। ডানে লাদাখ পর্বতশ্রেণী, পেছনে সালতোরো পর্বতমালা আর বাঁয়ে, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিম কারাকোরাম। পাইলটরা এই খলসারের আকাশকে বলে ইয়াংকি জাংশান। সত্যি ! জায়গাটা ইংরেজি ওয়াই অক্ষরের মধ্যবিন্দু। দূরে নুব্রা ও শিয়োকের সঙ্গমস্থল চকচক করছে। সঙ্গমের কাছেই তিরিত গ্রামটি শিল্পীর আঁকা ছবির মতন। এখান থেকে খুব ছোট লাগছে। ভাল করে তাকিয়ে থেকেও কোন ধোঁয়া দেখতে পায় না। ঐ গ্রাম কি জনশূন্য ? সবাই কি অন্যকোথাও চলে গেছে প্রবল ঠাণ্ডার দাপটে ? তখনই মনে পড়ে এই ট্রানজিট ক্যাম্পেই কাজ করে ঐ গ্রামের কয়েকজন। তাহলে এখনও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছে তিরিত গ্রামের সবাই।

এখানে কোন গোলার শব্দ নেই। শান্ত- সমাহিত চারপাশ। বেশ ভাল লাগে। যুদ্ধের কোন আভাসও পাওয়া যায় না এই নির্জনপ্রায় ভূখণ্ডে। অথচ পঞ্চাশ কি.মি. এগিয়ে গেলেই আক্রমণ—প্রতি-আক্রমণ ধুন্দুমার কাণ্ড। ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তাড়াতাড়ি পা চালায় ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে। তখনই একটা দৃশ্যে ওর রক্ত ছলকে ওঠে। ও বোতল হাতে সটান দাঁড়িয়ে পড়ে। আহা, এমন দৃশ্য পৃথিবীর আর কেউ দেখলো না।

যে গ্রামটিকে ও এতক্ষণ ঘুমন্ত ভাবছিল হঠাৎ দেখে সেই গ্রামের ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে আকাশে

উঠছে ভারতের তেরঙা পতাকা। সঙ্গে হাততালির শব্দ। তিব্বতী-লাদাখি গ্রামবাসীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। ওর খুব ভাল লাগে। কিন্তু ঠাণ্ডার দাপটে একরকম ছুটে গিয়ে ব্যারাকে ঢোকে। সেখানেও লঙ্গরের পাশে কোয়ার্টার মাষ্টার পতাকা তুলছে। আজ ছাব্বিশে জানুয়ারি। কী ভীষণ ঠাণ্ডা-রে বাবা! পাঁচ মিনিট আগে গরম-জলে ধোয়া হাত এখন মনে হচ্ছে অবশ। উপেন্দ্রপ্রসাদের স্টোভে হাত গরম করতে বসে তখন বসে বসে কাটানো নিদ্রাহীন রাতের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে স্টোভের মিলিত উত্তাপে তৈরি সেই অভিনব বুখারির কথা। সেজন্যই মনে হয়, বুখারি কোন বস্তুর নাম হতে পারে না। যে কোন উষ্ণতার উৎসকেই বুখারি বলা যায়। যেমন কয়েক মুহূর্তের জন্যে তেরঙা পতাকা ঘিরে দাঁড়িয়ে উত্তাপ নিয়েছে লাদাখি তিব্বতীরা।

সেই সকালে দু'টো করে ভারি হাতরুটি আর এক হাতা করে ডাল খেয়ে যাত্রা শুরু খরদুঙলা গিরিপথে। পাহাড়ের গায়ে একেবেঁকে যাওয়া প্রতিটি গাড়ির চাকায় চেন লাগানো। চাকা যাতে বরফে না পিছলায়! ঘুঙুর বাজে ঘটাঙ-ঘটাঙ। ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। বাংলাদেশের যুদ্ধে আখাউড়া রোড দিয়ে ট্যাংকের আসা-যাওয়ার সময় এরকম শব্দ হতো। ওরা একবার রাস্তার দু'পাশে ভিড় করে যুদ্ধে যাওয়া সৈনিক দেখেছে। আগরতলার ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনিতে সারিবদ্ধ সেনাদের স্কুলের দিদিরা মালা পরিয়েছে। তেইশে জানুয়ারিতে হেডমাস্টার-মশাই যেমন মালা পরায় সুভাষ বসুর মূর্তিতে।

একটু পরেই গাড়ি ট্রাফিক কন্ট্রোল পোস্ট-এ দাঁড়িয়ে পড়ে। আধঘন্টা ধরে উল্টো-দিকের গাড়িগুলি নিচে নামে। এরা গত সন্ধ্যায় এখানেই আটকে ছিল। ততক্ষণে পেছনে এসে দাঁড়ায় ষোলটি গাড়ি। কনভয় ছাড়ে। সতেরটা গাড়ি একসঙ্গে। এ পথে এভাবে চলাই নিয়ম। দুর্গম, বিজন পথে কোন চালক যান্ত্রিক কোন সমস্যায় পড়লে অন্য চালকদের সাহায্য পায়। এই কনভয় শব্দটিও শৈশবের ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনিতেই প্রথম শোনা। সেই যুদ্ধের কনভয় দেখেই মায়ের কাছে বায়না ধরে মিলিটারি পোশাক কিনে দিতে। ওর আব্দার মেনে বাবা সেই সঙ্গে একটা বন্দুকও কিনে দেন। ওরা কি সেদিন জানতো এই পোশাকের টানে বাড়ির বড় ছেলে একদিন ঘরছাড়া হবে! কাঠের বন্দুকটা উঁচিয়ে তখন ওর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, মাগো আমি নাম লেখাবো দেশের সৈন্যদলে!

সেই আকাঙক্ষা আজ বাস্তবে পরিণত। হাসি পায়। সমস্ত শক্তি দিয়ে গোঁ গোঁ করতে-করতে গাড়িগুলি চড়াই, শুধু চড়াই অতিক্রম করে সর্পিল পথে ঘুরতে-ঘুরতে দুপুর বারোটার নর্থ পোলে এসে থামে। এত উজ্জ্বল সূর্যের কোন উত্তাপ নেই! একটি অপ্রশস্ত হেলিপ্যাড, আর্মির মেডিক্যাল ইনভেস্টিগেশন রুম এবং লঙ্গর। ভাত আর ডাল ছাড়া সবই টিনফুড। সিভিলিয়ান চালক এবং মোটর-কর্মীরাও আর্মির লঙ্গরে খায়। এখানে কর্মরত জওয়ানরা বরফ কেটে আনে বস্তায় করে। নাহলে প্রতিদিন এতজনের রান্না, পানীয় জল জোগাবে কেমন করে! এরা যুদ্ধকালীন তৎপরতার প্রায় ছুটে ছুটে কাজ করে। এত উচ্চতায় যতটা ছোটা যায়! অলোকের মনে হয় প্রবল ইচ্ছা ও দেশপ্রেমই শক্তি জোগাচ্ছে। এদের দেখে মানসিক শক্তি বাড়ে নিজেরও।

ট্রান্সপোর্টের পেছনে স্টোভ জ্বালিয়ে সবাই ঘিরে বসে। ঘন্টায় দশ থেকে পনের কি.মি.

গতিবেগে। মনে পড়ে বড়মুড়া-আঠারোমুড়া-লংতরাই, আসাম-আগরতলা রোড । সে পথেও এমনি ধীরে-ধীরে গাড়ি যায়। আগে ছিল হাতির দঙ্গল নেমে আসার ভয়, আর এখন উগ্রপন্থীর গুলির ভয়। যে-কোন গাছের আড়াল থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি এসে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। সেজন্যেই পৃথিবীর সমস্ত দরিদ্র দেশের সরকার ধনী দেশগুলির প্ররোচনায় অরণ্য সাফ করে শুধু সারি সারি ইউক্যালিপটাস লাগাচ্ছে যাতে সমাজ পরিবর্তনকামী বিপ্লবী কিম্বা রাষ্ট্রবিরোধী উগ্রপন্থীরা শেল্টার নিতে না পারে! খরদুঙলা গিরিপথে একটাও গাছ নেই। হাতি কিম্বা গুলির ভয়ও নেই। কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে ধস্ নামতে পারে। চালক সামান্য অসতর্ক হলেই গাড়িসুদ্ধ অতল খাদে গড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রায় দু'টো নাগাদ কনভয় থেমে যায়। প্রবল তুষারপাত । রাস্তায় বরফ হাঁটুসমান। গ্রেফের ক্রেন কুড়ি মিনিট ধরে রাস্তায় জমা বরফ সাফ করে। সাফ করতে করতে কনভয়কে ঘন্টায় সর্বাধিক দশ কি.মি. বেগে নিয়ে চলে মারাত্মক সাহস, শৌর্য ও অসংখ্য জীবনদানের ফসল লোহার বিমের সেতু পেরিয়ে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে। কয়েকহাজার ফুট নিচে নানা সময়ে গড়িয়ে পড়া অসংখ্য ফৌজিগাড়ির কঙ্কাল পাওয়া যাবে! হাজার বছর পরেও।

— আচ্ছা উপেন্দ্রপ্রসাদ, আপনি যে কোমরে দড়ি বেঁধে এসেছেন, সে-ই কি শেষরাতের লিংক থেকে হারিয়ে যাওয়া লোকটি, আপনি নিশ্চিত? অলোকের প্রশ্নে অবাক তাকায় ও । ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, হ্যাঁ!

— কেমন করে, চেহারা দেখেছেন?

— না, পেছন দিকটা উপরে ছিল! তবে আগে দেখা দিল্লীর কুকুরটা—

এখন গোঁ গোঁ শব্দে সম্ভবত ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে চড়াইয়ের দিকে, উপেন্দ্রর পরের কথা শুনতে পায় না অলোক। ওর মনে হয় মানুষেব প্রথম পর্বত-যাত্রা থেকেই কুকুরটি সঙ্গে চলতে শুরু করেছে। চলতে-চলতে-চলতে-চলতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণে মানুষ যখন দুর্গম পর্বত অতিক্রমের চেষ্টা করে, পর্বতের কোলে, উপত্যকায় বসতি স্থাপন শুরু করে, তখনই বারবার নেমে আসে মারাত্মক সব ধস্, আছড়ে পড়ে তুষারঝড় । তবু যুদ্ধ চলতে থাকে। ফেরার উপায় নেই । একসময় লিংকে চলতে চলতে বরফের ফাটলে আটকে যায় অসংখ্য মানুষ আর তার কুকুর। সশরীরে হাজার-হাজার বছর ধরে আটকে থাকে এরা। উপেন্দ্রপ্রসাদ কি কোন আদিম লোকের কোমরে দড়ি বেঁধে এসেছে! এই খরদুঙলাতেও কয়েক বছর পুরাণো মৃতদেহ শুয়ে আছে কয়েকশো বছর বা হাজার বছর পুরণো মৃতদেহের উপরে! ভাবতেই কেমন গায়ে কাঁটা দেয়!

একটু এগিয়েই খরদুঙলা বাবা হল্ট। এখানেও তেরঙা পতাকা। ওর দারুণ লাগে। কয়েক হাজার ফুট নিচে পাহাড়ের-গায়ে মেঘ ছুঁয়ে, কোথাও পাহাড়ে মেঘে জড়াজড়ি। খরদুঙলায় পৃথিবীর উচ্চতম গুম্ফা। এখানে ডুক্‌পা লামারা পালা করে এসে পনের-কুড়ি দিন করে থেকে যায়। ওর মনে হয় স্বপ্নের দেশ। কী ভয়ংকর ঠাণ্ডা। হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ করে চন্দ্রভান অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অলোক হতভম্ব।

চিৎকার করে সবাইকে ডাকে। নিজেরও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আর্মি মেডিক্যাল কোর-এর নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাক শুনে এসে সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে, কার্ডিয়াক ম্যাসাজ করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। উপেন্দ্রপ্রসাদ ওর মুখে অল্প অল্প করে গরম জল ঢেলে দেয়। অলোক ওর মাথা কোলে নিয়ে পেছনের ডালার মেঝেয় বসে থাকে। ঝাঁকুনিতে কষ্ট। তেমনি ঝাঁকুনি একবারে জমে যাওয়ার থেকে রক্ষাও করছে ওদের।

গুম্ফার পাশেই শিবমন্দির। মন্দিরের পাথরের দেওয়াল চুনকাম করা। এই শিবকেই সৈনিকরা খরদুঙলা বাবা বলে। এরপর উৎরাই শুরু। পরবর্তী ট্রাফিক চেক পোস্ট পেরিয়ে প্রায় কুড়ি মিনিট চলার পর ডানপাশে লাদাখের সর্বোচ্চ গ্রাম গংলাস। উপেন্দ্রপ্রসাদ গাইডের মতন সব বলে দিচ্ছে। প্রায় আট-দশবার এপথে আসা-যাওয়া করতে হয়েছে ওকে। পদগত অভিজ্ঞতা ! চন্দ্রভান জোরে-জোরে শ্বাস নিচ্ছে। এরকম বিশাল মানুষের শ্বাসকষ্ট হবে ভাবা যায় না! অলোক বাইরে তাকায়।

গংলাসের মাথায় বিশাল রিজার্ভার ট্যাংক। উপরেই কোথাও একটা উষ্ণ প্রস্রবণ। সেই জল মিশেই অন্য বরফগলা জল আবার বরফ হয়ে যায় না। এই জলে লেহ্ শহর পিপাসা মেটায়। চাষের জমিতে যাতে বাড়ি না বানাতে হয়, ওরা বাড়িগুলি ধাপে ধাপে বানিয়েছে। অলোক অবাব। — কোথাও চাষের জমি? উপেন্দ্রপ্রসাদ জাদুকরের মতন হাসে। ওর নাকের ব্যাণ্ডেজকে এখন মনে হচ্ছে জাদু ব্যাণ্ডেজ। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, এখন বরফে ঢাকা!

ও হেসে ফেলে। সত্যিই তো! এই উপেন্দ্রপ্রসাদ আর চন্দ্রভান না থাকলে গত তিন-চারটা দিন ওর অন্যরকম যেত। শুধু বরফ দেখত। বরফের নিচে লুকানো চাষের জমির খবর পেত না। মাথা ঝিমঝিম, গা গুলানোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে ওঠা পিঠের ব্যথায় মরে যেত। খরদুঙলার পর পাক্কা তিন ঘন্টা আঁকাবাঁকা সর্পিল উৎরাই। ঝাঁকুনির প্রাবল্যে যন্ত্রণা বাড়তে বাড়তে কোমর ও পিঠ ক্রমে অবশ। নিষ্প্রভ আকাশের নিচে ডানদিকে একটি ছোট পাহাড়ের মাথাজুড়ে তৈরি জাপানি গুম্ফার সৌন্দর্য ওকে বিন্দুমাত্র অভিভূত করে না। ঝাঁকুনির চোটে নাজেহাল অবস্থা। এরপরই আসে ওদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পালা। লেহ্ পৌঁছোলে কনভয় ভেঙে গাড়িগুলি যে যার রাস্তায় চলে যায়। উপত্যকায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। অলোক ওদের কথা দেয় জেনারেল হাসপাতালে দেখা করতে যাবে। এয়ারপোর্ট চৌরাহা ট্রান্সপোর্ট ছেড়ে হেঁটে 'হল অফ ফেম' বিল্ডিং-এর কাছে পৌঁছোতেই একটি স্পিতুকগামী বাস পেয়ে যায়। আজ মনে হচ্ছে এখানে কত অক্সিজেন! বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ও বাসে চড়ে। ভিড়ের উষ্ণতায় আবাম লাগে। স্থানীয় যাত্রীদের দীর্ঘ অস্নাত শরীর ও অধৌত পোশাকের গন্ধ আগে উৎকট লাগত। আজ আর খারাপ লাগে না।

জনবসতি মানেই যে উষ্ণতা তা অনুভব করে ভাল লাগে। বাসের স্পিকারে গান চলছে, ওম শান্তি ওম, শান্তি শান্তি ওম— একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ওর বুক থেকে। কেন যুদ্ধ হয়? যে সব যুবকরা দেশের শস্যক্ষেত্রে দিনরাত খেটে তুলে আনবে সোনার ফসল, তারাই যুদ্ধক্ষেত্রে মরণপণ লড়ে যাচ্ছে। কার স্বার্থে?

বিলেট পৌঁছে অলোক বেশ কিছু চিঠি পায়। কতদিন পর চিঠি। কোন্‌টা আগে পড়বে বুঝতে

পারে না। আনন্দে ভুলে যায় কোমর আর পিঠের যন্ত্রণা। দেড় মাসের খবর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপর। চারদিন ধরে শুধু জবাব লিখে যায়। লেখে আর কাটে। আবার নতুন করে লেখে। এটা ওর বরাবরের দুর্বলতা। অবশেষে যে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে তার শরীরেও লেগে থাকে অতৃপ্তি। আসলে ও তো আর লেখক নয় যে সাজিয়ে-গুছিয়ে অল্প জায়গায় লিখে ফেলবে। তবে সরকারি কোন কথা, যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ চিঠিতে থাকে না। অন্তরা লিখেছে অনেক চিঠিতেই নাকি 'সেন্সরড্' স্ট্যাম্প লাগানো থাকে। চিঠির বিষয় হয় একান্ত পারিবারিক, বড়জোর ব্যক্তিগত রোমান্স। প্রকৃতির বর্ণনাও স্থান উল্লেখের অজুহাতে নিষিদ্ধ।

তবু ওর চিঠি বড় হয়ে যায়। কখনো মনে হয় ঐগুলি চিঠি নয়। পুঞ্জীভূত আবেগ অতৃপ্তি ও স্মৃতির অদ্ভুত সংমিশ্রণে এক প্রলাপ। শুরু নেই। বর্তমানের মতন সত্য অথচ অলীক। এই অতৃপ্তির মধ্যেও আছে অদ্ভুত ভাললাগা যা ওকে তাড়িত করে। একটা চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে আবার নতুন করে একই চিঠির জবাব লিখতে বসে। ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

প্রথম দু'দিন ডিউটি নেই। গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। বিশেষ করে কোমর ও পিঠে। প্রিয়জন থেকে দূরে থাকলে যে-কোন সাধারণ ব্যথাও বেশি লাগে। ওয়াংচুক প্রতি সন্ধ্যায় বুখারিতে তোয়ালে গরম করে সেঁক দেয়। নুন দেওয়া গরম জলে তুলো ভিজিয়ে মেরুদণ্ডের ফোলা অংশে সেঁক দেয় প্রতি দুপুরে। দু'দিন শয্যাশায়ী থাকার পর তৃতীয় দিনে আবার চলাফেরা শুরু। থ্রি-টনার গাড়ির পেছনের ডালায় না বসে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে আসতে পারলেও হয়ত এতটা কষ্ট হতো না। কিন্তু ওখানে নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট বসে ছিল। ওয়াংচুকের এই শুশ্রূষা ও কোনদিন ভুলবে না। এখন প্রতিদিন ওকে অলোক এক বোতল করে কেরোসিন জোগাড় করে দেয়।

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম চলে আসে। অবিশ্বাস্য! কী হলো অন্তরার! অলোক ওর সর্বশেষ চিঠিটা খোলে। আজ থেকে মাত্র আট দিন আগের লেখা। ওতে শুধু ভাল না লাগার কথা, তোড়ার কথা লেখা। একজন বাবা দেখতে পাচেছ না তার আত্মজা কেমন তিলতিল করে বড় হচ্ছে। একটি চারাগাছের এক-একটি নতুন পাতা মেলার মতন পল্লবিত হচ্ছে তোড়ার কথাবার্তা, কাণ্ডকারখানা। অন্তরা সাহিত্যের ছাত্রী। কী সুন্দর তার বাংলা! গর্ব হয়। আবার ঈর্ষাও হয়। প্রতিদিন অবাক বিস্ময়ে বাবা কাছে না থাকা মেয়েটিকে লালন করে তার মা, কাকা, পিসি, ঠাকুর্দা, ঠাকুমা আর বড় বড় চিঠিতে প্রবাসী সৈনিককে জানায় প্রত্যেকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা। ও সে-সব পড়ে স্বপ্ন দেখে। ঘুমিয়ে স্বপ্ন। জেগে-জেগে স্বপ্ন। দেখতে-দেখতে ভাবে, ওরা সবাই কত ভালবাসে তাই তোড়ার বেড়ে ওঠার খুঁটিনাটি ওকে লেখে। ও প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। কী হয়েছে অন্তরার?

টেলিগ্রাম দেখাতেই ছুটি মঞ্জুর। কিন্তু আকাশ ঢেকে থাকে। তুষারপাত ছ'দিন লাগাতার। খরদুঙলার মাইনাস ছত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এসে মাইনাস বাইশ-তেইশ অলোকের তেমন কষ্টকর লাগে না। খারাপ লাগছে এই না যেতে পারা। প্রতিদিন টেলিগ্রামের অক্ষরগুলি আয়তনে বাড়ে। প্রতিদিন অক্ষরগুলির শ্লেটরঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

বৃদ্ধ-ছোগুল রোজ বুখারির নল সাফ করে দিয়ে যায়। এই করে পাঁচ লিটার কেরোসিন পায়। বুখারি রোজ সাফ না করালেও চলে। নিজেরাও করে নেওয়া যায়। ওরা বুড়োর ফোকলা

দাঁতের হাসি আর অদ্ভুত ভঙ্গিতে 'জুলে' শোনার জন্য, লাদাখের গল্প শোনার জন্যে রোজ ডাকে। নন্দ সিং ওকে দেখলেই নাতনির কথা জিজ্ঞেস করে। বুড়ো হাসিমুখে জবাব দেয়। অনর্গল নাতনির রূপ-গুণের বর্ণনা করতে থাকে। হয়ত বানিয়ে বলে। অলোকের তো সব কথা বিশ্বাসই হয় না। আবার হয়ত এমনি রূপকথার কন্যাটি রয়েছে। উৎসাহ ক্রমে আকাশ-ছোঁয়া হয়ে পড়ে। ওরা টগবগ করে ফুটতে থাকে।

অবশেষে একদিন নন্দ সিং আর সরোজ কুমার ঝা হাঁটতে হাঁটতে বুড়োর সঙ্গে চুগলাম্‌শর গিয়ে দেখে ছয় বছরের শিশু। ওরা শিশুটিকে টফি দিয়ে বুড়োর ঘরে ছাঙ খেয়ে ফিরে আসে। বুড়োর বর্ণনা অবশ্য মিথ্যে নয়। সত্যি মেয়েটি নাকি দারুণ ফুটফুটে! তবু সবাই নন্দ সিং ও সরোজকে ক্ষ্যাপায়। অলোক ভাবে, পৃথিবীর সব শিশুকন্যাই রূপবতী। শুধু রূপ দেখার চোখ থাকা চাই।

বিলেট থেকে চুগলাম্‌শর প্রায় সাত কি.মি.। বুড়ো রোজ জেরিক্যান পিঠে এই পথে যাওয়া-আসা করে দিনে দু'বার। দু'তিন দিন পরই বুড়ো আবার ওদের দেখে হেসে জিজ্ঞেস করে, কী আমার নাতনির কাছে আর যাবে না?

সরোজ বলে, অনেক দূর বাবা!

নন্দ বলে, আমি যাব আংকেল! নন্দ আবার যেতে চায়। এবার নাতনির জন্যে নয়। বুড়োর মেয়ের চোখে নাকি বিদ্যুৎ। ও-ই ছাঙ এনে দিয়েছিল আর বুড়োকে ওদের ভাষায় অনেকক্ষণ কী যেন বলেছিলো। ওরা ঠিক বুঝতে পারে নি খুশি হয়েছে নাকি বিরক্ত! একবারও হাসেনি অথচ চাহনির বিদ্যুৎ বারবার দেখেছে নন্দ সিং। গল্পে-গল্পে বুড়োর কাছে জেনেছে বুড়োর মেয়ে তাশি বিয়ে করেছে এক সমতলবাসীকে। লোকটা আর্মিতে চাকরি করে। ওদের কোম্পানি বদলি হয়ে মধ্যপ্রদেশে চলে গেছে। প্রতিবছর মে জুন মাসে এখানে ছুটি কাটাতে আসে। সমতলের গরমে ওরা থাকতে পারবে না বলেই নিয়ে যায় না। এইসব ঘটনাপরম্পরা জুড়ে নন্দ সিং একটা ইচ্ছা লালন করে। অলোকের মনে সন্দেহ জাগে। — তাশির পুরো নাম কি?

— তাশি ছোগুল, নন্দ সিং পাঞ্জাবি উচ্চারণে বলে। তখুনি একটা পোকা এর বাঁ কানের পাশে ঝিওম-ঝিওম শব্দ করতে থাকে। অলোক হাত নেড়ে সরাতে গিয়ে পোকাটিকে খুঁজে পায় না। কিন্তু শব্দটা তবু যায় না। নন্দ সিং বলে, ঠাণ্ডা লেগেছে, বুখারির পাশে বসবে চলো। এতক্ষণ ওরা ক্যারাম খেলছিল। সরোজ স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে বসে ডায়েরি লিখছে।

অলোকের মনে পড়ে সেই ঝুলন্ত সেতুর নিচে স্রোতে ভাসমান বরফের টুকরোগুলি দুই তীরের বরফ কচকচ কেটে যায়। রোদ তখন কুচি কুচি বরফের প্রিজমে পড়ে সাতরঙা ছটায়, মণিমাণিক্যে ভরিয়ে দেয় সিন্ধুর প্রবাহ। সেতুটা আরো দুলিয়ে হেঁটে যায় ওয়াঙ মো, ইয়ান ছান ও তাশি ছোগুল। তাশি তাহলে মেয়ের মা! তাশি বিরহিনী! গম্ভীর মেয়ে। তাশি একবার হেসেছে সেই যে বাসে! নন্দ সিংকে কিছু বলতে গিয়েও পারল না। উত্তাপেও ঝিওম-ঝিওম থামছে না।

তাশিদের দেখে নিজের কষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা করে অলোক। এত প্রতিকূল পরিবেশেও ওদের হাসি অকৃত্রিম। এখানে আলু বেগুণ সব পাথর। টমেটো ছুঁড়ে মারলে ফেটে রক্ত বেরোবে।

বরফ জমে ফ্যাকাশে। তাশিরা বছরের পর বছর এই বরফ খেয়ে কেমন করে বেঁচে থাকে! তাশির মেয়ে মোমো এভাবেই বড় হচ্ছে। তাশিও নিশ্চয়ই মোমোর কথা পাতার পর পাতা লিখে পাঠায় তার স্বামীকে। মরসুমি নাট্য-গোষ্ঠীতে অভিনয়ের পর ঘরের কাজকর্ম সামলে চিঠি লেখার সময়টি নিশ্চয়ই সযত্নে আলাদা করে রাখে। নিশ্চয়ই লেখে! আচ্ছা, অন্তরা কি পারবে কোন নাটকের নায়িকা হতে! কি জানি কেন মনে হয় অবাস্তব। অন্তরা অভিনয় করতে জানে না! আহ্লাদ জানে। জেদ জানে। কাতুকুতু দিলে পাখির ঝাপটা!

অন্তরা আর তাশির বিরহ কি একই রকম? তাশিও কি মাঝে মধ্যে অসুস্থ হয়? ওর খুব জানতে ইচ্ছে করে। বুখারির গণগণে উত্তাপে এতক্ষণে কানেব ঝিওম শব্দটা থেমেছে। সহকর্মীদের কথাবার্তা আবার শুনতে পাচ্ছে ও।

❑ নিজস্ব বুখারি

বরফ একদিন ওর মধ্যে ফ্যানটাসির বেলুন উড়িয়েছিল। আজ চুপসে ঐ লাল টমেটোর মতন পাথর। চরম বিরক্তি ক্রমে গ্রাস করছে দিন-রাত প্রতিটি ঘন্টা-মিনিট-সেকেণ্ডে। সড়কপথে উপশি মানালি হয়ে চণ্ডিগড় কিম্বা নিমু কারগিল পহেলগাম শ্রীনগর হয়ে জম্মু যাওয়ার বাস্তা বরফাবৃত। কোথাও-কোথাও ধস্ পড়ে অকেজো। তবু বোজ খবর নেয অলোক।

বরফ, বরফ আর বরফে গাছপালা ও সৈনিকদের চেহারায় বিরক্তির রেখাগুলি ক্রমে বাড়ছে। কতদিন একটিও পাতা গড়ায় নি। বিমান নেই। চিঠিপত্র নেই। দুঃশ্চিন্তা বাড়তে থাকে সবার মনে। সবাই ভূতের মতন চলাফেরা করে। প্রতিদিন বারে ভিড় বাড়ে। প্রতি সন্ধ্যায় রামেব চাহিদা বাড়ে। খিস্তি-খেউড়-ঝগড়া-মারামারি বমি করা—সব বাড়ে। আকাশ তবু নিরলস তুষারবর্ষণ করে। গাছেদের গায়ে বরফের আস্তরণ এত পুরু হয যে ওরা আর নিজেদের শরীর খুঁজে পায় না। ওরা কতদিন হলো একটিবারের জন্যেও নিজেদের ছায়া দেখেনি।

অবশেষে একদিন আকাশ পরিষ্কার দেখে সৈনিকবা সোৎসাহে রানওয়ে থেকে বরফ সাফ করে। বেতারে খবর আসে চণ্ডিগড় থেকে আই.এল.৭৬ আকাশে ডানা মেলেছে। আনন্দে যে যাকে সামনে পায় জড়িয়ে ধরে। তখনই দুরদর্শন জানায় দলবল নিয়ে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার হুমকি দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের জঙ্গী দলপতি। খুশির ঢেউটা এক ধাক্কায় বেলাভূমিতে আছড়ে ফেলে নিজেই ভেঙে মিলিয়ে যায়। বিলেট থেকে বেরোণোর মুখেই অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত ছুটি আটকে দেওয়ার নির্দেশ আসে। বিলেট কাঁপতে থাকে। অলোক অন্ধকার দেখে। ধপ্ করে বসে পড়ে শীতল মেঝেতে।

দেশের স্বার্থ নিঃসন্দেহে সবার উপরে। কিন্তু চোখের সামনে এত দিন পর বিমান এসে এক দঙ্গল সৈনিক ও বোঝাই মালপত্র রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে খালি ফিরে যায়, সে যে কত কষ্টের! হায় অন্তরা, দেশে এত ছেলে থাকতে তুমি একজন বায়ু-সৈনিককেই কেন বেছে নিয়েছিলে? অলোক ভাবে, না জানি ও এখন কেমন আছে! না জানি বাড়ির সবাই কি করছে? কী ভাবছে? তোড়াকে কেমন করে সামলাচ্ছে! অন্তরা বেঁচে আছে তো?

ঘুরতে ভাল লাগে না। মনে হয় প্রাণহীন সব গাছেরা সারিসারি দাঁড়িয়ে আছে, যন্ত্র কুকুরেরা বরফ খায় আর নিস্তেজ হয়ে যেখানে-সেখানে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে। লাদাখিদের হাসিমুখ দেখে মনে হয় সবাই করুণার দৃষ্টিতে তাকায়। ওদের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। চমরি গাইয়েরা অতিকায় যন্ত্রের মতন বরফের শরীরে খরচ-মচর শব্দ তুলে কিছু শুঁকতে শুঁকতে শুধু এগিয়ে যায়। ক্যান্টিনের বাইরে থেকে প্যাকিং-এর শুকনো খড় এবং কাগজের ছেঁড়া প্যাকিং-বাক্সগুলি খায়। এসব দৃশ্য বড় একঘেয়ে। সিনেমা অর্ধেক দেখেই অলোক ভিডিও হল থেকে বেরিয়ে আসে। প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট ও বিড়ি ফুঁকে ফুসফুস ধ্বংস করে। টিনফুড সব বিস্বাদ। শুধু লবণ আর ঝাল মাখিয়ে স্বাদ আনার চেষ্টা। পেট ভরে খেতে পারে না। নতুন উপসর্গ— পেটে জ্বালা। গ্যাস। ক্যারাম-দাবায় মন বসে না।

দূরদর্শনের একটি অনুষ্ঠানই শুধু মন দিয়ে শোনে— সংবাদ। মন্ত্রিদের কৃত্রিম হাসিমুখ, পাকিস্তানের নিন্দা, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত কী বললো! তারপরই উগ্রপন্থী, পুলিশ, দেশের নানাপ্রান্তে মিলিটারি রেইডের দৃশ্য। কোথাও সারিবদ্ধ আত্মসমর্পণ। কাশ্মীরে শুধু অস্ত্রশস্ত্র আর বরফ। বরফ এখানেও। তবু খবরের সময় টানটান বসে থাকে চেয়ারে। শরীর নেই। শুধু তাপহীন তপ। ঠাণ্ডা বাতাসের ঢেউ আছড়ে পড়ে। কুকুরগুলি এভাবেই বোবা হয়ে পড়েছে। বোবার উচ্ছ্বাস নেই। উত্তেজনা নেই। শুধু বরফে খাবার খোঁজে—

এগারোই ফেব্রুয়ারি উড়ি নালার কাছে খোজাবন্দিতে প্রায় একশো লোককে পাকিস্তানি পুলিশ আটকে দেয়। তঙ্গধারের ওপারে বিজলিধার গ্রামের কাছে ত্রিশ-জনকে ওদের সেনাবাহিনী এগোতে দেয় নি। না হলে যুদ্ধ লাগতই। দমবন্ধ প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিশ্চিন্ত অনুমোদনে বারোই ফেব্রুয়ারি থেকে আবার ছুটি যাওয়া শুরু। সবাই দারুণ খুশি! যদিও সংশয় থাকে। ফৌজে প্রতিটি মুহূর্তের গায়ে জড়িয়ে থাকে অনিশ্চয়তা।

এ.এন.১২ ছোট্ট বিমান। সেনাবাহিনীর জোয়ানদের সঙ্গে গেজেগুঁজে বসে আকাশে ওড়ে অলোক। দুই দেওয়ালের গায়ে ভাঁজ খোলা চেয়ারগুলি স্পঞ্জকুশন জাতীয় মেদবর্জিত। টানটান। শক্ত। সৈনিকরা বসবে বলেই হয়ত এমন! ওরা তো সব কষ্ট সহ্য করতেই পারে! যাত্রীসেবা আর সৈনিক পরিবহণ তো আর এক ব্যাপার নয়। বরঞ্চ মাল পরিবহণের সঙ্গে মিল রয়েছে। সৈন্যরা তো ভাড়া দিয়ে ফৌজি বিমানে ওঠে না!

বিমানের দু'পাশে দু'সারিতে বসা সৈনিকদের সবার পেটের সামনে দিয়ে মালপত্র বাঁধার মতন একটা চওড়া বেল্টদিয়ে বাঁধা। সামনের দিকে বসা কমিশন্ড অফিসারদের কতিপয় চেয়ারে অবশ্য স্বতন্ত্র বেল্ট। ও ঘাড় ঘুরিয়ে গোল জানালা দিয়ে নিচে তাকায়। বিমান লাদাখ জাঁসকর পবর্তমালা পেরিয়ে দ্রুত হিমালয়ের উপর দিয়ে উড়ছে।

সিমলা পাহাড় পেরোণোর পরই বিমান অনেক নিচে নেমে যায়। গাছপালা, ছোটছোট পুতুলের ঘরবাড়ি, গমের ক্ষেত, সবুজ, আহা সবুজ! ভেতরে তাকিয়ে দেখে সমস্ত সৈনিকরা এখন জানালা দিয়ে সবুজ দেখার জন্যে উদগ্রীব। সব্বার মুখে হাসি ফুটেছে।

চণ্ডিগড়ে জামাকাপড়ের বোঝা হাল্কা হয়। কী মিষ্টি রোদ এই সাজানো শহরে। জীবন্ত

অটোরিক্সায় চেপে আহা—কী মিষ্টি হাওয়া! পথে, ট্রেনে সব ভারি ভারি চাদর, সোয়েটার, ব্লেজার। অলোকের খালি ফুলশার্টেই ফাঁসফাস অবস্থা। আর ক্ষিদে। অন্যান্যবার ছুটি যাওয়ার সময় আনন্দে ক্ষিদেই থাকে না। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ছুটি যেতে খেতে পারতো না জাহাজের দুলুনিতে। এবার উল্টো। যা দেখছে, সবই খেতে ইচ্ছে করছে। অনেকদিন পর বুকভরে ভরপুর অক্সিজেন নিতে· পেরেছে বলেই হয়ত এত ক্ষিদে। যা খাচ্ছে হজম হয়ে যাচ্ছে নিমেষে।

রিজার্ভেশান না থাকায় ফৌজি ডাব্বায় উঠতে হয়। এখানেও ভিড়। কোনমতে এক জায়গায় স্যুটকেস্ দাঁড় করিয়ে ওতেই বসে পড়ে অলোক। বসে বসে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেলে নড়ে চড়ে বসে। তবু বসেই থাকতে হয়। নিজের অজান্তেই পাশের সীটে বসা ঘুমন্ত এক সৈনিকের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে ও। মাঝরাতে এক পরিচিত আওয়াজে ঘুম ভাঙে। তাকিয়ে দেখে পাশের ক্যুপ থেকে ডাকছে চন্দ্রভান। অলোক চন্দ্রভানের পাশে গুঁজে সীটে বসার জায়গা পেয়ে যায়। কথায় কথায় জানতে পারে চন্দ্রভান পরের এ.এন ১২তে চণ্ডিগড় এসেছে। সিট পাওয়ার কৃতজ্ঞতায় অলোক বলে, এই নিয়ে তৃতীয়বার আপনি আমাকে বাঁচালেন, কোমরের ব্যথাটা আজ আবার চাগিয়ে উঠেছে!

চন্দ্রভান মুচকি হেসে বলে, ঘরে গিয়ে লুগাইয়ের সেবা পাবে সব ঠিক হয়ে যাবে!

অলোক মাথা নাড়ে। চন্দ্রভান জানে না লুগাইয়ের সেবা পাবে সব ঠিক হয়ে যাবে!

অলোক মাথা নাড়ে। চন্দ্রভান জানে না লুগাইয়ের অসুস্থতার খবর পেয়েই ও ছুটি যাচ্ছে। মাত্র দু'সপ্তাহের ছুটি। না জানি কেমন আছে অন্তরা! ওর কথা, তোড়ার কথা মনে পড়তে এ মুহূর্তে কোন কষ্টই আর কষ্ট বলে মনে হয় না। ভোর চারটেয় চন্দ্রভান নেমে গেলে ভালমতন বসার জায়গা পেয়ে যায় অলোক। চন্দ্রভানের সহকর্মী রাহুল আমিন মালদার লোক। ছুটি যাচ্ছে বাড়িতে। ভদ্রলোক ভীষণ ফৌজি'গল্প বলতে ভালবাসে। কিন্তু অলোকের একদমই ঐসব শুনতে ভাল লাগছে না এখন। মস্তিষ্কের কোষগুলি সেই ভাল না লাগায় প্রশয় পেয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চায়। সমস্ত শরীর অবশ করে·ঝিমুনি আসে। সেই থেকে ঢুলতে-ঢুলতে আর, যে প্লাটফর্মে যা আসে গিলতে-গিলতে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা কাটে। মাঝরাতে পাকুড় স্টেশনে নেমে যায় রাহুল আমিন। আর তখনই হঠাৎ হাত পা টান করে ঘুমোনোর একটা সুযোগ পেয়ে যায় অলোক।

কলকাতা পৌঁছেই প্লেনের টিকিট কাটে টেলিগ্রাম দেখিয়ে। তার আগেই হাওড়া এম.সি.ওকে ফেরার রিজার্ভেশানে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অল্পদিনের ছুটিতে সৈনিকদের এমনি দীর্ঘযাত্রা বিনা রিজার্ভেশানের চলতে হয় শুধু প্রিয়জনদের কথা ভাবতে ভাবতে। রাতে ত্রিপুরা ভবন থেকে এস.টি.ডি.-তে শত চেষ্টা করেও কোন প্রতিবেশির নাম্বার পায় না।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে যাত্রীদের আগরতলার ভাষায় কথোপকথন সমস্ত অস্তিত্বে ঝংকার তোলে। তিন ঘন্টা লেট। সহযাত্রীরা বলছে, আগরতলার ফ্লাইট প্রায়ই দেরিতে যায়। অলোক ভাবে, শুধু বিমান কেন, ট্রেন-বাস কোর্টের কেস-অফিসের ফাইল-কোন্ জিনিসটা এই দেশে সময় মানে? এই দেরি এখন মানুষের গা-সওয়া। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। সৈনিকরা মরছে। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মতন। কেউ প্রতিবাদ করে না।

অবশ্য এই দেরি অলোকেরও অসহ্য লাগছে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত লাউঞ্জেও ভেতরে-ভেতরে ঘামছে অলোক। অবশেষে যাত্রীদের বিমানে যাওয়ার ঘোষণা শুনে এগিয়ে যায় সে। ঘোষিকার কণ্ঠস্বর কী মিষ্টি!

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকে না। অটো-রিক্সাতেই চেপে বসে। দু'পাশে ঘন সবুজ। কৃষ্ণচূড়ার সারি। বসন্তের রাজপাট কৃষ্ণচূড়া পলাশের লালে দুর্জয়নগর-লিচুবাগান-ভোলাগিরি-গুর্খাবস্তি-সার্কিট হাউস হয়ে বুদ্ধমন্দির অব্দি। তারপর লাফ দিয়ে কোলাহলের মাত্রা বেড়ে যায়। বরফের দেশ থেকে এসে যে কোন কোলাহল, কৈশোরের শহরটিও আজ অন্যরকম লাগে।

গলির মাথায় অটো দাঁড়ায়। রাস্তাটা অনেক ভেঙে গেছে। গেট ঠেলে ঢুকেই ও বাবাকে দেখতে পায়। সারা গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। বাবা বুকে জড়িয়ে ধরেন। ছোটভাই এসে হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে নেয়। মা, বোন সবার মুখে হাসি। বোন নাকি কালরাতেই ওকে স্বপ্নে দেখেছে। অলোকের চোখ চঞ্চল। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে দেখে দরজায় আলুথালু চুল এক পাগলি। অলোক বাঁ হাত বাড়িয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে ডান হাতে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে। — বাপ্-রে! অভিমানে সুন্দর নাকটা ফুলে ওঠেছে। অলোক হেসে জড়িয়ে ধরে। — থাক্! যদি মরতাম এতদিনে ভস্ম— ঝটকায় সরিয়ে দেয় অন্তরা।

অলোক কান টেনে ধরে, কী হইছিল? অন্তরা চোখের দিকে তাকায়। তাকিয়েই থাকে অলোকের কাঁধে হাত দু'টো রেখে অন্তরা। নিজের অতলান্ত গভীর, বাসনায় গাঢ় অথচ অনুসন্ধিৎসু চোখ দু'টি মেলে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। এতদিন না দেখাটা যেন পুঁষিয়ে নিচ্ছে। জলে ভরে ওঠে চোখ। এবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দৃঢ় আলিঙ্গন। ঐ সময় ওরা যে কাকে কী বলে কারোই মনে থাকে না পরে। অবশেষে বিছানায় মুখোমুখি বসে দু'জনেই দেখে পরস্পরের চোখ কেমন কোটরে ঢুকেছে। গাল চুপসে গেছে। কণ্ঠা প্রকট হয়েছে। বয়স বেড়েছে। অথবা কমে গেছে। ওরা কখনো অতীতে কখনো বর্তমানে।

ভীষণ ঘামছে অলোক। এত ভ্যাপসা জয়বায়ু! সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতেই হাঁপিয়ে যায় ও। স্নান-ঘরে ঢোকে। সিরেমোনিয়াল স্নান। গুণগুণ গান ধরে— দূরদ্বীপবাসিনী, চিনি তোমারে চিনি, দারুচিনির দেশে.......হঠাৎ একটা খট্‌কা লাগে। গান থেকে যায়। মনে হয় কোথাও এখনো বরফ। আগে অন্তরার আলিঙ্গন শিরায় শিরায় উত্তাল তরঙ্গ ডেকে আনতো। উত্তেজনায় থিরথির কাঁপতো সামান্য ছোঁয়ায়। কিন্তু আজ? যেন শীতঘুম ভাঙেনি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বুকে নিয়েও শিরা-ধমনিতে মনে হচ্ছে হিমবাহ।

সেই থেকে অস্বস্তিটা বারবারই আনমনা করে দিচ্ছে। সারা বিকাল হৈ-হৈ গল্প-গুজবে কাটে। তোড়া থেকে ঘুম উঠে প্রথম একঘন্টা কথাই বলে নি। অভিমানে ঠোঁট উল্টে থাকে। অনেক সাধ্যিসাধনার পর কাছে আসে। সেই যে লেপ্টে যায় আর ছাড়েনা। বাবার হাতেই ভাত খায়। অনেক ছড়া, গল্প শোনায়। বকর বকর।

সন্ধ্যায় মশার কামড়, গুড নাইটে র কেক মেশানো ধোঁয়া, আকাশবাণীর স্থানীয় সংবাদে

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের খবর, সবকিছু ছাপিয়ে একটা আতঙ্ক পেন্ডুলামের মতন দোল খায় আশঙ্কাময় লোডশেডিং -এ। রাতের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর কারেন্ট আসে।

শেষ পর্যন্ত বরফ ওকে এত নিস্ক্রিয় করে দেবে ভাবতেই পারেনি। তোড়াকে কোলে নিয়ে শোবার ঘরে পায়চারি করে। তোড়া ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে কাদা। অন্তরা বিছানা পাতছে। টানটান চাদর, বালিশ, বালিশের ঢাকনা, টানটান মশারি। আতঙ্ক নেমে আসে অলোকের সেমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। ওকে ফাঁসিকাঠে চড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে হৃৎপিণ্ডের হাপর প্রমাণ করছে যে ওখানে বরফ নেই। ব্যস্ত কামারশালা। পূর্ণগতিতে সিলিং ফ্যান ঘোরে। হাওয়ায় ওড়ে ক্যালেণ্ডার। অথচ কপালে জমা হয় বিন্দু বিন্দু ঘাম। এই তো মিনিট দশেক আগেই ও গা ধুয়ে এসেছে!

বিছানা হয়ে গেলে তোড়াকে রাবার-ক্লথের উপর পাতা কাঁথায় শুইয়ে দেয়। অলোক মশারির ভেতরে। অন্তরা আলো নিভিয়ে বেডলাইট জ্বালায়। মনের মতন সবুজ আলো। আহা, কতদিন পর! সমস্ত ঘরে এক স্বপ্নিল পরিবেশ। আয়েসে অলোক পাশবালিশ জড়িয়ে ধরে। স্নানঘর ঘুরে এসে অন্তরা ওর আর তোড়ার মাঝখানে ঢুকে পড়ে। মনে হচ্ছে অন্তরাকে এক অদৃশ্য শক্তি ভাসিয়ে নিয়ে আসছে ওর দিকে। রোগা হওয়ায় ওকে মনে হচ্ছে সদ্যযুবতী। ওর ঝলমলে চোখ দু'টি ক্রমশ কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে, স্বপ্নিল আলোয় ওই দৃষ্টি অন্ধ করে দিচ্ছে অলোককে। অবশেষে একেবারে সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে দু'হাত জড়িয়ে ধরে ল্যাভেন্ডার মিশ্রিত পরিচিত সুবাস। বাঁ কানে চুমু। গাল-কপাল চুম্বনে চন্দন দিয়ে সাজানো পুরনো খেলা অন্তরার। গলা-বুক-পেট সবখানে ঠোঁট ছুঁইয়ে অস্থির করে তোলে কখন যে অলোক ঘোড়ার পিঠে চাপে। পাগলা ঘোড়াটি ওকে নিয়ে এক আগুণের কুন্ডু থেকে অন্যতর উষ্ণতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

— কোথায় বরফ! এ যে দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি। অগ্ন্যুৎগার এবং লাভাস্রোতে সব বরফ গলে জল ও বাষ্পে বারবার চেতনার আকাশ রাঙিয়ে দেয়। এত উত্তাপ! বষর্ণও অনিবার্য। আর তারপর যখন শান্ত একটা প্রশ্ন অলোককে চমকে দেয়। — আমার বুকে তুমি আর কারে জায়গা দিলা?

— কী?

— এই যে পাগলের মতন কইতাছিলা — আনন্দে ভুইল্যা গেছ যে আমি

— কার নাম নিছিলাম?

— অই যে, বুখারি, আমার বুখারি—

অলোক হো-হো হাসতে শুরু করে। এত জোরে হাসে যে তোড়ার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

দো হংসো কা জোড়া বিছড় গয়ো-রে ....

আকাশবাণী লেহ্ থেকে সৈনিক ভাইদের জন্যে সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় প্রায় তিন ঘন্টা হিন্দি ফিল্মি গান প্রচারিত হয়। অলোক নিয়মিত শোনে। কিন্তু আজ এসময় বিরহগীত ওর ভাল লাগে না। নন্দ সিং এর রেডিওটা হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে। ভীষণ শরীর ব্যথা। বাকী সমকর্মীরা ডিনারের পর মেসের টি.ভি রুমে। ও চলে এসেছে। চিঠি লিখেছে কয়েকটা। তারপর স্লিপিং ব্যাগে

ঢুকে আকাশপাতাল ভাবছে। তখনই দরজা ঠেলে ঢোকে অঞ্জন কলিতা। কোমর থেকে রামের বোতল বের করে কাবার্ডের উপর ঠক্ করে রাখে। তারপর কোট-ফার-কা ও ওভার অল খুলে উলের পায়জামা ও সোয়েটার গায়ে দেয়। বুখরির উপর রাখা গরম জলের সস্‌প্যান থেকে গ্লাস জল নিয়ে চায়ের টেবিলে রাখে। ফোল্ডিং চেয়ার টেনে ওর বিছানার পাশেই বসে। অলোক বিরক্ত হয়। কিন্তু কি করবে? এই অসহ্য সহাবস্থানই আপাতত ওর বর্তমান। — কী মিত্রসাহেব, চুপচাপ শুয়ে, বাড়ির কথা ভাবছেন? অলোক জোর করে হাসে। — উঠে বসুন, মনখারাপ করে কিছু হবে না, যার কথা ভাবছেন সে আপনার কথা ভাবছে না, আসুন— এন্‌জয় উইথ মি! ওর বোধহয় হাসাটা ঠিক হয়নি। বেশি পাত্তা দিয়ে দিল হয়ত অজান্তেই। কিন্তু এই সময় ও অসহায়। বিলেটে আর কেউ নেই। মনটাও ভাল নেই। আওয়াজে যথাসম্ভব প্রত্যয় এনে বলে, নো থ্যাংক ইউ! এই কথায় লোকটা এক মুহূর্তে ওর দিকে তাকিয়ে কী ভাবে! তারপর বলে, আরে আসুন, সৈনিকদের এই দোষ, স্ত্রীর কথা ভীষণ ভাবে, পা-গ-ল একেকটা! অথচ বউগুলি চোখের আড়াল হলেই অন্য পুরুষ দেখে, যা দিনকাল পড়েছে মশাই, কোন শালীকে বিশ্বাস করা যায় না........

মদ খেয়ে আলফাল বকনেওয়ালাদের ও দু'চোখে দেখতে পারে না। বেশ রুষ্টস্বরে বলে— কলিতাসাহাব, বিরক্ত করবেন না, আপনি খাচ্ছেন , খান! ওর কঠোর বাক্যে লোকটা বোধহয় একটু বিচলিত হয় এবার। ও অপ্রস্তুত হাসে। বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে মদ ঢালে। গরম জল মেশায়। তারপর আবার বলতে শুরু করে, জানি, যে ভালবাসে, এসব শুনলে তার গোঁসা হয়— কলিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। — আমিও দা-রু-ণ ভালবাসতাম, ভাবতাম, আমার হৃদয়—

এবার ওর কথায় এমন একটা সুর ছিল যে অলোক তাকাতে বাধ্য হয়। ওর ফর্সা চেহারাটা একবার ভীষণ লাল হয়ে আবার ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আবার চোখের পাতা, গাল সামান্য টাক-পড়া মাথায় চুলের গোড়া অব্দি লাল হয়ে পর মুহূর্তেই আবার ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। কপালের দু'পাশে প্রকট শিরাগুলোর নীল রক্ত লাফিয়ে উঠতে দেখে অলোক। কলিতা সিগারেট ধরিয়ে গ্লাসে চুমুক দেয়। ওর মুখের রেখাগুলি এঁকে-বেঁকে ক্রমে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কিন্তু পর মুহূর্তেই লোকটার মুখে এক দুঃখী চেহারা ফুটে ওঠে। অলোকের মনে পড়ে সেই দুর্গন্ধময় ঘর। অল্প অলোতে পাশাপাশি খাটে সৈনিকদের সঙ্গম দৃশ্য! ঘেন্না করে। আবার ওর দুঃখী চেহারা দেখে সেই ঘেন্নাটা মিলিয়ে গিয়ে কিছুটা আগ্রহ জেগে ওঠে। কলিতা আরেক চুমুক দেয়। তারপর অদ্ভুত এক আন্তরিক কণ্ঠস্বরে বলে, দেড় বছর আগে ব্যাঙ্গালোর থেকে বদলি হয়ে এসেছি, একটা বাচ্চা ক্লাশ ওয়ানে অন্যটা লোয়ার কেজিতে, আপনার মতো শুয়ে-শুয়ে বউ-এর কথা, বাচ্চাদেরকথা ভাবতাম, কবে ছুটি যাব, কবে আবার বুকে নেব! কলিতা নব ঘুরিয়ে বুখারিতে তেলের যোগান দ্বিগুণ করে দেয়। — এমনি মাস-চারেক কাটার পর এক প্রতিবেশীর সংক্ষিপ্ত চিঠি, — কাম সুন, ইয়োর ওয়াইফ ইজ গোয়িং ম্যাড! তখন নিয়মিত বউয়ের চিঠি পেতাম, কত কথা লিখতো! এ চিঠি পেয়ে আমারই পাগল হওয়ার মতন অবস্থা। বিশ্বাস হচ্ছিলো না। সে রাতে বউয়ের প্রত্যেকটা চিঠি খুঁটিয়ে পড়েছি, — কই পাগলামির কোন লক্ষণ তো নেই! তবু অস্বস্তি ....

কাহিনী শুনতে-শুনতে অলোক উঠে বসে। বুখারির নল এতক্ষণে গণগণে লাল। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও কলিতার কপালে বিনবিন ঘাম। লোকটা দুমড়েমুচড়ে ফেলেছে যেন নিজেকে। নিজস্ব

সমস্ত দুঃখ কলিতার ঐ কষ্টের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ও উঠে গিয়ে নব ঘুরিয়ে বুখারিতে তেলের যোগান কমিয়ে দেয় খানিকটা। গ্লাসের পর গ্লাস সরবতের মতন চোঁ চোঁ টেনে বোতলটাই খালি করে ফেলে কলিতা। শেষদিকে বাক্যগুলি সব অসম্পূর্ণ। আওয়াজ জড়িয়ে যাচ্ছে। কলিতা আওয়াজ এত জড়ায় না কোনদিন। অনেক মদ খেয়েও স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু আজ যে এক নিদারুণ স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ কাহিনী শোনার পর শুধু অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিতে হয়। এ কাহিনী অনুভবের। ধরা-ছোঁয়ার অনেক গভীরে। ক্যানসারের মতন কুরে কুরে খায় মানুষের কোমল বৃত্তিগুলি। ধ্বংস করে দেয় সমস্ত সরলতা ও পৌরুষ। কলিতার দুঃখ-যন্ত্রণা ও সময় সংক্রামক। কপালের দু'পাশে শিরাগুলি দপদপ করতে থাকে বুখারির নব ঘুরিয়ে তেলের যোগান আরো কমিয়ে দেয় অলোক।

কথা শেষ না করেই কলিতা উঠে দাঁড়িয়ে টলতে-টলতে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। অলোক স্তব্ধ তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে। দরজাটা দাড়াম করে এসে লাগে দেওয়ালের ফ্রেমে। নিজস্ব দরজার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে পৃথিবীর সব দরজার প্রতি বিতৃষ্ণ এখন কলিতা। এক অব্যক্ত কষ্ট না কী যেন কফের মতন দলা পাকিয়ে অলোকের গলায় জমা হয়। ব্যথা করে। প্রবাসে এরকম প্রতারণার কথা শুনলে যে কেউ নিজের মানুষকেও সন্দেহ করতে শুরু করবে। অলোকের চোখ আটকায় সামান্থা ফক্সের ন্যুড ছবিটায়। মেয়েটা এখনও হাসছে। এই হাসির সঙ্গে মিশে যায় নন্দ সিং এর কাবার্ডের গায়ে চিপকানো গায়িকা অনুরাধার হাসি। এই দুই হাসির মাঝে হাসতে থাকে মিসেস জয়া কলিতা। জড়ানো গলায় কলিতা 'থুথু' শব্দে বলে, — আমি মুতি ওদের সতীপনায় —হঠাৎ বুখারির ভেতর ভক্ করে একটা শব্দ হয়। বোধহয় কার্বণ জমে গেছে। অলোক নবটা পুরো বন্ধ করে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে নলটায় ঠক্ ঠক্ মারে। হয়ত কিছু কার্বণ ঝরে পড়ে। ধোঁয়া বেরোনোর রাস্তাটা সাফ হয়ে যায়। আবার নল ঘুরিয়ে তেল ছাড়লে বুখারি আবার গরম হতে থাকে। অলোক কলিতাকে বোঝায়, তবু সাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সব বউরা এরকম হয় না, বেশির ভাগ ভারতীয় মেয়েরা এখনও পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ঐকান্তিক! — আপনি শালা বউয়ের ভেড়ুয়া — টলতে-টলতে বাইরে বেরোনোর সময় জড়ানো গলায় বলে কলিতা, আপনার সঙ্গে কোন কথা নেই—

পেচ্ছাব করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই— দড়াম! কলিতা লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। অনেক কষ্টে ওকে পাঁজাকোলে উঠিয়ে এনে বিছানায় শোয়ায় অলোক। বিড়বিড় করে অসংলগ্ন প্রলাপ বকছে। স্লিপিং ব্যাগটা গায়ে চাপিয়ে উপরে লেপ টান-টান করে দেয় অলোকের সারা শরীরে। এখন কলিতার গায়ে মদ মিশ্রিত বোঁটকা গন্ধ। পোশাক পাল্টে হাত মুখ ধুয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ বাইরের ঠাণ্ডায় দাঁড়ায়। নিঝুম স্পিতুক গ্রাম। এ সময় হাওয়া চলছে না। হালকা তুষারপাতে আকাশ দেখা যায় না। লাইট-পোস্টের আলো গুড়ি গুঁড়ি তুষারে প্রতিফলিত হয়ে একটা অপার্থিব দৃশ্যের জন্ম দিয়েছে। দূর থেকে একসঙ্গে আট-দশটা টর্চের আলো দেখে বুঝতে পারে বিলেটের অন্য ছেলেরা মেস থেকে ফিরছে। ও ঘরে ঢুকে বুখারির নব ঘুরিয়ে তেলের যোগান বাড়িয়ে দেয়। ঘরটা একটু গরম হোক। ঠাণ্ডা থেকে এসে ওরা একটু আরাম পাবে। প্রায় পাঁচ মিনিট বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেও কাঁপছে এখন। বুখারি ওরকম রেখেই স্লিপিং ব্যাগে ঢোকে। অন্যরাও এসে কিছুক্ষণ

নিজেদের গরম করে পোশাক ছাড়ে। তারপর হাত-পা সেঁকে জল-টল খেয়ে একে একে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ে। নন্দ সিং বুখারি ও আলো নিভিয়ে বিছানায় যায়। এ সময় কেউ একটিও শব্দ করে না। হয়ত ওদেরকে শুয়ে থাকতে দেখে ফিসফিস করে।

একসময় অন্ধকার ও নৈঃশব্দ্য চিরে পাশের বিছানা থেকে উঠে আসে এক অদ্ভুত বাদ্য। রক্তমাংসের বোতলটা নাক ডাকে। মদের গন্ধটা আজ দুঃখ মেশানো বলে অন্যরকম। অন্তরার বিষণ্ণ মুখটা মনে পড়ে, ওর হাসি, ওর কথা, ওর অতলান্ত গভীর, বাসনায় গাঢ় অথচ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সঙ্গে সামান্থা ফক্স অনুরাধা কিম্বা জয়া কলিতার কোনই মিল নেই। ও শুধু অন্তরার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোনোর চেষ্টা করে। মাথায় ভীষণ খুশ্‌কি হয়েছে। ভীষণ চুলকোয়। বালকালোভা পরে চুলের গোড়ায় গোড়ায় ব্যথা হয়েছে।

❑ ৪ঠা এপ্রিল আবার বেসক্যাম্প

লেহ্‌তে মেডিক্যাল অফিসারের অনুমতি নিয়ে ন্যাড়ামাথা করে এসেছে। আজ মাথাটা বেশ হালকা লাগছে। মাথায় সর্ষের তেল মেখে দারুণ লাগছে।

মনেই হচ্ছে না এপ্রিল মাস। ত্রিপুরায় এখন চৈত্র-বৈশাখের নিদারুণ গরম-মাঝে মধ্যে আচমকা কালবৈশাখীর দাপট। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ঘূর্ণি, বাংলাদেশের উপকূল ছাড়িয়ে পার্বত্য ত্রিপুরাকেও বিধ্বস্ত করে দেয় প্রায়ই। কালবৈশাখীর সময় ওখানে যেমন প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট তেমনি স্থায়ী শো-শো শব্দ এখানে অষ্টপ্রহর। তাপমান মাইনাস নয় দশমিক ছয়। সারা দিনের ক্লান্তিতে প্রতিদিন বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুম এসে অবশ করে দিচ্ছে ওকে। অলোক ঘুমে তলিয়ে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। ইদুঁরের উৎপাত ভীষণ। লম্ফঝম্প। রুটির টুকরো নিয়ে লেপের উপর কাড়াকাড়ি। লেপের নিচে স্লিপিং ব্যাগ। তখন দমবন্ধ অবস্থা। পাকিস্তানী গোলা আসতে থাকলে যেমন হিমবাহে সৈন্যরা গুহায় ঢুকে থাকে। পায়খানা পেচ্ছাব বন্ধ। মুখ বের করলে আঁচড়কামড় খেতে হবে।

একদিন তো রাত শেষ হওয়ার আগেই উঠে পড়তে হয় ওদের দাপাদাপিতে। তারারা জ্বলজ্বল করে। তারার আলোয় স্বপ্নের মতন লাগে এই তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গগুলি। নিঝুম নিস্তব্ধ মায়াবী উপত্যকা। পেচ্ছাব করে এসে স্টোভ জ্বালিয়ে জলগরম হতে দিয়ে আবার স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে এপাশ-ওপাশ করে অলোক। চিৎ, উপুড়, আবার চিৎ, আবার উপুড়। গতরাতে লেখা লাইন ক'টি মনে পড়ে, — চাঁদ উঠেছে মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্না আলো-ছায়া, বরফ কোথাও দুধ-সাদা রঙ কোথাও রুপোর পাহাড়, বাতাস জুড়ে তুষারবাহী ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া, তাঁবুর সারি আলোর মালা স্মৃতির ঘোরে পাওয়া, অতীত সুখের অতীত দুখের জাবর কাটা সময়, বর্তমান এক বন্ধ্যা শরীর বন্ধ্যা রাতের ভয়, দুই উরুতে বন্দি ঘোড়া সহিস সংযমী, আত্মরতির সীমা নেই মৌচাক এত ভারি! ভাবিস কেন আমার কথা? অতীত ভাবিস না, আসিস কেন উড়তে পাশে? আগুন জ্বালাস না.....

জল গরম হলে উঠে ব্রাশ করে। মুখটা কিরকম টক টক হয়ে ছিল। জল খায়। তারপর হু-হু হাওয়া আর গোড়ালি ছাপানো বরফের মাঝে স্নো বুট পরা পায়ে সাবধানে হেঁটে গিয়ে পেঙ্গুইনের মতন প্রাতঃকৃত্য সারে। হুগুরে সেই অপারেশান করে দেওয়ার পর সকালে এই জল খেয়ে ওকে আর অপেক্ষা করতে হয় না। বেশিক্ষণ পেঙ্গুইন হয়েও থাকতে হয় না। ফিরে এসে আবার স্লিপিং ব্যাগে ঢোকে। এই রিলিফের জন্যে মনে মনে সেই সার্জেন মেজর সাহেবকে প্রণাম জানায়। এইবার ধীরে চ্যানেল অন করে রিসিভারটাকে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকিয়ে অপেক্ষায় থাকে। এখনও অনেকে সুখে নাক ডাকছে। অথবা নাক ডাকছে কোন দুঃস্বপ্নে।

প্রায় আধ ঘন্টা পর চিনে-কাকেদের বিচিত্র আওয়াজ শোনা যায়। তার সঙ্গে আবহে মিশে যায় আজব আওয়াজে কারো চাপা ধমক। প্রথমে বুঝতে পারেনি কিসের আওয়াজ। এখানে এ যাবৎ এরকম আওয়াজে কোন প্রাণীকে ডাকতে শোনে নি ওরা। জয়ন্ত পেঙ্গুইনের ভূমিকা সেরে এসে বলে, কুকুর ডাকছে, কোথা থেকে অজস্র চিনে-কাক এসে জমেছে। গতরাতে টিনের মাংস ওরা ভালমতন রান্না করতে পারেনি। এত বিতিকিচ্ছিরি তেতো নোনতা ঝাল মিশ্রিত বাজে স্বাদ হয়েছিল যে বেশির ভাগ মাংসই ফেলে দিতে হয়েছে। তার উপরেই হামলে পড়েছে এত কাক। কুকুরেরা হঠাৎ দেখে তাদের খাবারে ভাগ বসাচ্ছে অজস্র ক্ষুদে আগন্তুক। তাই এক মবিয়া আওয়াজ। ঘ্যাক ঘ্যাক ঘাও ঘাও—ভাঙা গলার প্রতিবাদ। ওদের ভোক্যালকর্ডই খারাপ হয়ে গেছে হয়ত। বরফ খেয়ে কত আর ভোক্যালকর্ড সুস্থ থাকবে?

জয়ন্ত চা তৈরি করে। অলোক অন্য কন্ট্রোল স্টেশানগুলিকে কল দেয়। ডাকে অবজারভেশান পোষ্টগুলিকে। লেহ থয়েশের সঙ্গে কনট্যাক্ট হয়ে যায়।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে চা খেয়ে ঘরটা ঝাড়ু দেয়। দু'জনে ধরে বুখারির নল সাফ করে গোড়ায় জমে থাকা গতকালের সিগারেট বিড়ির টুকরোগুলি ঝাড়ু দিয়ে বের করে। — জয়ন্ত, মুখ ধুয়ে আয়, বিচ্ছিরি গন্ধ হয়েছে—

— তুই তাহলে বুখারিটা ফিট করে আগুল জ্বালা, আমারও অসহ্য লাগছে এই গন্ধ, খুব অ্যাসিড হচ্ছে আজকাল— ও ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত ঘষতে শুরু করে। ও সন্তর্পণে এক-একটা নল নাম্বার অনুযায়ী পরপর লাগিয়ে চেপেচুপে দেখে নেয় ঠিক আছে কিনা। তারপর তেল খুলে বুখারি জ্বালায়। জয়ন্ত হাসে, এক্সপার্ট হয়ে গেছিস দেখছি! ও হেসে বলে, না হয়ে উপায় আছে?

ধীরে গরম হয় বুখাবি আর নল। চারপাশে উত্তাপ ছড়ায়। স্টোভে গরম করে জয়ন্ত বাকিদের বেড-টী পরিবেশন করে। প্রতিদিন পালা করে ওরা এই কাজগুলি করে। এতে বাকিরা আরাম করতে পাড়ে। আগামী চার-দিন ও আর জয়ন্ত আরাম করবে। চা খেয়ে এক এক করে সবাই উঠে পড়ে। দু'জন-দু'জন করে বাইরে ঘুরে এসে বুখারির চারপাশে বসে পড়ে। থরথর করে কাঁপছে একেকজন। নব ঘুরিয়ে তেলের জোগান বাড়িয়ে দেয় কেউ। দেখতে-দেখতে টকটকে লাল হয়ে যায় ওর শরীর। অগ্নিবর্ণ নল। আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকের শরীরে। একটু গরম হয়ে ডোলচি হাতে লঙ্গর ঘুরে আসে জয়ন্ত। ততক্ষণে অলোক পরবর্তী আওয়ারলি কনট্যাক্ট সেরে নেয়।

জয়ন্ত ফিরলে পুরিগুলি বুখারির ছাদে গরম করে জ্যাম, কেউবা মাখন বা আচার মাখিয়ে খায়। অলোক খায় শুধু চিনি দিয়ে। সঙ্গে আরেক কাপ চা। বুখারির পাশে বসে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত হয়ে আবার বাইরে বেরোয়। মেঘের স্তর, আকাশ, বাতাসের গতি ও তাপমান দেখে আসে। আওয়ারলি ওয়েদার রিপোর্ট তৈরি করে রেডিও টেলিফোন সেটে পাঠিয়ে চিঠি লিখতে বসে। শরীরের অর্ধেকটা স্লিপিং ব্যাগে ঢোকানো। কী লিখবে চিঠিতে? অথচ লিখতেই হবে। চিঠি পেতে দেরি হলে সবাই চিন্তা করে। লিখতে হবে, ভাল আছি, সুস্থ আছি, ছুটি আসবো যত তাড়াতাড়ি পারি। তারপরই শুরু হয়ে যাবে আবেগের কথা, তোতা ময়না কি কাহানী, সৈনিকের ভালবাসা, কবিতা ও স্মৃতির অদ্ভুত মিশ্রণ। এখন মধ্য আকাশে ঝিনুকের মতন কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো টুকরো মেঘের মালা দেখে এসেছে। তাপমান মায়নাস তেইশ ডিগ্রি। এসব চিঠিতে লেখা যাবে না। চিঠি শেষ হলে কী লিখেছে আর পড়ে না। তৃপ্তিভরে পোস্ট করে আসে। শুধু জুতো খোলা আর জুতো গলানোর পার্থক্য। অন্তরা ঠিক বুঝবে। অন্তরা মনের মতন জবাব দেবে এক প্রলাপ আখ্যানের। লিখবে, অনেক কথাই বুঝিনি, কিন্তু আমার ভীষণ ভাল লাগে তুমি এমনি পাতাভরে লিখবে। তাহলেই বুঝবো, তুমি ঠিক আছো! এইটুকু ফাঁকা থাকলে আমার ভাল লাগে না।

চিঠির পাতার আকাশটা তখন ঝিনুকের মতন মেঘে ভরে যায়। একটু পরেই হয়ত এই টুকরোগুলি ছড়িয়ে পড়ে। ভেসে যায় আরো পূর্বে। অথচ অন্তরা এই মেঘ দেখতে পাবে না। ওর চেহারা যতই মনে পড়ে তোড়া, মা ও অঞ্জনার কথাও মনে পড়ে। আকাশ দেখে বোঝা যায় আর কিছুক্ষণ পরেই লো ক্লাউড নিয়ে ব্যাড ওয়েদার আসছে। তুষারপাতও হয়ত শুরু হবে দুপুরের মধ্যেই। মন খারাপ হয়ে যায়।

বিলেট ফিরতেই ছেলেরা হৈ-হৈ করে বলে এক আজব সমস্যার কথা। একটি মখ্‌পোল পাহাড় থেকে পা পিছলে নিচে পড়েছে। থেৎলে গেছে তার মাথা। ছিয়াত্তর কে.জি. ওজন। সৈনিকরা হৈ-হৈ করে মখপোলটাকে বাঁশে বেঁধে লঙ্গরে নিয়ে আসে। কিন্তু কাটার আগেই রুখে দাঁড়ায় এক পোর্টার।

❑ অলৌকিক মখ্‌পোল ও অসহায় ইয়াক

বিশাল কালো চমরি গাইটার পিঠ থেকে বরফে গড়িয়ে পড়ে পাঁজরে ক্ষুরের লাথির ব্যথায় অবশ হতে হতে ছিলিঙ পানচুক জানবাকের আবার মনে পড়ে যায় একটি অলৌকিক মখপোল আর ঠাকুর্দা ডাম্মা ডুলকুর কথা।

দু'দিন ধরে বরফ গলে পাহাড় ধুয়ে ঘোলা জল বয়ে যাচ্ছে নালা দিয়ে। চায়ের মতন রঙ। প্রকট মাটির গন্ধ। বিতিকিচ্ছিরি স্বাদ। যতই ফোটাও যতই ছাঁকো প্রায় একইরকম থেকে যায়। পুরো স্বচ্ছ হয় না। কুঁড়েমির সঙ্গে টিনফুডের বিক্রিয়ায় অনায়াসে গ্যাস হয়। অ্যাসিড হয়। বুক ব্যথা করে। সৈনিকদের ব্লাড-প্রেশার ওঠা-নামা করে। তাই তখন এখানকার পাথর ওখানে, ওখানকার নুড়ি এখানে জড়ো করে ওরা। ছিলিঙ পানচুক জানবাক তখন সতর্ক থাকে। সুযোগ

পেলেই ব্যক্তিগত কাজের আদেশ দেবে তাগড়া কোন হাবিলদার। এড়িয়ে যাওয়া তখন অসম্ভব। আবার সুবেদার সাহেবের কাজে পান থেকে চুন খসলেই গালি খেতে হবে।

এখন এত অসহায় পড়ে আছে পানচুক। কেউ হাত ধরে না তুললে কোনমতেই আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। মেরুদণ্ডটা কি ভেঙে গেছে? কোমরে ভীষণ যন্ত্রণা। এদিকে নুব্রার তীরে প্রচণ্ড হু-হু হাওয়া। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বরফের উপর শুয়ে পানচুকের মনে হয় এবার আর বাঁচবে না। আর কোন মানুষের মুখ বুঝি দেখা হলো না। মনে পড়ে সাসোমার ঝর্ণা। ছোট-ছোট গ্রাম তক্শা, হরগম, ফুপুচে পেরিয়ে এই তো সত্তর কি.মি. দূরেই ওর গ্রাম পানামিক গোগ্মা। গোগ্মার বিপরীতে নুব্রার ওপারে ইন্সা গুম্ফা ও কুবেত গ্রাম। ঐ কুবেতেই নুব্রা উপত্যকার সমস্ত পোর্টারদের নেতা লবজাঙ্গ স্টোক্ডানের বাড়ি। ১৯৮৫ সালে আর্মি অথরিটির সঙ্গে মজুরি ও সৈনিকদের ব্যবহার নিয়ে বিবাদের নেতা। জেলা প্রশাসনের মধ্যস্থতায় রফা হওয়ার পর থেকে গ্রাম-প্রধানদের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পোর্টারদের এখন ও-ই নিযুক্ত করে।

আজকের ঘটনা জানতে পারলে লবজাঙ্গ স্টোক্ডান এখুনি ছুটে আসবে। কিন্তু কখন খবর পাবে জানে না ছিলিঙ পানচুক জানবাক। জানে না ততক্ষণ ও বেঁচে থাকবে কিনা।

পানমিক গোগ্মার পরই এলাকার সবচাইতে বড় গ্রাম পানমিক। ব্লক পোস্ট অফিসে এলাকার সব চিঠিপত্র আসে। ফুড কর্পোরেশান অফ ইণ্ডিয়ার বড় গুদামে কতদিন পোর্টারের কাজ করেছে ও। কোনদিন এত অপমান সইতে হবে ভাবেনি। ছোটবেলার এই এলাকায় পাকিস্তানি সৈনিকদের অত্যাচার চলতো। নৃশংস ব্যবহার করতো ওরা তিব্বতিদের উপর। ক্রীতদাসের মতন খাটাত। সন্ধে হলেই বাড়ি-বাড়ি হামলে পড়তো মা-বোনদের উপর। লবজাঙ্গ স্টোকডানের দাদাও ছিলিঙ পানচুক জানবাকের বাবা প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাকিস্তানি সৈনিকদের পায়ুধর্ষণের শিকার হয়েছে। ওদের দু'জনকে ধরে নিয়ে উলঙ্গ করে হাত পা বেঁধে জেরিক্যানের বিছানায় ফেলে দু'দিন দু'রাত একে একে ছাউনির সব সৈনিক গণধর্ষণ করে। পায়ুদেশ থেকে রক্ত বেরিয়ে তিলে তিলে অসহ্য যন্ত্রণায় ফ্যাকাশে পাথর হয়ে যায় ওরা। তৃতীয় দিনে ওদের মৃতদেহ পানামিক চাঁদমারিতে নিয়ে গিয়ে টার্গেট বানিয়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করেছে সৈনিকরা। অসহায় গ্রামবাসী সব সহ্য করেছে। চার-দিকে পাহারারত পাকিস্তানি বন্দুকের নিশানা এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ারও কোন পথ ছিল না।

এখনও সেই রক্তাক্ত দৃশ্য চোখে ভাসে। বুলেটে ঝাঁঝরা করা দু'টি দেহ তুলে এনে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে গ্রামের মানুষ চিতায় তোলে। তারপর আর একমাসও পাকিস্তানিরা থাকতে পারে না এখানে। সুমুর গ্রাম থেকে পানচুক নামগিয়াল অনেক কষ্টে পালিয়ে গিয়ে লেহ্তে ওর দাদা কর্ণেল রিন্‌গ্‌ঝিনকে সব জানায়। একাত্তরের যুদ্ধে সুমুরের ছেলে কর্ণেল রিন্‌গ্‌ঝিন লাদাখ স্কোয়াড নিয়ে অসম সাহসিকতার সঙ্গে তুরতুক উপত্যকার ছিয়াশিটা গ্রাম পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত করে পরমবীর চক্র পেয়েছিলেন। এবারেও এই অত্যাচারের কাহিনী দিল্লিতে জানালেন তিনি। তারপর তো ১৯৮৪ সালের ১৩ই এপ্রিল প্রথম ভারতীয় প্যারাড্রপ হলো। আর শুরু হলো হিমবাহে যুদ্ধ। এখন গ্রামে-গ্রামে পনের-ষোল বয়সী অনেক ছেলে-মেয়েই পাকিস্তানি সৈনিকদের ঔরসজাত। ওর নিজের স্ত্রী কুঞ্জমই তো পাঞ্জাবি মেয়েদের মত দেখতে।

এ সময় কুঞ্জমের কথা খুব মনে পড়ে। কুঞ্জম হয়ত আর ওকে দেখতে পাবে না। কান্না পেয়ে যায় ছিলিঙ পানচুক জানবাকের। কোনমতেই ওঠে বসতে পারছে না। ও গোঙাতে থাকে। ভারতীয় সৈনিকরা এত নৃশংস হবে স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না।

পানামিকের পরের গ্রাম তিরিষা। বাঁ-দিকে পশ্চিম কারাকোরামের তিন পাহাড়ের মাঝে ছোট্ট নীল হ্রদ। প্রতিবছর বুদ্ধপূর্ণিমায় ইলকম, চামসেন, পিঞ্চিমিক আরো দূর-দূর থেকে লোকেরা জমায়েত হয়। মেলা বসে। পিঞ্চিমিকের পরের গ্রাম টেগারে এলাকার সবচাইতে প্রাচীন শিরপো গুম্ফা। এর লামা শিরপো ছুলটিঙ নিমা সর্বজনপূজ্য। এই শিরপো ছুলটিঙ নিমা ঠাকুর্দা ডাম্মা ডুলকুর প্রিয় বন্ধু। তিব্বত থেকে দালাই লামার যে অনুগামীরা এদেশে পালিয়ে আসে তার একটি গোষ্ঠীর নেতা এই ছুলটিঙ নিমা আর ঠাকুর্দা ডুলকু। ওরাই নুব্রা উপত্যকায় প্রথম বসতি স্থাপন করে।

বছরের পর বছর চেষ্টা করে ওরা সুমুর গ্রামে হাই-স্কুল আর পানামিকে সিনিয়র বেসিক স্কুল বসায়। এ জন্যে ওরা ফারুক আবদুল্লা এবং ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও স্মারকপত্র দিয়েছে। সে অনেক ইতিহাস। সুমুরের পর লাজুঙ। তারপরই তিরিত। তিরিতে নুব্রা ও শীয়োক মিলিত হয়েছে। মেলার শুরুতে তিরিত থেকেও লোকেরা তিরিষায় আসে। লাজুঙ গ্রামের লজ্জাবতী কুঞ্জমকে ছিলিঙ পানচুক জানবাক প্রথম দেখেছে সেই তিরিষার মেলায়। প্রস্তাব দিলে কুঞ্জমের মা সঙ্গে সঙ্গে রাজী। ডাম্মা ডুলকুর নাতি বলে কথা! তার উপর সুপুরুষ, সমস্ত লা এবং কাঙরি নখদর্পণে এই বয়সি ক'টি যুবকের রয়েছে?

একটি অলৌকিক মখ্‌পোলের গল্পের জন্য এই মেলা প্রসিদ্ধ। পুণ্যবানেরাই শুধু ঐ পাহাড়ি ছাগলটিকে দেখতে পায়। ইচ্ছাপূরণ মখ্‌পোল। মনে পড়ে ঠাকুর্দা সেই মখ্‌পোলটার পিঠে চেপেছিলেন। সবাই বলে, ডাম্মা ডুলকু নিশ্চয়ই জাতক। ছুলটিঙ নিমা গম্ভীর হয়ে যায়। সবাই বলে মুখটা তথাগতের মতন। সবার কথা সত্যি করে অলৌকিক মখ্‌পোল ছুটতে-ছুটতে পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। শিরপো ছুলটিঙ নিমা তার হাতের ছোট্ট ধর্মচক্রটা ঘোরাতে-ঘোরাতে বলে— ওম মণিপদ্মে হুম্ — ওম্ মণিপদ্মে হুম্ ......

এরপর অনেক দিন-মাস-বছর ওরা অপেক্ষা করেছে। ডাম্মা ডুলকু আর ফিরে আসেনি। ছিলিঙ পানচুক জানবাক সৈনিকদের সার্ভে টিমের সঙ্গে গাইড হয়ে বেশ কয়েকবার তিরিত থেকে খালসার, ডিগার-লা ও ওয়ারিশ্-লা বা শীয়োকের উৎস অব্দি কারাকোরাম পাসে গেছে। কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ পায়নি।

ছাতি গ্রাম থেকে ঘোড়ার পথ তিন-দিকে গেছে। প্রথমটা ওয়ারিশ্-লা দিয়ে সাবু গুম্ফা হয়ে লেহ্, দ্বিতীয়টা টাঙসে হয়ে দুরবুক, এবং তৃতীয়টা কারাকোরাম পাস্-সাসের লা হয়ে সাসোমায় ফিরে আসে। তৃতীয় পথেই ঠাকুর্দার খোঁজ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবচাইতে বেশি। কিন্তু অনেক খোঁজ করেও কোন হদিশ পাওয়া যায় নি।

যেমন আজকের পর থেকে ওর খোঁজও কেউ পাবে না। আজ সকালে পশ্চিম কারাকোরামের খাড়া ধার থেকে পা ফসকে প্রায় পাঁচ-হাজার ফিট নিচের উপত্যকায় পড়েছে একটি মখ্‌পোল।

আর্মির জওয়ানরা কেটে মাংস খাওয়ার জন্যে লঙ্গরে নিয়ে আসে। কিন্তু একজন ধর্মপ্রাণ বুদ্ধিস্ট হয়ে ও কি করে সেটা হতে দেয়! এ অঞ্চলের প্রবাদে তথাগত এখন মথ্‌পোল জাতক হয়ে রয়েছেন। সবাই নিশ্চিত ডাম্মা ডুলকু অলৌকিক মথ্‌পোলের পিঠে চেপে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন এবং তারপর মথ্‌পোল জাতক হয়ে পুণর্জন্ম লাভ করেছেন।

ছিলিঙ পানচুক জানবাক একথা কোম্পানি হাবিলদারকে বোঝালে ও হা হা করে হাসে। সুবেদার সাহেবকে বললে সুবেদার বলে, ঠিক হ্যায়, আজ আমরা তোমার ঠাকুর্দার মাংস খাবো—

ছিলিঙ পানচুক জানবাক অসহায় হয়ে পড়ে। ততক্ষণে লঙ্গরের কসাইখানায় পৌঁছে গেছে মথ্‌পোলের মৃতদেহ। ও গিয়ে সেই মৃতদেহের উপরই শুয়ে পড়ে। — দেখি কে কাটে মথ্‌পোল, তার আগে আমাকে কাটতে হবে।

কাছেই দাঁড়িয়ে লঙ্গরের পচা লাউ আর টমেটোর বস্তা সাবাড় করছিল একটা বিশাল কালো চমরি গাই। দু'জন হরিয়ানি সৈনিক তখন ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে ওটার পিঠে চাপিয়ে ওর হাত দু'টো চমরিগাইয়ের গলা জড়িয়ে বেঁধে দেয়। ছিলিঙ পানচুক জানবাক তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। চমরি গাইটা এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ওরা ছেড়ে দিতেই লেজ উপরে তুলের ভয়ে প্রাণীটা ছুটতে থাকে।

বারবার মাথা উপর নিচে করে। শিঙের গুঁতো লাগে ছিলিঙ পানচুক জানবাকের পিঠে। যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, ভয়ে বিমূঢ় জানবাক আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায় ওর হাত দু'টো ইয়াকের মাথা গলিয়ে বের করতে। অথচ প্যারাশুটের দড়ি বাঁধা হাত দু'টোকে কিছুতেই ও গলিয়ে আনতে পারে না। চমরি গাইয়ের মুখের সামনে ওর হাত এলে ওটা হা করে একটা কামড় দিয়ে আবার ছেড়ে দেয়। কব্জির হাড়গুলি বুঝি গুঁড়িয়ে যায়। আর তখনই পাথরে হোঁচট লেগে নুব্রার তীরে গড়িয়ে পড়ে গাইটা। হঠাৎ পতনে না জানি কেমন করে ওর হাতটা মাথা গলিয়ে বেরিয়ে আসে। ও ছিটকে পড়ে। চমরি গাইটা উঠে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে বোধহয় ভয় পেয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ে ওর বুকের উপর দিয়েই ছুটতে-ছুটতে উপত্যকা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এখন কোমরে ও পাঁজরে অসহ্য যন্ত্রণা। ও তলিয়ে যাচ্ছে। তার উপর ঠাণ্ডা হাওয়া। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। বাতাস ভারি। এখুনি তুষারপাত শুরু হবে। রাশি-রাশি বরফে চাপা পড়ে যাবে ছিলিঙ পানচুক জানবাক। কেউ জানতেও পারবে না, ওর নিথর দেহটা কোথায় পড়ে রয়েছে। কুঞ্জম কাঁদবে উদাস হয়ে। মা কাঁদবে বুক চাপড়ে। ভাবতে ভাবতে ও তলিয়ে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে মনে হয় কত দূর থেকে একটা হৈ-হল্লার শব্দ। তাহলে কি লবজাঙ্গ স্টোক্‌ডান খবর পেয়েছে! দলবল নিয়ে ছুটে আসছে ও? ওরা কি খুঁজে পাবে আদৌ। তবু একটা আশা নিয়ে জ্ঞান হারায় ছিলিঙ পানচুক জানবান্‌। কঠিন কোন পাহাড়ের অন্ধকার সুড়ঙ্গ অথবা গভীর শীতল ফাটলের অতলে তলিয়ে যেতে-যেতে দেখে একটা মথ্‌পোলের শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোতে হঠাৎ উজ্জ্বল গুহায় এক অসহায় ইয়াক দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলেছে এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে।

☐ নদী শুধু পাহাড়কে কাটতে জানে

দু'দিন ঘোলা জল খাওয়ার পর আজ তুষারপাতও অন্য নিরিখে আনন্দদায়ক। স্বচ্ছ জল খাবে ওরা। আঙুলের ব্যথায় চিঠি লেখা বন্ধ করে আবার হ্যাণ্ডসেট নিয়ে ও স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ে। দু'দিন ধরে লিখেও অলোক একটা ইনল্যাণ্ড ভরতে পারেনি। একটা ইনল্যাণ্ড ভরতে একজন সৈনিকের কতটা সময় লাগে! ও লিখে ফেলতে পারত। সন্ধ্যায় বুখারি সাফ করতে গিয়ে ডান-হাতের তর্জনী কেটে গেছে খানিকটা। ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স থেকে ড্রেসিং করে এসেছে। একটা মাত্র সেলাই লেগেছে। কিন্তু ভীষণ যন্ত্রণা। ছিলিঙ পানচুক জানবাকের পাঁজর ও দু'হাতের কব্জিতে মোট একুশটা সেলাই লাগাতে হয়েছে। এখনো ওর জ্ঞান ফেরেনি।

গতকাল ওকে নিয়ে চমরিগাইটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলে ঘটনাটা অনেকের নজরে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছে যায় বেস কমাণ্ডারের কাছে। তৎক্ষণাৎ জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। সুবেদার মেজর তখুনি ঐ দুই সিপাহিকে ডিটেইন করে কোয়ার্টার গার্ডে আনার নির্দেশ দেন। অ্যাডজুটেন্ট প্রত্যক্ষদর্শী দুই সিপাহিকে সঙ্গে নিয়ে বেস কমাণ্ডারের সঙ্গে জিপে ওঠেন।

বেস কমাণ্ডার দুরবীন লাগিয়ে দূরে নুব্রার ধারে চমরি গাইটাকে ডিগবাজি খেতে দেখেন। কিছুদুর গিয়ে তাই জিপ থেকে নেমে পড়তে হয়। পেছন-পেছন রিকভারি ভ্যানটাও থেমে যায়। নেমে আসে আরো জনা-বিশেক সৈনিক। তারপর সবাই মিলে শুকনো কাঁটাগাছের ঝোপ আর বিশাল-বিশাল পাথরের চাঁই পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নুব্রার তীরে পৌঁছে যায়। অচৈতন্য যুবকটিকে স্ট্রেচারে তুলে দু'জন সৈনিক প্রায় ছুটতে-ছুটতে এনে রিকভারি ভ্যানে ওঠায়।

ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স ফিরে এলে রক্তাক্ত পোর্টারকে দেখতে আসা অসংখ্য সৈনিক হা-হুতাশ করতে থাকে। ঐ দুই বর্বর মাতালকে গালি দিতে থাকে সবাই। কোনরকম চার্জ ট্রায়াল ছাড়াই বেস-কমাণ্ডার আদেশ দেন এক মাস বালির বস্তা পিঠে চাপিয়ে ওদেরকে সকাল-বিকাল কোয়ার্টার গার্ডের চারপাশে পঞ্চাশ চক্কর লাগাতে হবে রোজ। বেস কমাণ্ডারের উত্তেজিত আদেশে সবাই নিশ্চুপ! রাগে গরগর করতে-করতে মেডিক্যাল অফিসারকে বলেন প্রতি ঘন্টায় ছেলেটার স্বাস্থ্যের খবর জানাতে।

ছিলিঙ পানচুক জানবাককে হাসপাতালে আনার এক ঘন্টা পরই অলোকের হাত কাটে। ঘটনাটা ওকে খুব ভাবিয়েছে! মানুষ এত নৃশংস হয় কেমন করে! বিনা প্ররোচনায় একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে! তোদের মাংস খাওয়া এতই জরুরী? ভাবতে-ভাবতে বুখারির নলের কোণ লেগে হাতটা কাটে। সঙ্গে সঙ্গে বিলেটে ঢুকে সাবান ও গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে যায়। জানবাকের তখন জ্ঞান ফিরেছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। মালটিপল ফ্র্যাকচার আর এতগুলি সেলাই দেখে অলোকের মাত্র একটা সেলাই নিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। এখনো ঠাণ্ডায় থাকলে এতটা যন্ত্রণা হয় না। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকলে বা বুখারির কাছে বসে লিখলে উত্তাপে যন্ত্রণা বাড়ে।

তবু লিখতে তো হবেই। আজই ইনল্যাণ্ডটা ভরে ফেলবে। অন্তরার চাই ভরাট চিঠি। প্রবাসী

সৈনিকের কাছে প্রোষিতভর্তৃকার সামান্য আব্দার; এইটুকু একটা চিঠি ভরে লিখতে পারো না তুমি! একথা শুনে জয়ন্ত হো-হো হাসে। অনেকদিন পর ।

জয়ন্ত কেমন যেন পাল্টে গেছে। আজকাল একদমই কথাবার্তা বলে না। সারাদিন সামরিক কাজ নিয়েই গম্ভীর । ব্যস্ত । অন্য-সময় নুব্রা ব্রিজের নিচে জমাট বরফের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ইত্তি-উত্তি বয়ে যাওয়া কুলকুল স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়ে । সবসময় আনমনা। হয়ত একমনে অন্তঃসলিলার আওয়াজ শোনে। একের পর এক সিগারেট ধরায়। সন্ধ্যা হলেই বিলেটে ফিরে মদ নিয়ে বসে বুখারির পাশে। চুপচাপ খায় চুমুক-চুমুক। কোন কোনদিন আর কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ে। কারো কথা শোনে না তখন। অলোকের কথাও শোনে না। গালিগালাজও করে না। চুপচাপ থাকে । তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

ভালই ঘুম। মাঝে-মধ্যেই নাসিকা গর্জন । অন্য ছেলেরা তাই নিয়ে হাসাহাসি করে। ওর খুব খারাপ লাগে। জয়ন্তর কী যে হয়েছে? ওর কথা ভেবে অলোকেরও ঠিকমতন খাওয়া হয় না। সবকিছু এমনিতেই বিস্বাদ! এখন মনে হয় অখাদ্য। তবু চেষ্টা করে। যতটা সম্ভব গলাধঃকরণ করে হাতমুখ ধুয়ে এসে স্লিপিং ব্যাগে ঢোকে। অলোক আর জয়ন্ত ছাড়া বাকি সবাই এখন বুখারির চারপাশে গোল হয়ে বসে তাস খেলছে। একেই বলে সৈনিক। বাঙ্কারে বসেও ওরা তাস খেলতে পারে।

গত দু'দিন ধরে ফ্রন্টে সাংঘাতিক লড়াই হচ্ছে। কোন-কোন জায়গায় শত্রুপক্ষ কুড়ি কি.মি. পিছিয়ে গেছে। দু'টো পোস্ট আবার ওরা দখল করেছে কমাণ্ডো অ্যাটাক করে । হেলিকপ্টারে গুরুতর আহত বারো জন ফিরে এসেছে। এদের কারো হাত, কারো পা কেটে বাদ দিতে হবে। দু'জনকে সঙ্গে সঙ্গে লেহ্ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অনেকে পোস্টেই আহত অবস্থায় পড়ে আছে। হেলিপ্যাড অব্দি নেমে আসতে পারে নি। প্রতি-মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষা। ওদের কথা ভাবলে পেট ভরে খাওয়া যায়? গোলা বিনিময় চলছে। টিনফুড খেয়ে সবারই পেটে গ্যাস হয়েছে। কোমর এদিক-ওদিক করে সব সশব্দে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রোজই এই অবস্থা। ভরদ্বাজের গোলার বিকট আওয়াজে জর্জ অ্যান্টনি হেসে ফেললে ভরদ্বাজ বলে, —হাসছো কেন ভাই? তুমি কি শেখ সাদীর কবিতা শোনোনি, হে পরী, পেট তো বাতাসের কাবাগার, বুদ্ধিমান একে বন্দী করে রাখে না, পেটকে বাতাস ধাক্কা দিলে, বের করে দাও— পাদো, কেন না পেটভর বাতাস বুকে পাথরেব মত আছড়ে পড়বে। ওর কথায় অ্যান্টনি আবার হেসে ফেলে। অলোক ভাবে। হে ভরদ্বাজের পীর, এই বাতাস তো সত্যি আমার বুকে পাথরের চাইতেও জোরে ধাক্কা মারছে। হায়, আমি কেমন করে মুক্তি পাই। সে ফ্লাস্কের ঢাকনা খুলে এক ঢাকনা গরম জল খায়। এবার একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেডিও টেলিফোনের খাপে রাখা হাত ধোয়ার সাবানে গুঁজে দেয়। তারপর চোখ বন্ধ করে মনে-মনে নজরুলের বিদ্রোহী আবৃত্তি করে, কামাল পাশা আবৃত্তি করে। আবার বিদ্রোহী, আবার কামাল পাশা। এভাবে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে একসময় ঘুমে তলিয়ে যায়।

শেষরাতে হঠাৎ জেগে শোনে — কেউ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে কী? ও জেগে আছে তো? আলতো চিমটি কাটে উরুতে। না, জেগেই আছে। কে কাঁদে তাহলে? ওর ডানদিকে জয়ন্ত

ছাড়া আর কেউ নেই। ধড়মড়িয়ে উঠে আধবসা অবস্থায় টর্চ জ্বালিয়ে দেখে সত্যি জয়ন্তের স্লিপিং ব্যাগই কান্নার সঙ্গে ফুলে-ফুলে উঠেছে। কী-রে জয়ন্ত, কী হলো তোর? জয়ন্ত জবাব দেয় না। কাঁদতেই থাকে। অলোক অবার ডাকে। ও তখন কান্না থামিয়ে চুপ হয়ে যায়। অথবা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। ডাকে সাড়া দেয় না। তখুনি পাহাড় কাঁপিয়ে গোলার শব্দ। ঝনঝন করে বিলেটের শরীর কাঁপে। ওদের বিছানা কাঁপে। ওরা কাঁপে। টর্চ টিপে দেখে জয়ন্তের স্লিপিং ব্যাগ তখনও নিয়মিত ফুলে ফুলে উঠেছে আর কেঁপে কেঁপে নামছে। একজন সৈনিক এরকম কাঁদছে ভাবাই যায় না! কেন কাঁদছে ও?

গতকাল হেলিকপ্টার দিয়ে মৃতদেহগুলি আনা যায় নি। আহতরা তো আগে আসবে! অথচ ঐ অঞ্চলের একমাত্র হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে না। এক্কেকবারে সীটে চার জন করে আহত সৈনিক বসিয়ে ফিরছে হেলিকপ্টারগুলি।

দুই আহত পাকিস্থানী কমাণ্ডোর করুণ অবস্থা। একজনের চোখ উপড়ে গেছে। অন্যজনের কাঁধে ও কোমরে স্প্লিন্টার লেগেছে। দু'জনেই যন্ত্রনায় ছটফট করছে। তার মধ্যেই এক হাবিলদার বিরাশি সিক্কা ঘুষি চালায় দু'জনের পেটে। একজনের মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। তখুনি ডাক্তার ক্যাপ্টেন নাম্বুদ্রিপাস এসে যাওয়ায় রক্ষে। অলোকের মনে হয় এই নৃশংসতাই যুদ্ধ। সৈনিকরা নৃশংস হবে না ত যুদ্ধ করবে কেমন করে! মানবিক দুঃখ-শোক, বিবেক বুদ্ধি-ই বরঞ্চ অ্যাবসার্ড এখানে।

সকালে ব্রেকফাস্টের পর জোর করে জয়ন্তকে নিয়ে ও ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে গিয়ে ছিলিঙ পানচুক জানবাক ও পাকিস্তানী কমাণ্ডো দু'জনকে দেখে আসে। ক্যাপ্টেন নাম্বুদ্রিপাদের চিকিৎসা ও নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের শুশ্রূষায় তিন জনই এযাত্রায় বেঁচে গেছে। যদিও উঠে দাঁড়াতে ওদের এখনো অনেকদিন লাগবে। আজ আবার পাসগুলি ঘন নিচু মেঘে ঢেকে আছে। জমাট কালো মেঘ থেকে দু'দিকেই প্রবল তুষারপাত হচ্ছে বোঝা যায়। তুষারপাত হচ্ছে হিমবাহের অনেক জায়গায়। রেডিও টেলিফোনিতে আবহাওয়ার শেষ খবর নিয়ে, এখানকার শেষ আওয়ালি ওয়েদার রিপোর্ট পাঠিয়ে, সেট অফ করে বিকেলে আবার ওরা ঘুরতে বেরোয়। টিনপুড হজম করতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই।

অলোকের প্রশ্নে জয়ন্ত ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে। কিন্তু পারে না। করুণ চাহনি। গলার বুটুলি ওঠানামা। চোয়াল নড়েচড়ে। চোখমুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। — না রে, ভীষণ কষ্ট— পারবো না, ক্ষমা কর—

— আবার ক্ষমা? ওকে টানতে টানতে অসমাপ্ত টেরাঙ টক্‌পো রোড ধরে হাঁটে অলোক — এসব চলবে না, বল্, তোকে বলতেই হবে—

জয়ন্ত হাত জড়িয়ে ধরে। —বিরক্ত করিস না প্লিজ — কাকে দোষ দেব? সব দোষ আমারই—

অলোকের মুখে কোন শব্দ জোটে না তখন। কে যেন আড়ালে বেহালার ছড় টানে শব্দহীন করুণ সুরে কিছুক্ষণ পাশাপাশি চুপচাপ হাঁটার পর অলোক সংযত প্রশ্ন করে, তোর বউবাচ্চা কি

এখনো চণ্ডিগড়েই?

—হ্যাঁ

—রবি বিয়ে-টিয়ে করেছে?

—জানিনা, ওর নাম উচ্চারণ করতে চাই না— নিচে খাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলেছে জয়ন্ত।

— কী ব্যাপার, ও এখন তোর কোয়ার্টারে—

— না, আরো ভাল চাকরি পেয়ে খড়গপুরে— বেশি মাইনে — এখানে ত অ্যাড্হক ছিল। ও একটা ঢিল ছুঁড়ে মারে খাদের দিকে।

বাঁ-পাশে ও সামনে কালো বরফের অজস্র টিলা এই বরফ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধোঁয়ায় মেঘ থেকে তুষার-বৃষ্টির ফল। বাঁদিকে প্রায় সাড়ে তিন কি.মি. দূরে সালতোরো রেঞ্জের উঁচু পাহাড়। সামনে প্রায় দশ মাইল দূরে গ্রেটার কারাকোরাম। মাঝখানের কালো বরফের টিলাগুলি সাদা বরফে ঢাকা। একদম কাছেরগুলির সাদা চাদর সরে গিয়ে কালো শরীর দেখা যায়। জয়ন্তের ঢিল এত কাছের কালো বরফ অব্দিও পৌঁছায় না।

অপেক্ষাকৃত নিচু বলে কালো বরফের লুঙ্গা টিলা বেয়ে সৈনিকদের উঁচু হিমবাহে চড়ার পথ। মাঝে মাঝে গভীর হাঁ কার ফাটল। এক মাইল দূরে দূরে লাল পতাকা টাঙিয়ে পথ চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই টেরাঙ টক্পোর দৈর্ঘ এখনো দশ কি.মি. হয়নি। গাড়ি করে পৃথিবীর ছাদে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কাজ শেষ হতে আরো অনেক বছর। শুধু গ্রীষ্মে কাজ সম্ভব বলে বছরে এক থেকে দেড় কি.মি. রাস্তা এগোয়। গ্রেফের জোয়ানরা প্রতি গ্রীষ্মে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটাই হবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ যানবাহন চলাচল-যোগ্য সড়ক। সৈনিকদের দুর্ভোগ কমবে। কামানগুলি আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। পেছনে কামান থাকলে পদাতিক সৈন্যের আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ হয়ে যায়— কোন বন্ধুকে একশো ভাগ বিশ্বাস করবি না—।

— কেন? ওর কথায় অলোকের তলপেট গুরগুর করে।

— থুঃ — ঠকে শিখলাম— পুরোপুরি বিশ্বাস করাই পাপ; নিজের কাছেই অপরাধী হতে হয়, যেমন হয়েছি—

—রবির কথা বলছিস?

— ঐ শালা এখন কী লেখে জানিস? আমি নাকি আর্থিক সুবিধার জন্যে— জয়ন্ত ঢোঁক গেলে, বাড়ি ভাড়া করে থাকলে ওকে কত দিতে হতো? মাসের শেষে দু'একদিন বাজার করাকে আর্থিক সাহায্য বলা যায় কি?

ডান-দিকের পাহাড়ের গা থেকে অঞ্জলি ভরে তাজা বরফ নিয়ে চেপে চেপে বল বানায় জয়ন্ত। স্নো বল। একহাতের গ্লাভস থেকে অন্য হাতের গ্লাভসে লোফালুফি করে।— হঠাৎ এমন লিখলো কেন? দাঁতে দাত চেপে বলে জয়ন্ত, সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে চেয়েছি— চিঠি লিখতে

মানা করেছি— তবু শালা লেখে—

— ও তোর কী ক্ষতি করেছে? জয়ন্ত চুপচাপ হাঁটতে থাকে। গতি যদিও শ্লথ। দু'-দু'বার গলা ঝাড়ে। —হিপনোটাইজ —শালার ভালমানুষি! আবার ঢোঁক গিলে বলে জয়ন্ত, বউটা এত আহাম্মক! এবার ওর শব্দে কান্না মেশানো।

— কেমন করে জানলি? অলোক আর ওর দিকে তাকাতে পারছে না।

ও মাথা নিচু করে বলে, লতাই বলেছে, গত-ছুটিতে রবির কিছু আচরণে গম্ভীর হয়ে গেছিলাম, রাতে বিছানায় বলে, জানি কেন, আগেই তো মানা করেছি, একটা ইয়ং ছেলেকে রেখ না—

ঝুরঝুর করে সশব্দে ডান-দিকের পাহাড় থেকে একটা ছোট্ট ধস্ টেরাগু টক্‌পোর শরীর প্রায় মিটারখানেক ভেঙে নিয়ে কালো বরফের দিকে নেমে যায়। জয়ন্ত থেমে যায়। স্নো-বলটা এ গ্লাভস ও গ্লাভস ঘুরে গলে-গলে ছোট হয়ে যায়। এ পথ বানানোর সময় পাথরের ধসে গ্রেফ-এর পাঁচ জন শ্রমিক মারা গেছে ১৯৮৭ সালে। হলুদ রঙে রাঙানো পাকা বেদিতে কালো অক্ষরে ওদের নাম লেখা। নাম পড়ে মনে হয় বিহার উড়িষ্যা সীমান্তের লোক ছিল ওরা। ধূপকাঠি গুঁজে গেছে এত বছর পরেও কেউ। নিশ্চয়ই কোন সহ-শ্রমিক। অনেকেই ভুলে যেতে পারে সবকিছু। কিন্তু কেউ-কেউ ভুলতে পারে না। দুপুরের পর উপত্যকায় রোদ উঠেছিল। এখন সমাধির উপর থেকে রোদ সরে-সরে সাদা তুষারাবৃত কালো বরফের উপর দিয়ে দূরে নেমে যাচ্ছে।

জাল গুটোনোর মতন কে যেন রোদের চাদর টানছে বাঁ-পাশের পাহাড়ের উপর থেকে। ওরা ফিরতে শুরু করে। ওঠার সময় যত কষ্ট নামার সময় ততটাই হাল্কা। শুধু জয়ন্ত'র দুঃখ ওর ঘাড়ের পেছনে, কানের উপর, কপালের দু'পাশে টিপটিপ করে। মনে পড়ে অঞ্জন কলিতার কষ্ট। অঞ্জনের স্ত্রী শ্রীলঙ্কার ক্যাডেটের সঙ্গে পালিয়েছে, জয়ন্ত'র বউ পালায় নি। পার্থক্য এইটুকু! দু'টো ঘটনার এই মিল ওকে অসহায় করে তোলে। ও বুঝতে পারে, নিজের মানসিক অবস্থা ছাড়া আর কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না? সে-ও ব্যক্তি ও ঘটনা-সাপেক্ষে। নিজের মানসিক অবস্থাও কি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়? মনে হয়, এজন্যে সময় ও শক্তির ব্যবহার বৃথা। শরীরও অনেক সময় মনের কথা শোনে না। তাই উদাসীন থাকো— যতটা পারো—

কিন্তু অলোক পারে না যে! সমস্যা থেকেই যায়। সবাই পালক না ভিজিয়ে সাঁতার কাটতে পারে না! ঐ কষ্ট থেকেই যায়। উপত্যকার বুক চিরে যায় নদী। এ সময় মনে হয় সৈনিকের জীবনে নারীও তেমনি। শুধু পাহাড়কে কাটতে জানে। খসে পড়া পাথর বয়ে স্রোতের ধাক্কায় ভেঙে ভেঙে একসময় বালি বানিয়ে তটভূমিতে ছড়িয়ে দিতে পারে। কখনো মিলনের, বন্ধনের উপায় হতে পারে না। দুই পাহাড়ের মাঝে সেতুবন্ধন হতে পারে রামধনু। বৃষ্টি এবং রোদ একসঙ্গে হলে রামধনু—ততটাই বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব!

— না, এত কষ্ট পেলে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে! নিজেকে বোঝায় অলোক। সৈনিককে অনেক কঠিন হতে হবে— আরো ডায়নামিক।

❑ রূপকথার গল্পে জন্ম নেয় নতুন রূপকথা

পেছন থেকে মনে হয় মিস্টার ওয়াকার, বালকালোভা টুপি আর কার্টিনা চশমা। পাথর আর বরফের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যায় কারপোরাল চিত্তরঞ্জন চৌধুরি। কিছু খাবারের লোভে অথবা নেহাৎই অভ্যাসবশে একটা কুকুর পেছনে চলছে যেন অরণ্যদেবের পোষা নেকড়ে ডেভিল।

অলোকের পরামর্শে ন্যাড়ামাথা করে তবে বালকালোভা পরেছে ও। হিমবাহে ভেটেরানরা এই টুপির নাম দিয়েছে বাল-খা-লোবা! সত্যি বেশিদিন মাথায় দিলে নাকি একসময় টাক পড়ে যায়।

এখানে আসার সময় আবাহাওয়ার বাধায় দু'তিন দিন চণ্ডিগড়ে আটকে পড়েছিল ও। তখন চিত্ত এবং প্রবালের সঙ্গে সাইকেল ৩১, ৩২, ৩৭ ও ৪৭ সেক্টর ঘুরেছে। সিনেমা দেখেছে। অনেক গল্প ....

এরকম কতজনের সঙ্গেই তো দোস্তি হয়। সেগুলি স্মৃতিতে থাকে আবার থাকে না। মুছে যায়। অন্য উজ্জ্বলতর স্মৃতির স্তূপে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এয়ারপোর্ট চৌরাহার কাছেই আদর্শ গ্রাম পুরস্কৃত বেহ্‌লানা বাজারে আখের রস খেতে গিয়ে চিত্ত হঠাৎ অন্যতর বিশিষ্ট হয়ে পড়ে অলোকের স্মৃতিতে। সেই সূত্র ধরেই চিত্ত আর ব্যক্তি থাকে না, প্রতীক হয়ে যায়। অসংখ্য ভারতীয় সৈনিকের প্রতিভূ।

আজ দুপুরে সাপ্তাহিক স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছিল অলোক। মাথায় ভীষণ ব্যথা। চুলের গোড়ায় গোড়ায় বাল-খা-লোবার ব্যথা। এখানে এই টুপি পরতেই হয়। আর চুলও উঠতে থাকে। তাই ডাকনাম চুলখেকো। ভাঙা আয়নায় একমুখ দাড়ি-গোঁফ। নিজের চেহারাটা অদ্ভুত লাগে। ওরও চুল উঠেছে। কপাল প্রশস্ত হচ্ছে। চোখ আরো গভীর অন্ধকারে ঢুকে পড়ছে। সাদা বরফ, সাদা প্রকৃতি দেখে চোখের কোণে কালি পড়ে কেন?

তখুনি ফাইবার গ্লাসের দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো কাচের জানালা দিয়ে দেখে এম.আই.১৭ থেকে নেমে একহাতে বেডিং আর অন্যহাতে স্যুটকেস নিয়ে এগিয়ে আসছে কেউ। দু'হাতে বোরোলিন নিয়ে অলোক কপালে, গালে, নাক ও ঠোঁটে ভাল করে ঘষে ঘষে লাগায়। চোখ বন্ধ করে চোখের পাতা এবং কালিমাময় কোটরেও বোরোলিন লাগায়।

ফাইবার বোর্ডের দরজা ঠেলে লোকটা বিলেটে ঢুকতেই চমকে ওঠে অলোক। চিত্তও অবাক। ও জানতো জয়ন্ত এখানে। অলোককে আশা করেনি। ওদের ইউনিটের কারপোরাল মুখুস্বামীকে রিলিভ করতে টেম্পোরারি ডিউটিতে এসেছে চিত্ত। অলোক জড়িয়ে ধরে ওকে। মনে হয় প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই ও এখানে এসেছে। ওকে আসতেই হতো। একবারও ওর কথা মনে আসেনি আগে। অথচ মনে হচ্ছে ওর আসা একটা অবধারিত ঘটনা। রূপকথার চরিত্ররা এমনি করেই হঠাৎ এসে যায়।

জয়ন্তও বিস্মিত আলিঙ্গনের পর ওকে বিছানায় এনে বসায়। ওর সঙ্গে লতা নারকেলের নাড়ু আর চিঠি পাঠিয়েছে। জয়ন্ত ডগমগ। সবাইকে নাড়ু খাওয়ায়। ওর মুখে হাসি দেখে সবাই

খুশি। সবাই নাড়ুর প্রশংসা করে। কাল ফির খায়েঙ্গে। কিন্তু লতার চিঠি পড়ে ওর হাসি মিলিয়ে যায়। ছেলেটার আমাশা হয়েছে। সেটাকে লতা মজা করে লিখেছে 'ম্যাগো হোপ'। ছেলের কষ্টে ওর মাথায় এত মজা আসে কোত্থেকে? সামান্য আমাশাই ঠিক মতন চিকিৎসা না করলে ক্রমে ক্রনিক আমাশায়য় পাল্টে যায় । বিলেটে সবার মনখারাপ হয়ে যায় । ক্রনিক আমাশায় সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। অলোকেরও তলপেটটা থেকে-থেকে কেমন মোচড় দেয়। আকাশ মেঘে ছেয়ে যায়। নবাগত চিত্ত এই সব ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে পায় না, কাম অন অলোকদা—

দ্রুত আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসছে দেখে হেলিকপ্টার তাড়াতাড়ি ফিরে যায়। এরা মুখুস্বামীকে বিছানাপত্র সহ আকাশে উড়িয়ে ফিরে আসে। এইটুকু মাল বহণে ভীষণ ক্লান্তি হয় এখানে। যদিও ওরা পালা করে বহণ করেছে। তবু দু'তিনটে করে রুটি খেয়ে ক্লান্তিতে টানটান ঘুমিয়ে কাটায় ওরা সারা-দুপুর। শুধু ঘুম আসে না জয়ন্ত'র।

আজ সামান্য এয়ার মেনটেন্যান্স হয়েছে। হেলিপ্যাডে অনেক লোড থাকা-থাক সাজানো রয়েছে। সেগুলি ত্রিপল-ঢাকা দিয়ে অসন্তোষে গজগজ করতে-করতে ফিরেছে লোডাররা। এগুলোর জন্যে অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে দূরবর্তী পোস্টার সৈনিকরা। কতজনের চিঠি আটকে রয়েছে? মায়ের চিঠি, ভাইয়ের চিঠি, স্ত্রীর চিঠি, কন্যার চিঠি।

জয়ন্ত দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকে। আগের চিঠিতে খবর পেয়েছে ছেলের আমাশা হয়েছে। তারপর পেরিয়ে গেছে এক যুগ। ছেলের আমাশা সেরেছে কিনা, ক্রনিক আমাশায় ভুগছে কিনা! কোন্ ডাক্তার দেখাচ্ছে কে জানে! মা হয়ে মজা করে 'ম্যাংগো হোপ' লেখে কেমন করে! ভারতীয় মায়ের সংজ্ঞাটাই পাল্টে গেছে আজকাল। হাওয়ার দাপটে দেওয়ালের ফাইবার সীটগুলি কাঁপে ভত-ভতর শব্দে। মনে হয় টিনের চাল কাঁপছে। শৈশবের কালবৈশাখি আসবে এখুনি। গগণে গরজে মেঘ ঘন বরষায়। আম পড়বে টিনের চালে। ওরা ছুটবে আম কুড়োতে। মা চিৎকার করে ডাকবে, জ-য়-বা-বা-তাড়া-তা-ড়ি ঘরে আয়— ঝ-ড় আস-বে বাবা-আ!

মায়ের ডাকে শিউরে ওঠে জয়ন্ত। আবার হাসি পায়। ঐ তাপমানে ঝড় আসবে বলে ভয় পেতে তুমি মা। এখন? মাইনাস পঁচিশ-ছাব্বিশে যুদ্ধ করছি। জয়ন্ত'র কান্না পেয়ে যায়। দূরে আছে বলে এখন মা দাদা-বৌদির মন রাখতে গিয়ে ওকে বঞ্চিত করে। দূরে আছে বলে স্ত্রী চিঠিতে লেখে ছেলের 'ম্যাংগো হোপ' হয়েছে। কতদিন সৈনিক এই ম্যাংগো হোপ নিয়ে বেঁচে থাকবে! এই ক্লীবের মতন বেঁচে থাকা আর ভাল লাগে না। অথচ মরতে ভীষণ ভয় জয়ন্ত'র। দু'-দুবার আত্মহত্যার কথা ভেবে-ভেবে ভাবনাটাকেই আর এগোতে দেয়নি।

বিকেলে ঘন তুষারপাত। সন্ধ্যায় চ্যানেল অফ হলে তিন-জনে ঘুরতে বেরোয়। আপাদমস্তক ঢেকে ওরা তখন নানা আকারের পেঙ্গুইন। থপ্-থপ্ টলতে-টলতে পা সামলে চলা শুধু । বিশালদেহী চিত্তকে মনে হচ্ছে ফ্যানটম। ওর পেছনে কুকুরটি ডেভিল। ঝিরঝিরি তুষারপাতে বেশি দূরের জিনিস দেখা যায় না। এসময় পাহাড় থেকে বিশাল একটা ধস্ এসে যদি চ্যাপ্টা করে দেয়! একটা অদ্ভুত মৃত্যু চেতনা কাজ করে জয়ন্ত'র মনে।

চারপাশের পাহাড়গুলি আর দেখা যায় না। অথচ ওদের বিশালত্ব মাথায় থাকে। ওরা

আকারে বাড়ে। ক্রমে উচ্চতায় একে অন্যকে ছাপিয়ে আকাশ ঢেকে দেয়। ভয় হয়—কখন কী ঘটে যায়! কিন্তু কিছুই হয় না। অতীত অস্পষ্ট। বর্তমান স্বল্প পরিসর; দুর্গম। ভবিষ্যত অন্ধকার। দুঃস্বপ্নের মতন ভয়ংকর এক দমবন্ধ পরিবেশ।

চিত্ত নবাগত, অনভ্যস্ত। এই তুষারপাত তবু দারুণ লাগছে। মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কোন রহস্য উদ্‌ঘাটনে চলছে ওরা। অলোক মেটেরোলজির লোক। চিত্ত জিজ্ঞেস করে, অলোকদা এইরকম কতদিন চলবে?

— কিছু বলা যায় না— হাইপোথেসিস্ নির্ভর আবহাওয়া বিজ্ঞান। দেখবি সমস্ত ওয়েদার ওয়ার্নিং বা কশনারি রিপোর্টে 'সম্ভাবনা' শব্দটির ব্যবহার, তবু সমতল বা সমুদ্র এলাকায় এত বেশি গবেষণা হয়েছে— অনেক কিছুই জোর দিয়ে বলা যায়! কিন্তু কোন বুলেটিন, উপগ্রহচিত্র রেফার করতে পারি না—

— এই ডিস্টারব্যান্সগুলি?

— ওয়েস্টার্ন এবং লোকাল ফেনোমেনা!

— মানে? বুঝিয়ে বলো একটু—

— কৃষ্ণসাগর থেকে ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, উত্তর-পাঞ্জাব, হিমাচল, জম্মু ও কাশ্মীরের উপর দিয়ে চিনদেশে বয়ে যায় এই ডিস্ট্যারব্যান্স, হিমালয়ের এপারে জাঁসকর — সালতোরো-কারাকোরাম-লাদাখ রেঞ্জে তুষারপাত—

— আর লোকাল ফেনোমেনা?

— উত্তর রাজস্থান, পাঞ্জাব, হিমাচল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের গমক্ষেত নদী হ্রদ থেকে জলীয় বাষ্প—

ডানদিকে টৈরাঙ-টক্‌পো রোড যেখান থেকে শুরু-তার কাছাকাছি দুই পাহাড়ের মাঝে জলপ্রপাত। কঠিন বরফের নিচ দিয়ে তিরতির জল নেমে আসে। ধারাপথে একটা বড় ট্যাংকে খানিকটা সঞ্চয় করে ওয়াটার-পয়েন্ট। সেখানে ক্লোরিন মিশিয়ে থ্রি টনার-ফোর টনার গাড়ির ক্যারিয়ারে ব্যারেল চাপিয়ে সমস্ত ব্যারাকে দেওয়া হয়। জয়ন্তর মনে হয় দুই পর্বতের মিলন-অশ্রু। তারই বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় গণ্ডুষ করে ওদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ফৌজি গাড়িগুলি। ওরা আকারে এত ছোট যে সবাই মিলে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। তৃষ্ণা মেটাচ্ছে দেশ। তৃষ্ণা মেটাচ্ছে সভ্যতা।

এই জল বয়ে যাচ্ছে নুব্রা থেকে শীয়োকে। শীয়োক থেকে সিন্ধু। মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা। কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও হে সৈনিক? এক সভ্যতা কালের স্রোতে ভেসে যায়। আরেক সভ্যতা জেগে ওঠে অন্য কোনখানে। সাক্ষী থাকে দেশের নাম, জাতির নামের অপভ্রংশ। সাক্ষী মৌন ভূখণ্ড, স্রোতস্বিনী, মৌন পাহাড়, এই পর্বতমালা। অথচ ভূ-তাত্ত্বিক সময়ের হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের প্রায় এক লক্ষ বছর পৃথিবীর ইতিহাসে এক লহমার ব্যাপার মাত্র। হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি সেই হিসেবে প্রায় ষাট সেকেণ্ডের মতন। প্রায় দশ কোটি বছর আগে ভারতীয় ভূ-খণ্ড আফ্রিকা, আন্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়ার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বছরে বারো সে.মি. করে

থেটিস্ সাগরে উত্তরমুখী ছুটতে শুরু করে। এভাবে পাঁচ কোটি বছর ধরে দীর্ঘ ছ'হাজার কি.মি. সমুদ্রপথ পেরিয়ে এই বিশাল ভূখণ্ড ঝাঁপিয়ে পড়ে এশিয়া মহাদেশের শরীরে। এই মহামিলন প্রথমে হয় লেটোর কাছাকাছি। এর পূর্বাভাস হিসেবে থেটিস সাগরে জেগে ওঠে কিছু আগ্নেয়গিরি। পরে এখানেই গড়ে ওঠে এই লাদাখ আর তিব্বত।

ভারতীয় ভূখণ্ডে অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ ঘুরে এশিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ জুড়ে গেলে সে-সব আগ্নেয়গিরি প্রতিবাদ করতে করতে প্রচণ্ড সংঘর্ষে চাপা পড়ে যায়, হিমালয়ের অজস্র শৃঙ্গ-উপশৃঙ্গের অংশ হয়ে পড়ে। থেটিস সাগরের অস্তিত্বই থাকে না আর। লাদাখের চৌদ্দ হাজার ফিট উচ্চতায় জলহস্তির কঙ্কাল প্রমাণ করে একদা উষ্ণ এবং জলমগ্ন অঞ্চল ছিল এটা। উঁচু পর্বতে প্রস্তরযুগের মানুষের কঙ্কাল প্রমাণ করে শেষদিকে হিমালয় মানুষের চোখের সামনেই বেড়ে ওঠেছে। জয়ন্ত ভাবে, এই ভূ-খণ্ড মৌন হলেও জীবন্ত, প্রকৃতি তাই বিচিত্র, ক্রমবর্ধমান এই পর্বতমালায় যে-কোন দিন হঠাৎ শুরু হয়ে যেতে পারে প্রবল ভূমিকম্প, জেগে উঠতে পারে বেশ কিছু আগ্নেয়গিরি। যেকোন মুহূর্তেই আবার সভ্যতার ভোল পাল্টে দিতে পারে প্রকৃতি।

মানুষ কত ক্ষুদ্র। বিশাল মৌনপ্রকৃতির শক্তিকেই জানে না ঠিকমতন। নিজেকে ভাবে ভূ-খণ্ডের অধীশ্বর। ভূখণ্ড নিয়ে লড়াইয়ে মারা যায় শত-সহস্র সৈনিক যুগে-যুগে। হায়-রে ক্ষমতার লড়াই!

মানুষ বুঝতেই পারে না আসল ক্ষমতা প্রকৃতির। মানুষ অন্ধের হাতি-দর্শনের গল্পের মতন নানা যুগে কুলো-মুলো-থাম ও সাপ আবিষ্কারের মাধ্যমে একটা আবছা ধারণা তৈরি করেছে মাত্র। যে ধারণা প্রতি মুহূর্তেই পাল্টায়। এই থেটিস সাগর ও ভারত এশিয়ার সংঘর্ষে উৎপন্ন হিমালয়ের ধারণাও পাল্টে যেতে পারে। সময়ের স্রোতে খেই হারিয়ে শক-হুণ-পাঠান-মোগল-আর্মেনিয়ান-পর্তুগিজ-ইংরেজ একাকার হয়ে গিয়েও নানা ভূ-খণ্ডে নানা আকারের দেশ, সীমান্ত তৈরি করে। সেই সীমান্ত পাশের দেশটি মেনে নেয় না। যুযুধান দেশগুলি লড়াই করে। লড়তে থাকে।

এই লড়াইয়ে পর্বতশ্রেণীর কী আসে যায়! প্রকৃতি নিজের মতন। পৃথিবী নিজের চারিদিকে ঘোরে। আপন কক্ষপথে পরিক্রমা করে সূর্যকে। অথবা অন্য কাউকে; যাকে আমরা সূর্য নাম দিয়েছি। সে-ও আরো বেশি সময় ধরে প্রদক্ষিণ করে অন্য নক্ষত্রকে। জয়ন্তের মনে প্রশ্ন জাগে, পৃথিবী চিরকাল সূর্যের চারিদিকে ঘোরে কেমন করে? আর তাই যদি প্রকৃতির নিয়ম হয় মানুষ কি প্রাকৃতিক জীব নয়? মানুষ এত অল্প সময়ে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে ছিটকে যায় এমন করে? চোখের সামনে না থাকলে অজান্তেই অন্য নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করার কথা ভাবে কেমন করে?

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেস ক্যাম্পের উচ্চতা প্রায় বারো হাজার ফুট। হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারের অলটিমিটার রিডিং তাই দেখায়। হেলিপ্যাড থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় গুহার ভেতরে একটি শিবমন্দির। পাকিস্তানি অস্ত্রশালা ছিল। ভেতরে বরফ জমে-জমে অমরনাথের লিঙ্গের মতন বিশাল। সৈনিকরা বলে গ্লেসিয়ার শিব। গুহা থেকেও দেড়-দু'হাজার ফুট উপরে জলপ্রপাতের পতনস্থল। ওরা আজ অনেক চেষ্টা করেও ওয়াটার পয়েন্ট থেকে এক হাজার ফুটের বেশি চড়তে পারে না। পিচ্ছিল বরফ। তার উপর তুষারপাত। শ্বাস ফুলছে। পায়ে সাধারণ

স্নো-বুট। গড়িয়ে পড়লে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

জয়ন্ত বলে, এ সময় পহেলগাম-গুলমার্গে, কারগিলে, কুলু মানালিতে কয়েকগুণ তুষারপাত হয়।

চিত্ত বলে, কিন্তু এখানে ঠাণ্ডা হাওয়া সাংঘাতিক,ছুরির ফলা, নাক ও গালে কোপ বসায়।

— বারবার হাত দিয়ে নাক ও গাল ঘষবি ! অলোকের পরামর্শে করুণ হাসে জয়ন্ত, ঘষতে-ঘষতে ব্যথা, ছাল উঠে গেছে ! হায় বোরোলিন, হায় ভেসিলিন ! জয়ন্ত ভাবে, এই কষ্টে যত প্রলেপই লাগাও না কেন বেশিক্ষণ ঘোরা যায় না । অলোকটা ভীষণ ক্ষ্যাপা ! প্রথম দিনেই চিত্তকে এতটা নিয়ে আসা উচিত হয় নি । একরকম মরিয়া হয়ে বলে জয়ন্ত, চল আমরা ফিরে যাই — শ্বাসকষ্ট হচ্ছে । চিত্ত হাঁফাচ্ছে ।

কী এক ঘোরে ছিল অলোক । সত্যি চিত্তকে নিয়ে প্রথম-দিনেই এতদূর যাওয়া ঠিক হয়নি । শেষদিকে প্রবল তুষারপাতে বাতাস ভারি হয়ে গেছিল ! এত লম্বা চওড়া পেশীবহুল যুবকটি বুড়ো মানুষের মতন, হাঁপানি রুগির মতন কষ্ট পাচ্ছে । নিজেকে ভীষণ অপরাধী ভাবে অলোক ও জয়ন্ত ।

ওরা দু'জন যথাসম্ভব শুশ্রূষা করে ঘন্টাখানেক পরে সুস্থ করে তোলে চিত্তকে । তারপর রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে চিত্ত ও জয়ন্ত । অলোক একা বসে থাকে বুখারির পাশে । শৈশবের কাঁথার তলায় ওরা ক'জন পাশের কোয়ার্টারের ঠাকুমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতো । বুখারিকেও মনে মনে আলিঙ্গন করা যায় । আহা উষ্ণতা ! অন্তরার কথা মনে পড়ে ।

ঠাকুমা রূপকথার গল্প শোনাতে-শোনাতে মাঝে-মধ্যেই চুপ হয়ে যেত । রাজপুত্র বা বন্দিনী কন্যার রূপের বর্ণনা করতে-করতে । ঐ চুপ মানুষটির ঘোলা চোখ দেখে ওরা বুঝতো ঠাকুমা ঘুমোয়নি । এখানেই আছে, অথচ কোথায় হারিয়ে গেছে ! মনে হয় শৈশবের কোন প্রেমিকের বর্ণনা । কৈশোরের পুকুরের জল, শালুক ফুল গঙ্গা-ফড়িং দেখতে-দেখতে প্রথম যৌবনের আয়নায় দেখা নিজের চেহারাই । কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তৈরি ঐ বন্দিনীর চেহারা । বদ্ধ-পুকুরের স্বচ্ছ জলে ছোট মাছ ভেসে উঠলেই মাছরাঙা ছোঁ মেরে তুলে নেয় । তের নদী পারের রাজরপুত্র ওকে ঘুম ভাঙিয়ে রাক্ষস বধের পর পক্ষিরাজে চাপিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেলেই গল্পের নটে গাছটি মুড়িয়ে যায় । তারপর ? ঐ ভরা যৌবনের গল্প কে বলবে আমাদের ? রূপকথার গল্পে ভরা যৌবনের কথা নেই কেন ?

তারপর গল্প চলতে থাকে মনে-মনে । যোদ্ধার শৈশব । ঠাকুমার হাত পিঠ চাপড়ে ঘুম পাড়ানোতে ব্যস্ত, তখন তালে-তালে পক্ষিরাজ এক মেঘের খণ্ডে খুর ছুঁইয়ে আকাশে ভাসে, আবার মেঘে পা ছোঁয়ায় । তারপর রাজকন্যার কী হয় ? ঠাকুমা চুপ মেরে থাকে।।

অলোক ভাবে গল্পের শুরুতেই তো সুয়োরানি আর দুয়োরানি । সুয়ো হলে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে সংসার । দুয়ো হলে দুঃখ যন্ত্রণা । ঠাকুমা কি সুয়ো ছিল, না দুয়ো ? তার শ্বশুরবাড়িতে কোকিলের ডাক ছিল না । আকাশ-বাতাস ভরে থাকতো শুধু কাঠঠোকরার ঠক্ ঠক্ খট্ খট্ ? খাঁচার মধ্যে একটা ময়না পোষার গল্প শুনেছে অলোক । অন্তরা কেমন আছে শ্বশুরবাড়িতে ? ও নিশ্চয়ই সুয়োরানি !

অলোক বুখারির পাশে বসে দিদিমার কথা ভাবে । অন্তরার কথা ভাবে । অন্তরা আর দিদিমার না দেখা কৈশোর যৌবন একাকার হয়ে যায় ? অন্যরা ভাবে নিজস্ব সুয়োরানির কথা, কেউ দুয়োরনির কথা । কেউ-কেউ দু'জনের কথাই । আচ্ছা, বিরহিনীকে দুয়ো কিম্বা সুয়ো কোনটাই বলা যায় কি ? অলোকের মনে হয় একই অন্তরায় সুয়োর সুখ ও দুয়োর দুঃখ-কিম্বা উল্টোটা । অথবা ঠাকুমার সুখ ও দুঃখ । উষ্ণতায় ঠাকুমা থাকে, অন্তরা থাকে, আবার থাকে না । মৌন পর্বতমালায় মনে মনে লেখা হতে থাকে এক অভিনব রূপকথা ।

❑ ইচ্ছেদের গেরিলা আক্রমণ

আলোকের ইচ্ছে করে অন্য একটা আকাশ দেখে । এ আকাশ ওর আর ভাস লাগে না । এই মর্জি মেজাজ, যখন-তখন যেমন খুশি কান্না-হাসি আর ভাল লাগে না । ইচ্ছে করে অন্য মেঘ, অন্য বাতাস । অন্য পর্বতমালা অথবা সবুজ পাহাড় পেতে ইচ্ছে করে । এই একঘেয়ে দিনরাত ভাল লাগে না ।

পরদিন ঘুরতে বেরিয়েও আবহাওয়া প্রসঙ্গ । আবহাওয়াই এখানে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক । প্রত্যেকেই দিনের কোন না কোন সময়ে নিজস্ব আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে ফোরকাস্ট দেয় । অথচ এগারো বছর বিমান বাহিনীর আবহাওয়া বিভাগে কাজ করেও অলোকের ফোরকাস্ট পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ফলে না । এমনিতে এক-একটা সিস্টেম দুই থেকে তিন-দিনের বেশি কোন অঞ্চলে থাকে না । তারপরই আকাশ পরিষ্কার থাকা উচিত । কিন্তু মাঝে-মধ্যেই একটার সঙ্গে অন্য সিস্টেম জুড়ে যায় । ওভারল্যাপ করে । যেন সাদা কাগজে তোড়ার ঢালা যেমন খুশি জলরঙ একে অন্যকে জাপটে থাকে । প্রকৃতি তোড়ার মতই এমনি খামখেয়ালি । এমনি অমোঘ এবং প্রচণ্ড । জাঁদরেল কমান্ডাররাও এখানে এসে তাই অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে । নিজের অতীত, সন্তান-সন্ততির কথা ভাবে নির্জনে ।

চিত্ত আসাতে দু'জনের চাপে জয়ন্ত কাল রাতে মদ খায়নি । হেঁটে পরিশ্রান্ত । ঘুমিয়েছে ভাল । অলোক গতকাল অন্তরার চিঠি পেয়েছে । ও লিখেছে দোলপূর্ণিমার কথা । লিখেছে, সবাই যখন আবিরে রঙিন আমি তখন দরজা বন্ধ করে বসে ছিলাম, ভাবছিলাম তোমার কথা — আমাদের অতীতের দোলের কথা, ভাবছিলাম বাপ্পাদিত্যের গল্পে সেই কিশোর-কিশোরির যুগলদোল, ঝলত ঝুলনে শ্যামের ছন্দ ....

অন্তরা লিখেছে ঝড়ের কথা । কালবৈশাখির ঝড় । তখন দরজা-জানালা বন্ধ করে হেরিক্যান জ্বালিয়ে সবাই মিলে নাকি ওর গল্প করে । মা অন্তরাকে ওদের ছোটবেলার গল্প শোনায় । নিজের ছোটবেলার গল্প শোনায় । তখন অন্তরা ভাবে তুষারঝড় এর থেকে কতগুণ প্রকট । — তুমি কেমন আছ সেই ঝড়ে । কী করছো ? কালবৈশাখির পর ঝমঝম বৃষ্টি নামলে খিচুড়ির গন্ধে তোমার চোখ চকচক করে ....

অলোক বৃষ্টি ভালবাসে । বৃষ্টির দেশের মানুষ । ঢলের দেশের মানুষ । চিঠিতে পাড়ার কবি

দীপংকরদা'র মৃত্যুসংবাদ কত সাধারণভাবে লিখেছে অন্তরা ! আসলে ওরা পাড়ার ছেলেরা দীপংকরদাকে যত জানে, অন্তরার ততটা আবেগ থাকার কথা নয় । ওর চিঠিতে এই খবর পড়ে ও আবার সব আনন্দ হারিয়ে ফেলে । বুকে কিরকম একটা শূন্যতা ! যাকে ঘিরে অনেক স্মৃতি সেই আপনজন । দেওয়াল পত্রিকায়, ছোট ছোট চটি পত্রিকায় দৈনিক কাগজের রবিবাসরীয়তে ওর কবিতার পঙক্তিগুলি ওদেরকে কৈশোর থেকে ঠেলে দিয়েছে যৌবনের দিকে । সে আর নেই, অথচ আছে । একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান ।

আজ তুষারপাত নেই । আকাশ আর পাহাড়ের চূড়াগুলি সাদা ও ছাইরঙের মেঘে ঢাকা । কোথাও হালকা ছুঁয়ে আছে পাহাড়ের বুক পিঠ অথবা কোমর । পাহাড় ও উপত্যকায় বরফ । এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ভেহিক্যালের গায়ে ছ-সাত ইঞ্চি । ইলেকট্রিক এবং টেলিফোনের তারেও এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি জমে তারগুলি মোটা । হলুদ এবং কমলা ঠোঁট চিনে-কাকেরা ইতি উতি তাঁবুগুলির আশপাশে খাবার খুঁজছে । — এখানে কাককেও কত সুন্দর লাগে ! চিত্ত'র কথা শুনে হাসি পায়, সাদা দেখে ফেড-আপ এর মধ্যেই ? জয়ন্ত নাক ঝেড়ে বলে, বউকে আর সাদা শাড়ি পরতে দেব না ! চিত্ত উদাস, আমাদের তিল ক্ষেতে এখন সাদা ফুলের মেলা - সবুজের মাথায় সাদা —

—তিলের শুটি তো সর্ষের মতোই ? বরফ ছাড়া, আবহাওয়া ছাড়া, অন্য কোন প্রসঙ্গ পেয়ে ওর ভাল লাগে । ও এখন ঐ প্রসঙ্গেই কথা বলতে চায় ? ওর এখন দিগন্তবিস্তৃত সবুজের বুকে সাদা তিলের শুটি, হলুদ শুটি দেখতে ইচ্ছে করে । চিত্ত ওর ইচ্ছারপূরণ করে ।

—না, সর্ষের থেকে মোটা, প্রথমে সবুজ হলুদ, আরো পরে কালচে হলুদ, কাটার পর জাঁক দিতে হয়, চিত্ত হাসে, যেমন দেশ আমাদের জাঁক দিচ্ছে, পরে নিংড়ে ছিবড়ে করে —

— জাঁক ? ওর এখন অন্য প্রসঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে না ! আমাকে তুই তিলের ক্ষেতেই থাকতে দে চিত্ত !

—আঁটিগুলো একসঙ্গে রেখে খড় দিয়ে ঢেকে জল ঢালতে হয় দু'তিন দিন, তারপর ছড়িয়ে রোদে শুকোনো, এভাবে দানাগুলি আরো পুষ্ট, নধর, যেমন আম মিষ্টি করার জন্য চালের ভেতর রেখে জাঁক.....

তাঁবুগুলির মোটা কাপড়ের দেওয়ালে প্রায় ছ' ইঞ্চি পুরু বরফ । একটা তাঁবুর গায়ে আঙুল দিয়ে ANTU লিখে পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তোলে অলোক । চিত্ত ক্যামেরাম্যান । স্বল্পালোক। ফ্ল্যাশ ব্যবহার করতে হয়। আরেকটা তাঁবুর গায়ে LATA লিখে জয়ন্ত পাশে দাঁড়ায় । সাদার মাঝে তাঁবুর গাঢ় সবুজ রঙে নামগুলি দারুণ লাগছে । এবার চিত্ত'র পালা । অলোক ক্যামেরা নেয় । চিত্ত লেখে বিশাল পুরো তাঁবু জুড়ে— KUMUDINI ও চট করে শাটার টেপে । জয়ন্ত বলে, বড্ড সেকেলে ! অলোক অপ্রস্তুত। চিত্ত-ও । — আসলে ওর বাবা সংস্কৃতের পণ্ডিত, মেয়ের নামও —

— জয়ন্তের মন্তব্য শুনে চিত্তর মুখটা কেমন করুণ হয়ে যায় । ওকে এরকম চেহারায় মানায় না । অলোক জোর দিয়ে বলে, আমার তো ভাল লাগে, আর নামে কী আসে যায় ! মনের মতন হলেই —

লাজুক হাসে চিত্ত, আসলে এখনো পাকা হয়নি —

—বিয়ে হলেই —

— সে পাকার কথা হচ্ছে না, আসলে — চিত্ত আবার অপ্রস্তুত হাসে। তারপরই ওর হাত থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে ছোটে। দু'টো বিশাল ইয়াক একে অন্যকে না জানি কেন তাড়া করছে। একটার লেজ পিঠের সঙ্গে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল উঁচিয়ে। পেছনের তাগড়া যমরাজের লেজ তেমনি নিচের দিকে ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। সাদা পাহাড় ও উপত্যাকার মৌন চুরমার করে ছুটছে বিশাল দু'টি প্রাণী। আগে কখনো এদেরকে এমন ছুটতে দেখেনি অলোক। হঠাৎ মনে হয় পেছনের ইয়াকটি পাগল হয়ে যায়নি তো? সেদিন এটার পিঠেই কি ছিলিঙ পানচুক জানবাককে চাপানো হয়েছিল? সেই উর্ধ্বশ্বাস ছোটার রেশ এখনো ওকে ছোটাচ্ছে। নূব্রার তীরে ডিগবাজি খাওয়ার পর থেকেও কেমন হিংস্র হয়ে উঠেছিল! সেদিন কামড়ও দিয়েছে একটা পানচুকের কব্জিতে। চিত্ত দুই আলাদা কোণ থেকে খচাখচ ফটো তোলে।

ফ্ল্যাশের আলোতে পেছনের ইয়াকটা হঠাৎ থেমে যায়। ওদের দিকে ঘরে দাঁড়ায়। ওর ভয়ে অন্য যে ইয়াকটা ছুটছিল সে-ও ঘরে দাঁড়ায়। এক-পা এক-পা করে ওরা এগিয়ে আসে। দৃষ্টি স্থির ক্যামেরার দিকে। চিত্ত ভয়ে দু'পা পিছিয়ে আসে। হঠাৎ ইয়াকটা তার বিশাল হা মুখ খুলে হাসতে শুরু করে! কেমন করুণ অথচ ভয়ংকর সেই হাসি। ওরা ভয়ে দে দৌড়-দৌড় ছুটতে-ছুটতে বিলেটে ফিরে আসে। ইয়াক দুটি দু' এক কদম এগিয়ে এসে আবার ফিরে যায়।

বিলেটের ছাদ ঢেউ টিনের মতন দেখতে ফাইবার গ্লাসের। বরফ গলে পড়তে পড়তে লম্বা নানা আকারের হাতির দাঁত বা ইয়াকের শিং-এর মতন ঝুলে থাকে সারি-সারি। জয়ন্ত হঠাৎ একটা ভেঙে ইয়াক দু'টির দিকে ছুঁড়ে দেয়। অলোক রা-রা করে ওঠে। নরম মাটির উপর ছুঁড়ে ফেলা বর্শার মতন ধারালো টুকরোটি বরফে গেঁথে কাঁপছে। এবার ইয়াক-দু'টি আবার দাঁত দেখিয়ে ওদের দিকে ঝিকিয়ে ওঠে, কেন বিরক্ত কর তোমরা, কী ক্ষতি করেছে প্রাণীকূল তোমাদের? প্রকৃতি পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছ, গোলার আঘাতে ভেঙে দিচ্ছ পাহাড়, ধ্বংস করছো অরণ্য আর মুক্ত বাতাস! কেন, কেন? জয়ন্ত আর চিত্ত কি ইয়াকদের কথা শুনতে পায় নি? পুরো না শুনেই ওরা বিলেটে ফিরে গেছে। অলোক বরফে হাঁটু গেড়ে ইয়াকদের কাছে ক্ষমা চায়। ইয়াক এবার হেসে বলে, তুমি তো কোন ক্ষতি কর নি, যারা করেছে তাদেরও কিছুই করতে পারবো না, করতে চাই-ও না, শুধু বলি নিঃশেষ হয়ে যাব একদিন, নিঃশেষ হয়ে যাবে তোমরাও — দীর্ঘশ্বাসে বিমূঢ় উপত্যকায় অন্ধকার নেমে আসে। সেই অন্ধকারে ধীরে হেঁটে মিলিয়ে যায় অতিকায় দু'টি প্রাণী। অলোকের মনেও কোন শব্দ জাগে না এ সময়।

খাদ্য মানে আর্মির লঙ্গর থেকে আনা রুটি আর টিনফুড। আলু মটরের সব্জি আর ডাল। আজ মঙ্গলবার। অন্যদিন ননভেজিটেরিয়ানদের জন্য থাকে টিনের মাংস কিম্বা ডিম। লঙ্গরের কুক্-রা বলে, এয়ার-ফোর্সের সবাই তো মিটার। আপনাদের ভাল লাগবে না জানি, কিন্তু আজ আমাদের ননমিটার ডে! মাংসাশীদের মিটার আর শাকাহারীদের ননমিটার বলে ওরা। এই রহস্য ভেদ করতে পেরে বুখারির তিন-দিকে জোড়াখাটিয়া ছ'টিতে শুয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে হাসে

এয়ারম্যানরা। অলোকের এত হাসি পায় নি । ওরা জানেনা, তুব কিছু ইংরেজি বলার চেষ্টা করে, এই যা ।

কোনমতে দু'টো রুটি খেয়ে ঢুকে পড়ে স্লিপিং ব্যাগে । বালিশের উপর প্যাড রেখে চিঠি লেখে। কী লিখবে চিঠিতে ? ভাল আছি-লেখা মানে, মিথ্যে লেখা । ক্রমাগত তুষারপাতে অতিরিক্ত শৈত্য আর খাবার না পেয়ে বিভিন্ন ফরোয়ার্ড পোস্টে শেষ হয়ে যাচ্ছে অনেক সৈনিক । মৃত্যুর খবরে কার মন ভাল থাকে ! হায় সভ্যতা ! তৃষ্ণা মিটছে না । ক্ষুধা বাড়ছে । সারি-সারি মৃতদেহ। এদের অনেকেই সৈনিক হতে চায়নি, পেটের দায়ে যুদ্ধ করতে এসেছে । আবার কেউ কেউ সৈনিক হতে চেয়েই সৈনিক হয়েছে । নিজস্ব যন্ত্রণা, রক্তমাংস ও মেধা দিয়ে দেশের নীল আকাশ, স্বাধীন হাওয়া রক্ষা করে যাচ্ছে । জীবন দিয়ে পাহাড়ের দৃঢ় বিশ্বাস, উপত্যকার প্রগাঢ় ভালবাসাকে জাগিয়ে রেখেছে ।

চিঠিতে কী লিখবে ? যুদ্ধ লিখবে না । প্রকৃতি লিখবে না । যন্ত্রণা লিখবে না । সৈনিকের আর আছেটা কী ? তখন চিত্ত আর জয়ন্ত বুখারির পাশে বসে গল্প করছে । হঠাৎ ওদের উত্তেজিত আওয়াজ অলোকের কানে ঢোকে । — আমাদের জন্যে দেশের কোন দায়িত্ব নেই, সীমান্তে পাঠিয়ে সবাই ভিটেমাটি, সম্পত্তি, পরিবার পরিজনকে লুটেপুটে খায়, বুদ্ধিজীবীরা দেখেও দেখে না , স্থানীয় ভণ্ড নেতা, অসাধু ব্যবসায়ী — জারজ ও দালালরাই সর্বেসর্বা —

কয়েক জন বিছানা জোড়া দিয়ে বসে তাস খেলছে । কিট্টি, টোয়েন্টি নাইন, অথবা ব্রীজ । ওরা চিত্ত'র কথা শুনে চোখ তুলে তাকায় । মিটিমিটি হেসে কারপোরাল ভরদ্বাজ বলে, সত্যি বলছো দাদা, আমার জমিন্ গেছে, আর কলিতার পরিবার ! বুখারির টকটকে লাল নল চারপাশে উত্তাপ ছড়ায় । অলোক স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসে । আজ মনটা ভীষণ অস্থির । বাড়ির কথা মনে পড়ছে । ভরদ্বাজের আফশোসের কথায় বাকিরা সশব্দে হেসে ওঠে । ওরা হাসছে কেন ? উঠে গিয়ে বুখারির আঁচটা কমিয়ে দেয় । বুখারির ফুটো থেকে বের হওয়া আগুনের আলোয় জয়ন্ত'র মুখে নানা রঙ খেলা করে । ও দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলে, আমরা ক্রীতদাস! গাঁজায় দম দেওয়ার মতন গাল চুপসে বিড়ি টানে জয়ন্ত । একটানে প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় বিড়িটা । ঢোঁক গিলে পুরো ধোঁয়াটা শরীরে নেয় । তারপরই ধোঁয়া আর কাশি বেরিয়ে আসে একসঙ্গে । কাশতে কাশতে বলে, কুকুরের দল — শুধু পাকস্থলির স্বার্থে লড়ছি ! ঘৃণায়, না কাশি থেকে ও সশব্দে বুক থেকে একদলা কফ টেনে নেয় । তারপর বিকৃত মুখ করে দরজা ঠেলে বেরিয়ে সশব্দে থুতু ফেলে আসে ।

নব ঘুরিয়ে বুখারি আরো কমিয়ে দেয় অলোক । জয়ন্ত'র কথা ওকে ভাবায় । সত্যি কি আমরা শুধু পাকস্থলির স্বার্থে লড়ছি ? আজকাল কী হয়েছে, সামান্য চিন্তা করলেই অস্থির অস্থির লাগে । বুঝতে পারে-চাকরি বাড়বে ক্রমে চিন্তার কোষগুলি শুকিয়ে মাথাটা আরো নিরেট হবে । দীর্ঘশ্বাস ফেলে অলোক শরীর চুলকায় । জামাকাপড়ের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চুলকাতে চুলকাতে সারা শরীরের জ্বালা ধরে যায় । চিত্ত'র একটা কথায় ওর মাথা ঝনঝন করতে থাকে, আজ সমস্ত ক্ষমতাবানরাই জারজ অথবা দালাল । ওরা এখন বুখারির পাশে থম্ মেরে বসে আছে । চিত্তর

বেশিদিন চাকরি হয়নি । ভেতরের আগুণ অনেক স্পষ্ট বলতে পারে । জয়ন্ত এতটা পারে না । অলোক বোঝে, নীলকণ্ঠ হওয়া ছাড়া ওর মুক্তি নেই । চিত্ত বলে, চল, আর দেরি না করে আজ ঘুমাই ।

ঘড়ির কাঁটা দশের ঘর পেরিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে । বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এই নিরন্তর সচল যন্ত্রটি । কল্পনার এক আশ্চর্য মাত্রা এই সময় । মানুষ এই কল্পনার একক অনুযায়ী চলতে চায় । সৈনিকদের উপর থাকে নির্ধারিত টাস্ক । প্রশাসনের নির্দেশ । সমতলে ওরা ঘড়ির কাঁটার মতন অক্ষরে-অক্ষরে সমস্ত নির্দেশ পালন করে । কিন্তু এখানে প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে হয় । ফৌজি টাস্ক ঠিক সময়ে সু-সম্পন্ন করাই এখানে বিরল ব্যাপার । প্রকৃতির তাণ্ডবের ফাঁকে ফাঁকে যুদ্ধ । আক্রমণ করে । আক্রান্ত হয় । সদাচঞ্চল সীমান্তরেখা । আজ দশ কি.মি. এদিকে তো কাল বারো কি.মি. ওদিকে । দখল করা গুহাগুলিতে ঢুকে শত্রুসৈন্যের ফেলে যাওয়া টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজার গল্প, ফেলে যাওয়া টিনে বরফ গলিয়ে জল করার গল্প অনেক শুনেছে অলোক ।

বুখারির পাশে এঁটো বাসনপত্রে ইঁদুরেরা নির্ভয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে । এক্ষুণি আলো নিভে যাবে । ওদের দৌরাত্ম্য বাড়বে । এদের পূর্বজরা পাকিস্তানের ড্রপ করা খাবার খেয়েছে । এরা খাচ্ছে ভারতের ড্রপ করা খাবার । এখন বিলেট আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে । আরেকবার নব ঘুরিয়ে নল লাল টকটকে করে অলোক একটু পরে বাইরে ঘুরে এসে ঘরে ঢুকতেই আলো নিভে যায় । তাস পার্টি হুড়মুড় করে উঠে কুপি জ্বালিয়ে বাইরে ঘুরে এসে সবাই বুখারির চারপাশে বসে । যত উত্তাপই নাও না কেন, একবার বাইরে ঘরে আসা মানে কম করে পনের মিনিট থরথর করে কাঁপতে হবে । অলোকের ঘুম পেয়ে গেছে । ভরদ্বাজ এখনও শরীর সেঁকছে । ভরদ্বাজকে বুখারি বন্ধ করার দায়িত্ব দিয়ে অলোক স্লিপিং ব্যাগে হাঁটু বুক একসঙ্গে জড়সড় । এ সময় অন্তরা কেমন করে শুয়ে আছে দেখতে ইচ্ছে করে । চিনে-কাক হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে ।

এভাবে ভাবতে ভাবতে একসময় ও চিনেকাক হয়ে যায় । হলুদ ঠোঁট পালকে গুঁজে কাঁপে কিছুক্ষণ । তারপরই স্বাভাবিক । উড়তে শুরু করে । পাহাড়-পর্বত-অন্ধকার ভেদ করে উড়ে যায় । ঘর বাড়ি সব আজব রঙিন । হলুদ গোলাপি প্রজাপতি । হাতছানিতে ডাকে সবুজ লুঙ্গা টিলা । কানে মাতাল কূজন । লালমাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধ । গোলপুকুরের বদ্ধ জলে কলার চুবই ডোবা-ভাসা । পা টান-টান । অন্তরা, মা, বোন ও তোড়ার চেহারা দেখতে পায় একে-একে । ওরা কি এখন চিনতে পারবে ? ওরা তো চিনে-কাক কখনো দেখেনি । ওরা ঘুমুচ্ছে । ওরা স্বপ্ন দেখছে । পাখিটার ইচ্ছে করে ওদের স্বপ্নে ঢুকে যায় ।

ঠিক তখুনি টেলিফোন বাজে । কিন্তু টেলিফোনের তীক্ষ্ণ আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে অলোক টর্চ জ্বালায় । এই আওয়াজ অলোক ও অন্য সবাইকে স্বপ্নের পৃথিবী থেকে, ইচ্ছার উড়ান থেকে টেনে নামিয়ে আনে । এই 'টেলিফোন কল' ফরোয়ার্ড পোস্টের খবর শোনায় ।

❑ অলৌকিক পাখিরা

পাঠক চলুন আপনাকে একবার সেই ভয়ংকর ফ্রন্ট ঘুরিয়ে আনি। সেখানে এখন এক ঝাঁক কালো পাকিস্তানি - কাক নিঃশব্দে-সন্তর্পণে খাবার খুঁজছে। তখুনি কামানের গর্জন। মুহূর্মুহূ গগনবিদারি শব্দ। ছত্রভঙ্গ কাকেরা এলোমেলো ওড়ে। কিন্তু ভয় পায় না। ওরা অভ্যস্ত। সৈনিকেরা শেলটার নিচ্ছে।

সুরিন্দরের হাসি পায়। মানুষের শরীরে হাতির পা। অস্ট্রিয়ায় তৈরী কোফ্ল্যাখ জুতো একেকটার ওজন কত! কোথাও গোড়ালি কোথাও হাঁটু ছাপিয়ে বরফ। কোথাও কোথাও বিশাল হা। ভেতরে তাপমান সারফেস থেকে কয়েকগুণ কম। উপরে মাইনাস চল্লিশ হলে ভেতরে মাইনাস দু'শো। হিমবাহের ফাটল থেকে বেরিয়ে আসা নীল ধোঁয়া দেখে ভয় হয়।

আজ আকাশ পরিষ্কার। দিগন্তবিস্তৃত বরফের ছোট ছোট শৃঙ্গ আর উপত্যকায় রোদের প্রতিফলন কর্টিনা চশমার পুরু পারপ্লেক্স্ ভেদ করেও চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তার উপর প্রচণ্ড হওয়া। হাতে আইস অ্যাক্সটা না থাকলে এ সময় বারবার আছাড় খেতে হয়। শরীরের একমাত্র অনাবৃত অংশ নাকের ডগা-নিঃসাড় সমস্ত শক্তি দিয়ে হ্যাঁচোড়-প্যাচোড় করে এগোচ্ছে ওরা।

সামনেই একটি ভাঙা স্নো ট্রাক। সিয়াচেন হিমবাহে স্নো ট্রাক সফল হয়নি। এখানকার কোন হিমবাহেই হয়নি। পরীক্ষামূলক বছর তিনেক আগে যে কটা ট্রাক এ. এন-১২ বিমান থেকে প্যারাড্রপ করা হয়েছিল, সবই এখন প্রকৃতির পরিহাসে অসহায় কঙ্কাল, সৈনিকদের ফটোগ্রাফির প্রেক্ষাপট মাত্র। সুরিন্দর এর পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তুলিয়েছে রবিশংকরকে দিয়ে। রবিশংকর নিজের ফটো তোলায় নি। ওর মতে, উরুভঙ্গের পর দুর্যোধন তো জঞ্জালমাত্র! ওর পাশে দাঁড়িয়ে ফোট তোলা সৈনিকের শোভা পায় না।

— পাগল লোক, ক্ষ্যাপা সব চিন্তাভাবনা ; সুরিন্দর হাসে। কোথায় দুর্যোধনের উরু আর কোথায় অসফল স্নো ট্রাক! রবিশংকর ফটো তুলিয়েছে স্নো স্কুটারের পাশে দাঁড়িয়ে। তুলনায় স্নো-স্কুটার অনেক বেশি সফল। মোটামুটি সমতল বরফের পথে একেবেঁকে দক্ষ পরিচালকরা কেরোসিন পেট্রল এবং শুকনো খাবার পৌঁছে দেয় হেলিপ্যাড ও ড্রপিং জোন থেএক নিকটপর্তী অবজারভেশান পোস্টের পাদদেশে। সৈনিকরা তারপর পিঠ্টুতে রেশন নিয়ে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

এখন সুরিন্দরের কাঁধে একটা আস্ত ফাইভ পিস দড়ি - দড়াসহ। প্রায় পনের কে. জি. ওজন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে-ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় এক হাঁটু বরফের পথে কখনো একশো কে.জি.-র কম মনে হয় না। কুড়ি লিটারের পাত্রটি যেন দু'শো লিটারের ব্যারেল। সমস্ত শক্তি দিয়ে রবিশংকর টানছে। এত জামাকাপড় আর হাঁসের পালক ভরা মোটা জ্যাকেটের উপরও থিরথির কম্পনে বুকে গভীরে অনেক কষ্টে জেগে থাকা বেচারা হৃৎপিণ্ড নিজেকে জানান দেয়। যেখানেই দাড়িয়ে হাঁফ ছাড়তে যায়, এঁকে-বেঁকে কুঁকড়ে যেতে চায় শরীর। ভীষণ কষ্ট। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁবুতে ফিরতে চায়।

ঠিক তাঁবু নয়। কাঠের ফ্রেমে আটকানো স্কিটবোর্ডের ফাট্টাগুলি কোণায় কোণায় ফুটো করে

প্যারাশুটের কাপড়ে মুড়ে নিচে কতগুলি জেরিক্যানকে বরফ ভরে ঝোলানো হয়েছে যাতে উড়ে না যায় । তবে জোরে বাতাস এলে ভরসা নেই । এর থেকে অনেক-অনেক ভারি জিনিস উড়তে দেখেছে ওরা । কী প্রচণ্ড বাতাসের গতি এখানে সারা দিন-রাত !

এদের বাসস্থান অবশ্য পাহাড়ের আড়ালে । হাউই এর মতন উড়ে এসে শত্রুর গোলা ঠিক ঐ বিন্দুতে এখনো পড়েনি । ভবিষ্যতের কথা অবশ্য বলা যায় না । গোলন্দাজদের কতরকম কলাকৌশল জানা থাকে । কত বিচিত্র কামান আর তার গোলা তৈরি করেছে মানুষ — একে অন্যকে মারবে বলে !

আহা বিছানা ! ড্রপিং জোন্ থেকে তাঁবু, চড়াই - উৎরাই মিলিয়ে এক মাইলও হবে না । পৌঁছোতে লেগেছে সোয়া - ঘন্টা । এখন দু'জনই চিৎপাত । মাথা থেকে হাঁটু অব্দি পাতারে সমান্তরাল । হাঁটু থেকে পা-গুলি নব্বুই ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে সোজা জেরিক্যানের উপর বস্তা বিছানো ফ্লোরে । দু'জনেই জোরে জোরে শ্বাস নেয় । বাইরে সমানে গোলাবর্ষণ চলছে । কাকেরা ওড়ে, বসে, আবার উড়ে পাহাড় পেরিয়ে কোথায় হারিয়ে যায় । রামস্বরূপ বলে ওরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তোমরা যে বিছানায় শুয়ে থাক, স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে কনট্যাক্ট করো, সব খবর দেবে ওরা পাকিস্তানিদের ! সুরিন্দর আর রবিশংকর হেসে ফেলে ।

আহা বিছানা ! পাঁচ সারিতে কুড়িটা করে মোট একশোটা খালি জেরিক্যানের উপর পিচবোর্ড আর প্যারাশুটের কাপড় বিছিয়ে ডবল বেড । সুরিন্দর আর রবিশংকরের বিছানা কাম অফিস । মাথার দিকেনানারকম রেডিও টেলিফোনি সেটের সাতটি ইউনিট । সেগুলি থেকে কোঅ্যাক্সিঅ্যাল ক্যাবলগুলি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে বিশাল সব বরফের চাঁইয়ে বেঁধে টাঙানো নানা মাপের অ্যানটেনার শরীরে ছোট্ট বেলুনগুলিতে জুড়ে গেছে । বেলুনগুলি ট্র্যান্সফরমার । তবে কোন ইচ্ছাকেই বাস্তবে ট্র্যান্সফর্ম করে না ।

কাকেরা তা করতে পারে । রামস্বরূপ একদিন চেষ্টা করে একটা কাক ধরে ফেলে । কিন্তু সেটাকে তাঁবুতে ঢোকানোর আগেই দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে কাকেরা উড়ে আসছে ও তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে ফেলা বাসি খাবারের উপর পকেট থেকে একমুঠো মুংফলি বের করে ছিটিয়ে দেয় । পাখিরা ওকে ছো দেওয়ার পরিবর্তে মুংফলির দিকে যায় । ধরে ফেলা কাকটাও যায় । সেই থেকে নাকি ওরা রামস্বরূপের বন্ধু । কাকেরা শত্রুসৈন্যের সব খবর এনে দেয় ওকে । খবর সত্যি কিনা পরীক্ষা করার জন্যে ও গোলন্দাজ সুবেদারের কাছে যায় । ওর কথা মতন অ্যাঙ্গেলে গোলা পাঠিয়ে সুফল পায় ওরা । ফরোয়ার্ড অবজারভেশন পোস্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় রামস্বরূপের অনুমান ঠিক!

এখন শুধু ভারতীয় কামানগুলি গর্জন করছে । প্রতিদিনই এরকম হয় । ওরা মাঝে-মধ্যে খুচরো গোলাবর্ষণ করে উস্কে দেয় । তারপরই প্রায় দ্বিগুণ বা তারও বেশি রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে ভারতীয় কামানগুলি । না জানি কেন মনে হয় এইটাই শত্রুর বড় চাল । উস্কে দিয়ে লুকিয়ে পড়ে । তারপর করো না যতখুশি গোলা বর্ষণ ।

সুরিন্দর বলে, নতুন সুবেদার রামস্বরূপের কাকচর্চাকে আমল দেয় নি বলেই আজ এত গোলা খরচ করতে হচ্ছে ।

রবিশংকর হাসে, হ্যাট্, যত সব বাক-ও-য়াজ, তুই-ও বিশ্বাস করিস ঐসব ? এই অবজ্ঞা ভাল লাগে না সুরিন্দরের। সে একটু উত্তেজিত হয়েই বলে, কিছু একটা তো আছেই গুপ্তাজী, তুমি দেখ নি রামস্বরূপ কাকেদের ঝুণ্ডে বসে কত কথা বলে, কাকেরা-ক্যায়া-কুয়া-কম্বর করে জবাব দেয়। কী দোস্তিই-ই না বানিয়েছে লোকটা।

একথা অস্বীকার করতে পারে না রবিশংকর। আর সুরিন্দরের সমর্থনেই যেন একটি কর্ণ বিদারি গোলা কাছে পিঠে কোথাও পড়ে। কারো আর্তনাদ শোনা যায়। সেই আর্তনাদ পরবর্তী গোলার শব্দে চাপা পড়ে। তার মানে আজ এ পক্ষের শেলিং মোটেই ফলপ্রসু হয়নি। শত্রুরা দ্বিগুণ উৎসাহে গোলা ছুড়ছে। ওরা কান খাড়া রাখে।

মিনিট পনের এমনি শুয়ে থাকার পর রবিশংকর উঠে নতুন শ্রীরাম হোণ্ডা জেনারেটারের স্পার্ক প্লাগ খোলে। একটা আধলা ব্লেডের কোণা ঢুকিয়ে, একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে জমা কার্বণ সাফ করে। আনমনে ভাবে, নিজেরে শরীরের জমা কার্বণ যে কবে সাফ করতে পারবে !

সুরিন্দর স্টোভ জ্বালায়। এই স্টোভটা কত ভাল ! দু'তিন পাম্পেই বার্ণারের গায়ে চিরিৎ করে তেল। রামের বোতলে সলতে লাগিয়ে তৈরি কুপির আগুন ছোঁয়াতেই কী সুন্দর ! তারপর রেগুলেটর একহাতে বন্ধ করে স্টোভের নিচের শিকটা কোফ্ল্যাখে চেপে ধরে মারো পাম্প কুড়ি-পঁচিশটা। ততক্ষণে বার্ণার গরম। রেগুলেটর অল্প খুলতেই শীৎকার দিয়ে বার্নারের মুখে আগুণ। দ্যুতি এবং উত্তাপ। মিলে-মিশে সুখ।

এইবার গ্লাভস খোলা। রবিশংকরও এগিয়ে যায় হাত সেঁকতে। নাহলে জেনারেটরের শীতল শরীর অজান্তেই হাতের চামড়া তুলে নেবে। জুতো খুলে পা এবং মোজা সেঁকে সুরিন্দর। জুতোর ভেতর পা যতক্ষণ সচল থাকে তাপমান স্বাভাবিক থাকে। থেমে গেলেই ঘামের বরফ কামড়ে ধরে। টনটনে ব্যথা। মোজা আগুনের আঁচে গরম হয়ে ঘাম বাষ্পীভূত হলে আবার পা ঢুকে যায় ডাবল লেয়ার কোফ্ল্যাখে। তখন রবিশংকর জুতো খলে মোজা ও পা সেঁকতে শুরু করে সুরিন্দর একমগ জল খায়। স্টোভে সসপ্যান চাপিয়ে দুই টিনের তলানি থেকে বরফের টুকরো ঢালে। যতটুকু টিনের গায়ে লেগে থাকে কোফ্ল্যাখের লাথি খেয়ে তাও ঝরে পড়ে যায় সস্প্যানে। সুরিন্দর তখন প্যারাশুটের দড়ি দিয়ে বাঁধা টিন দু'টির হ্যাণ্ডেল একহাতে আর আইস অ্যাক্স অন্যহাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে পরে। ততক্ষণে রবিশংকরও আবার জুতো পরে নিয়েছে। সে স্টোভ বন্ধ করে ডোলচি হাতে বেরিয়ে আসে।

বাঁদিকে সুরিন্দর পাকা বরফের খোঁজে। ডানদিকে রবিশংকর লঙ্গর যাবে। ঘন্টাখানেক পর আবার দু'জনে দেখা হবে। ততক্ষণে কালো পাহাড়ের পেছনে সূর্য ডুবে গেছে। শুধু কিছু নানারঙের ছটা কালো বরফের খাঁজে খাঁজে সাদা বরফের আস্তরণে প্রতিফলিত হয়ে আকাশকে রাঙিয়ে দিয়েছে নানা রঙে। দূরে-পেছনে সূর্য কারোকোরামের সাদা শৃঙ্গগুলিতে তখনো রোদ। রূপকথার মায়ার পাহাড়ের মতন ভয়ংকর সোনার পাহাড়, রুপোর পাহাড়, হীরে-মোতি, কংকালের পাহাড়, হাড্ডির স্তুপ সব। খাঁ খাঁ করে এক মৃতপুরী। শুধু জীবন্ত একঝাঁক কালো - কাক। এখন আর

গোলা আসছে না। তাঁবুতে ফিরে জানা যাবে সে সময় কার আর্তনাদ ওরা শুনেছে, অথবা কে শহীদ হয়েছে আজ। কাকেরা নির্বিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুরিন্দর সাবধানে পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যায়। পূর্ববর্তী জুতোর দাগে পা ফেলে এগোনো অনেক বেশি নিরাপদ। কিন্তু সকালের তুষারপাতে আজ আর সে সুযোগ নেই। ঝুঁকি নিয়েই আন্দাজে পা টিপে-টিপে এগোতে হচ্ছে। শুধু কাকেরা নির্বিকার উরে বেড়ায়।

সুরিন্দর ভাবে—ইস্, এখন যদি হঠাৎ আমি কাক হয়ে পড়তাম। এরকম মনে হতেই হঠাৎ এক অদ্ভুত বিশ্বাস জন্ম নেয় ওর মনের গভীরে। এই কাকেরা কেউ কাক নয়। এরা সব সৈনিকের আত্মা। এই হিমবাহের চরম শৈত্যে কোন কাক বাঁচতেই পারে না। ভারত ও পাকিস্তানের যে সব সৈনিকেরা যুদ্ধ করতে এসে আর ফিরে যেতে পারে নি, তাদের অন্তিম ইচ্ছাগুলিই কাক হয়ে এপার-ওপার করে। কামানের গোলা ওদের ছোঁবে কেমন করে? ঠাণ্ডা এই পাখিদের আর কাবু করতে পারে না! এদেরকে পাকিস্তানি কাক বলা অনুচিত। সুরিন্দর ঠিক করে কথাটা রবিশংকরকে বলতে হবে।

❑ জতুগৃহ

মনখারাপ হলে শরীর ভারি। তখন সুরিন্দরের চলতে ইচ্ছা করে না। কিছুই করতে মন চায় না। কিন্তু হিমবাহে নিরুপায়। বেঁচে থাকতে জল চাই। এক টিন কাঁচা বরফ গলালে হাফ লিটার হয় মাত্র। পাকা বরফ গলালে টিনের দুই তৃতীয়াংশ ভরে। কিন্তু আশপাশের সব পাকা বরফই কার্বণময়। পানীয় জলের জন্যে দরকার পরিত্যক্ত তাঁবুগুলির নিচে জমে থাকা পাকা বরফ। সুরিন্দর সাবধানে পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যায়।

সামনে সালতোরো পর্বতমালার সাদা শরীর ছুঁয়ে সদ্য উদ্ভূত হালকা মেঘমালা দ্রুত ভেসে যায়। স্মৃতিও ভাসে। কতদিন হয়ে গেছে। সেই নীরব চাহনি, ছুটি থেকে ফেরার সময় ফিরে দেখা গ্রামের মেঠো পথ। ভাবতে-ভাবতে সুরিন্দর সেই চাহনিতে ডুবে যেতে থাকে।

মন খারাপ হলে যে-কোন পথ অনিচ্ছায় ডুবে যায়। যে কোন দূরত্ব দীর্ঘতর হয়। উঁচু নিচু এবড়ো-খেবড়ো বরফের পথ পেরিয়ে পুড়ে যাওয়া রাশিয়ান হাটের নিচে জমা কঠিন স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কেমন সুন্দর সদ্য তুষারপাত ঝলসানো বিকৃত অংগগুলোকে ঢেকে ফেলেছে আগুণে পোড়া বধূর শরীরে ঢাকা সাদা চাদরের মতন।

আইস-অ্যাক্স উঁচিয়ে ধরেও ও একবার নামিয়ে নেয়। কষ্ট হয়। ভীষণ কষ্ট। বিরহের চাইতেও তীব্র। অথবা তীব্র বিরহ। একদমই ইচ্ছে করে না ওই নিটোল বরফের স্তম্ভে কুড়ুলের দাঁত বসাতে। নিজের কাছেই এই অনিচ্ছার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। অথচ চার পাশে আর কোথাও এমনি নির্মল বরফ নেই। সপ্তাহখানেক ওরা কাঁচা বরফই বারবার গলিয়ে খেয়েছে। আজই প্রথম স্তম্ভটার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পারবে না। এই স্তম্ভের গায়ে আঘাত করা ভীষণ কঠিন। একদমই ইচ্ছে করছে না। এরকম হলে চলবে কেমন করে!

সুরিন্দর আইস অ্যাক্সটা সমস্ত শক্তি দিয়ে চাগিয়ে তোলে । কয়েকগুণ ওজন বেড়েছে এটার। সমস্ত মনোযোগ স্তম্ভের শরীরে কেন্দ্রীভূত করে কোপ বসায়; এক, দুই .... কুড়ি-একুশবার । একদমে জান লাগিয়ে বরফ কেটে মাথা ঘোরায় । খানিক দম নিয়ে একটা টিন শুইয়ে টুকরোগুলি ভেতরে নেয় । তারপর আইস-অ্যাক্সের উপর ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় যেন বুড়োমানুষ । অনেকক্ষণ হাঁপানি রুগীর মতন শ্বাস নেয় । আবার বরফ কাটে । পঁচিশ বছরের যুবকটি এখন মরিয়া ।

টিন দু'টি ভরতে আধ-ঘন্টারও বেশি সময় লাগে । আরো কিছুক্ষণ জিরিয়ে এবার অ্যাক্সটিকে জ্যাকেটের হুকে ঝুলিয়ে বরফ নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে টলমল পায়ে তাঁবুতে ফেরে । ততক্ষণে রবিশংকর ফিরেছে । জেনারেটার চালিয়ে বাল্ব জ্বেলেছে । সুরিন্দর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে মনে-মনে । হ্যাঁচকা দড়ি টেনে-টেনে অনেক কষ্ট করে চালাতে হয় ওটা । এত কম তাপমানে যন্ত্রটি যে চলছে, তা-ই অনেক । রবিশংকর এখন স্টোভের উপর ডালে তরকা মারছে । বরফ হয়ে যাওয়া ডাল গরম করতেই হতো, এখানে কুচিকুচি পেঁয়াজ মশলা ঘি-য়ের প্রয়োগে একটু স্বাদ আনার চেষ্টা।

সুরিন্দর ঘরে ঢুকে দম নিতেই নাকে মশলার ঝাঁঝ লাগে । একটা বিরাট হ্যাঁচ্ছো ! সঙ্গে সঙ্গেই পেটে খিল । একহাতে পেট চেপে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ও চিৎ হয়ে পড়ে বিছানায় । হায়-রে বিছানা ! অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে সুরিন্দর । বিছানা ওকে নিয়ে তলিয়ে যেতে থাকে কোন্ অতলে ।

রবিশংকর স্টোভের পাশে রাখা কিসমিস টিনের উপর থেকে দ্রুত উঠে এসে পাশে বসে । হা-করা মুখে অল্প-অল্প ঢেলে দেয় গরম জল । সুরিন্দরের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয় । রবিশংকর ওর জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুক মালিশ করে ।

অনেক পরে বিছানা আবার স্থির হয় । অন্ধকার দূরে সরে গিয়ে বাল্বের আলোয় দেবদূতের মতন রবিশংকরের মুখ দেখতে পায় সুরিন্দর । খানিক বাদে শক্তি ফিরে পেয়ে দুই হাতে বিছানায় ভর দেওয়া রবিশংকরের হাতটা জড়িয়ে ধরে । মনে হয় জন্মান্তরের সম্পর্ক এই ভিন রাজ্যের সহকর্মীর সঙ্গে । রোজ পাশাপাশি শুয়ে ওর শরীরের অসহ্য লাগা বোঁটকা গন্ধটাও আজ কত আপন ! না জানি কেন হঠাৎ ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে । ওর হাত জড়িয়ে ধরায় রবিশংকর মিষ্টি হেসে বলে, কী, বহুর কথা মনে পড়ছে বুঝি ? সুরিন্দর লজ্জা পায় । সত্যি মনে পড়ছে । সবসময়ই মনে পড়ে । দেবকী সবসময়ই স্মৃতিতে অম্লান । সুরিন্দর কৃতজ্ঞতা ভরে তাকিয়ে থাকে রবিশংকরের দিকে । ভাবে, নিশ্চয়ই আগের জন্মে ও খুব ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল ! ও এখনও বুক মালিশ করে যাচ্ছে ।

কিছুক্ষণ পর সুরিন্দর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে । সুরিন্দর স্টোভের দিকে এগিয়ে যায় । ডাল রাখে নিচে । না, ব্যথাটা আর নেই । পর্দা ঠেলে জেরিক্যান টেনে নিয়ে রামস্বরূপও মাঝখানে বসে গ্লাভস্ খুলে হাত সেঁকতে শুরু করে । এই দুর্গম অঞ্চলে স্নো অ্যান্ড অ্যাভলাঞ্চেস্ স্ট্যাডি এস্টাব্লিশমেন্ট টাস্ক ফোর্সের নায়েক রামস্বরূপই ইদানিং একমাত্র সঙ্গী । এয়ারফোর্স টেন্টের পাশেই ওর তাঁবু । দূরবর্তী তাঁবুগুলিতে পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈনিকরা থাকে ।

সেদিন এমনি হাত সেঁকছিলো সুরিন্দর। রামস্বরূপ ডোলচি নিয়ে গেছিল লঙ্গর। তখন ওরা রাশিয়ান হাট -এ থাকত। প্যারাশুটের তাঁবুর চাইতে ভ্যাকুয়াম দেওয়ালঅলা রাশিয়ান হাট কয়েকগুণ গরম। বুখারিও ছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগেই সারাইয়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে নীরব হয়ে গেছিল। বেস-ক্যাম্প থেকে খারাপ আবহাওয়ায় নতুন বার্ণার আসতে পারছিল না। বুখারিটা ভাল থাকলে হয়ত সেদিন এই দুর্ঘটনা হতো না। এত দুর্ভোগও সইতে হতো না। ভীষণ আফশোস হয়। পুরো সাপ্লাই বেসে টাইগার বা পদাতিক বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার, অ্যাডজুটেন্ট আর ডাক্তার ছাড়া একমাত্র ওয়ারফোর্স হাটেই বুখারি ছিল। সুরিন্দর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এখানে দিন-তারিখ-তিথি-নক্ষত্র একাকার। আজ সোম, না শনি ? দ্বিধান্বিত সৈনিক বোকার মতন হেসে বলবে, রবি, অথবা মঙ্গল ! দিন-তারিখ জানতে হলে যাও রেডিওঅলার কাছে। এখানে ফিসফিস করে কথা বলা নিয়ম। রেডিও শুনতে হয় মৃদু আওয়াজে। সবসময় সতর্কতা। কোন শব্দ যাতে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে শত্রুপক্ষের কানে না পৌঁছায়।

রেডিও বলেছে, আজ দীপাবলি। ওরা প্রস্তুত থাকে। দীপাবলি উপলক্ষে কয়েক রাউন্ড গোলা উপহার অস্বাভাবিক নয়। প্রায় প্রতিদিন্ গোলা বিনিময় হয়। তখন পোর্টেবল সেটটাকে নিয়ে আইস-কেভ এ গিয়ে ঢুকতে হয়। নাহলে যে কোন মুহূর্তেই কোন শেল বা স্প্লিন্টার জখম করতে পারে। মরে যাওয়ার চাইতে প্রতিবন্ধি হয়ে বেঁচে থাকার ভয় বেশি তাড়া করে। প্রতিবন্ধি হয়ে কোন সৈনিক বাঁচতে পারে না।

দীপাবলির খবর স্মৃতিভারাক্রান্ত করে। ওরা একে অন্যকে অতীতের রঙিন গল্প শোনায়। তারপর আনমনা রবিশংকর উঠে যায় জেনারেটরে পেট্রল ভরতে। সুরিন্দর স্টোভে হাত সেঁকে। এরকম নিষ্প্রভ দীপাবলি জীবনে আসবে কোনদিন কল্পনাও করেনি ওরা।

তখন বিকাল প্রায় পাঁচটা। হিমবাহে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। শ্রীরাম হোণ্ডা ভেতরে চালালে নির্গত ধোঁয়া চোখে জ্বালা ধরায়। বাতাসে অক্সিজেন নাম মাত্র। তার উপর কার্বণ মনোক্সাইড আরো ক্ষতি করবে বলে এই ঠাণ্ডায়ও দরজার বাইরেই চালাতে হয়। ড্রপিং জোন থেকে কুতিয়ে হেঁচড়ে আনা পেট্রল ও কেরোসিন ভরা জেরিক্যানগুলি বাইরেই সারি দিয়ে রাখা। তারই একটায় থেকে পেট্রল ঢালতে বসেই চিৎকার শোনে, — গুপ্তা-গুপ্-তা-আ-আ-গ্-আ-আ-গ্ ....

ফানেল ফেলে ছুটে ঘরে ঢুকে দেখে স্টোভের আগুণ নিচু ছাদে লেগে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। স্টোভের নিচে কাঠের ফাট্টাতেও আগুন। সুরিন্দর একটা ছালার বস্তা দিয়ে কখনো নিচে, কখনো উপরে বোজাবার চেষ্টা করছে। রবিশংকরও আরেকটা বস্তা নিয়ে একই চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু আগুণ ক্রমে সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। হঠাৎ এত অক্সিজেন এল কোত্থেকে ? ও ভাবে স্টোভটার হাওয়া খুলে দেবে। কিন্তু পৌঁছায় কার সাধ্য ! ধোঁয়া আর পারপ্লেকস্ পোড়া গন্ধ আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হয় ওর গুপ্তা ছোড়্-ভাগ-দরওয়াজা মে আগ্ —

সুরিন্দর ছুটে বেরিয়ে যায়। গুপ্তাও পেছন পেছন। দরজা দিয়ে বেরোতে দু'জনেরই জ্যাকেটে আগুন। ওরা বরফে গড়াতে থাকে। তখুনি বিশাল বিস্ফোরণ। গড়াতে গড়াতে

বরফের ঢালে একজায়গায় আটকে দেখতে পায় ওদের জেনারেটার বোমার মতন ফেটে চারদিকে ছিটকে পড়েছে । রাশিয়ান হাটের লেলিহান শিখা ছাড়া চারপাশে দর্শনীয় আর কিছু থাকে না । ওরা চোখ বন্ধ করে দেখতে পায় অ্যাডজুটেন্টও কমান্ডিং অফিসারের রক্তচক্ষু । কিভাবে এই দুর্ঘটনার সাফাই দেবে কেউ ভাষা খুঁজে পায় না । দু'জনেই শীতে — ভয়ে থরথর কাঁপতে থাকে ।

ততক্ষণে হৈ চৈ । এখানে মানুষ ছুটতে পারে না । কিন্তু আগুণে প্রায় পঞ্চাশেক কোফ্ল্যাগ ঘন হয়ে একত্রিত । উষর মরুর উটের মতন এই বিস্তৃত হিমবাহে সৈনিকরা ।

অপারেশান মেঘদূতে এটি অন্যতম সাপ্লাই বেস । এয়ারফোর্স হাট এখানে র‍্যাশন ড্রপিং এবং হেলিকপ্টার ফ্লাইং - এর সৈনিকরা, এয়ার ডিফেন্স গান এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সৈনিকরা ও তরুণ সামরিক চিকিৎসক ; মিনিট-কুড়ির মধ্যে সব্বাই সেখানে পৌঁছে যায় । জোয়ানরা কাঁচা-বরফ ছুঁড়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে । কিন্তু ও যে জতুগৃহ । সম্পূর্ণ ভস্ম না করে থামবে না অগ্নিদেব ! রবিশংকর মনে মনে ভাবে, কী বাঁচাটাই না বাঁচলাম আজ ! সুরিন্দর আক্রোশে বরফ আঁচড়াচ্ছে । রবিশংকর ওর কাঁধে হাত রাখে ।

রামস্বরূপ এক মাইল দূরের লঙ্গর থেকে হৈ-চৈ এবং আগুণ দেখতে পেয়ে ছুটতে থাকে । অথচ পারে না । বরফের উঁচু-নিচু পথে বারবার আছাড় খেয়ে ডোলচির ডাল জ্যাকেট ও প্যান্টের গায়ে মাখামাখি । তার সঙ্গে কাঁচা বরফ । এক জায়গায় আবার দড়ি ঝুলে ধোঁয়া ওঠা বরফের ফাটল পার হয়ে আসতে হয় । অনেক কষ্টে রামস্বরূপ কাছে এসে দেখে, না, তাঁর তাবুতে আগুণ লাগেনি ।

—এয়ারফোর্সের ছেলে দু'টি কোথায় ? টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নায়েক মহাদেব আঙুল তুলে দেখায়, উধার - ! সি.ও সাহাব পুছতাছ কর রহা হ্যায় !

ভিড় ঠেলে দেখতে পায় দু'জনেরই চোখের পাতা এবং ভুরুর লোম ঝলসানো। পেছনে দাউ দাউ আগুণ। রবিশংকর মাইনাস পঁচিশ - ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গ্লেসিয়ার প্যান্টের উপর শুধু ফৌজি সোয়েটার গায়ে ঠকঠক কাঁপছে। ও নিজের ডাল ও বরফ মাখানো জ্যাকেটটা খুলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়। কোম্পানি হাবিলদার হাত টেনে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে, — সি-ও-সাব!

মাথায় কারেন্ট আসে । মীনার ছেলে নিজের অজান্তেই বাজ পড়ার মতন চেঁচিয়ে বলে, তো ক্যায়া হুয়া ? সাহাব ভি ইনসান হ্যায়, দেখতে নেহি দোনো ক্যাইসে কাঁপ রহা হ্যায় ! ওর কথায় সি. ও. এবং অ্যাডজুটেন্ট যেন সম্বিত ফিরে পায় । ওরা এতক্ষণ পুছতাছেই ব্যস্ত ছিল ।

ঢুস ঢাস্ শব্দে রাশিয়ান হাটের মেঝে কিম্বা দেওয়ালের পাশে রাখা জেরিক্যানগুলির বিস্ফোরণে সবাই কেঁপে ওঠে । যেন আর্টিলারি ফায়ারিং । রামস্বরূপ অ্যাডজুটেন্ট সাহেবের পুরো কথা না শুনেও ঘাড় নাড়ে । স্যালুট ঠোকে । ফৌজে মুখে-মুখে কথা বলার আদব নেই ।

তখুনি ভোজবাজির মতন ঐ আগুণের আশেপাশে দু'টি পাকিস্তানি গোলা এসে পড়ায় সবাই দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে বরফে গড়াতে থাকে । তবু মহাদেবের পায়ে একটি স্প্লিন্টার লাগে । একটা চাপা অথচ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনে সবাই । সুরিন্দর দেখে স্প্লিন্টারে ক্ষতবিক্ষত গ্লেসিয়ার প্যান্ট ফেটে রক্ত মাখা পালক উড়ছে ।

ডাক্তার, ক্যাপ্টেনসাহেব ও নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সঙ্গে-সঙ্গে মহাদেবকে ধরাধরি করে এম. আই. রুমে নিয়ে যায় । এম. আই. রুমটি পাহাড়ের অন্যঢালে সবচাইতে বড় বরফের গুহায় । দেওয়ালে চট ও প্যারাশুটে পেরেক ঠুকে চারপাশ ঢাকা গোটা চারেক ক্যাম্পখাট পাতা । ক্রমাগত শত্রুর গোলা আসতে থাকলে সবাই শেলটার নেয় । একটু পরেই এ পক্ষের কামান গর্জে ওঠে । ঘন্টাখানেক গোলা বিনিময় চলতে থাকে । তারপর একসময় প্রবল তুষারঝড় এসে দু'পক্ষকেই চুপ করিয়ে দেয় । ঐসময় কামান চালায় কার সাধ্য ! প্রকৃতির তাণ্ডব চলতে থাকে ।

☐ হিমবাহে জেরিক্যানদের সহবাস

ছোট বেলায় বড়িমায়ের পাশে ঠাসাঠাসি শুয়ে গল্প শুনতাম রাক্ষসের গল্প, বঙ্গালি জাদুর গল্প, সিপাহি বিদ্রোহের গল্প শোনাত আমাদের বড়িমা, কী উত্তাপ সে-সব গল্পে, বাইরে যতই হিম পড়ুক, বড়িমায়ের রেজাইয়ের তলায় আমরা কখনো ভয়ে, কখনো বিস্ময়ে, কখনো উত্তেজনায় বেড়ে উঠতাম —

পদাতিক বাহিনীর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে চারজনের বিছানায় সাতজন । রবিশংকর শৈশবের গল্প করছে । এ এক অদ্ভুত প্রসঙ্গ । প্রত্যেকটি মানুষকে স্মৃতির ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে । একসঙ্গে ছোট জায়গায় জড়াজড়ি শুয়ে ঘুম আসে না । কারো মনে পড়ে পিতামহের সঙ্গে শুয়ে এক পার্বত্য মূষিকের ছত্রপতি শিবাজি হয়ে ওঠার গল্প । কারো মনে পড়ে রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্যবিস্তার, দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের লড়াই । কেউ ভাবে ঠাকুর্দার বলা বত্রিশ পুতুলের গল্প, দিদিমার ঘুম পাড়ানি গানে বর্গীরা দেশে আসে, নানির লোহ্‌রি শুনে ঘুমিয়ে পড়ে শিশু সুরিন্দর ও তার ভাইয়েরা । এখন কারো ঘুম আসে না ।

স্টোর থেকে টেম্পোরারি লোন্ কার্ডে ওদের জন্যে জ্যাকেট এবং পুরণো স্লিপিং ব্যাগ ইস্যু হয়েছে । রাতে ফিল্ড টেলিফোনে রবিশংকর বেস ক্যাম্পে ওদের সিনিয়র সার্জেন্ট অলোক মিত্রকে সব জানিয়েছে । এত মৃদু আওয়াজ যে এক কানে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয় । তারপরও বারবার জিজ্ঞেস করতে হয় । বারবার বলতে হয় । মাঝে কখনো আওয়াজ ভাল হয়, আবার খারাপ হয়ে যায় । রেডিও টেলিফোনি কমিউনিকেশন এর তুলনায় হাজারগুণ ভাল ।

এরকম পাশাপাশি কাত শুয়ে তন্দ্রা আসে কিন্তু ঘুম আসে না । কাজেই গল্প চলে । এর আগে এই রেজিমেন্টের সৈনিকরা পাঞ্জাব দিল্লি ও আসামে দাঙ্গা পরবর্তী ডিউটি করে এসেছে । আজ পাকিস্তানি গোলার স্প্লিন্টারে আহত নায়েক মহাদেব পাঞ্জাবে একাই দুই কট্টর উগ্রপন্থীকে মেরেছে গুলি করে । অ্যান্টি টেররিজম অপারেশানে ওদের রেজিমেন্ট এতই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল যে এবার রামজন্মভূমি বাবরি মস্‌জিদের বিবাদেও ওদেরই যাওয়ার কথা ছিল । হঠাৎ সবাই শোনে ফ্রন্টে যেতে হবে — সত্যিকারের লড়াই লড়তে । অ্যান্টি টেররিজম অপারেশানের থেকে ফ্রন্টে লড়াই করা অনেক সহজ । এখানে শত্রু নির্ধারিত । বাড়ি-বাড়ি ঘুরে আতঙ্কবাদী খুঁজতে হবে না । উগ্রবাদী ভেবে নিরীহ স্কুল-মাস্টার কিম্বা গরীব চাষীর একমাত্র ছেলেটিকে মেরে ফেলে অপরাধ-

বোধে ভুগতে হবে না। নিরীহ ভেবে ছেড়ে দিয়ে পিঠপিছে ছোরা ঘোপার ভয় থাকবে না। হাবিলদার রানাডের তাই কোন কষ্ট নেই। যত ঠাণ্ডাই হোক না কেন, সহ্য করে নেব আমরা। যত গোলাই আসুক, ভয় পাই না! মদ খায়নি তবু রানাডের বলার ভঙ্গি অনেকটা মাতালের মতন। ওর কথায় রবিশংকরের হাসি পেয়ে যায়। স্প্লিন্টার মহাদেবের পায়ে ঢুকেছে, নিজের পায়ে ঢুকলে বুঝতে যন্ত্রণা কাকে বলে?

গত বছর অন্য এক ফরোয়ার্ড বেসে রবিশংকরের উরুতে স্প্লিন্টার ঢুকেছিল সেদিনের কথা সারাজীবন মনে থাকবে ওর। আগের দিন সন্ধ্যায় পাকিস্তান ওদের পোস্টের আশেপাশে কমান্ডো ড্রপ করে। পুমা হেলিকপ্টারে জনা দশেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেমে আসে মনজিৎ টপে। দূরবিন লাগিয়ে আবজারভাররা সে সব দেখলেও নাইট ভিশানে সঠিক নাম্বার বলতে পারে না। ঐ বেস এবং সব ক'টা পোস্ট ও মাথাকাটা পাহাড়ের প্রায় কাঁধের কাছে ছড়ানো প্রশস্ত বেসের একদম কিনারায়। ঘুম চোখে নিজেদের কামানগুলি তৈরি করার আগেই শেষ হয়ে যায় ওরা। তারপর গোলাবর্ষণ থামে। কিন্তু অবজারভেশান পোস্টগুলি থেকে কমান্ডো অ্যাটাকের খবর আসে। বেস থেকে সৈন্যরা ছুটে যায় ওদের সাহায্যে। রবিশংকর ও উদয়কুমার তাদের দু'টি রেডিও টেলিফোনি সেটে দিন রাতের মেন ও স্ট্যান্ডবাই ফ্রিকোয়েন্সি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে প্রাণপণে সমস্ত কন্ট্রোল স্টেশানগুলিতে খবর পাঠাতে থাকে। সে-সব কন্ট্রোল স্টেশান থেকে এয়ারম্যানরা ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে জানালে শেষরাতেই আর একটা ব্যাটেলিয়ন ঐ পোস্টের জন্যে রওনা হয়। তার আগে কাছাকাছি আর একটা বেসের সৈন্যরাও প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া আর রাতের আঁধারে লিংকে চলার সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসে।

ভোরের আগেই সব পাকিস্তানি কমান্ডোর মৃতদেহ সারি দিয়ে টাইগার হাটের সামনে ফেলে দেয় ঐ বেসের সৈন্যরা। গুণে গুণে ত্রিশজন। তার উল্টোদিকের সারিতে শোয়ানো বিয়াল্লিশজন ভারতীয় সৈনিকের মৃতদেহ। আরো এগারোজন আহত। তারমধ্যে রবিশংকর একজন। প্রাথমিক শেলিংএর সময়েই স্প্লিন্টার লেগেছে ওর পায়ে। ওদের হাট ওখানে টাইগার বা বেস কমান্ডারের পাশেই। আর অন্যপাশে ছিল এম. আই. রুম কাম ডাক্তারসাহেবের হাট। ডাক্তারসাহেব ওর আঘাত একবার দেখে উদয়কে বলে, ওর হাত দু'টি জোর করে চেপে ধর। উদয় হাত ধরতেই রবিশংকরের পায়ের উপর চেপে বসে বুখারিতে গরম করা চাকু দিয়ে খুঁচিয়ে উরু থেকে স্প্লিন্টার বের করে তারপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। সে যে কী যন্ত্রণা! অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। চেঁচানোর উপায় নেই। শত্রুসৈন্যের অবস্থান ঠাহর করা যাচ্ছে না তখন। টুঁ শব্দটিও না করে তাই থাকতে হয় আরো বারো ঘন্টা। সে যে কী কষ্টের!

সকাল আটটা নাগাদ আবার শেলিং শুরু হয়। এবার ভারি জবাব যায় এ পক্ষ থেকেও। দূরবীনে দেখে ওরা মাত্র দু'টি গোলায় ওদের নিকটবর্তী বেসটিই উড়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে একটি পাহাড়ের চূড়া। ওরা বুঝতে পারে এ ভারি গোলা এসেছে বোফর্স কামানের নল থেকে। তারপর পরপর আরো ছ'টি বোফর্সের গোলা শত্রুপক্ষের সবকটা পোস্টকে জনশূন্য করে দেয়। আনন্দে লাফায় ভারতীয় সৈন্যরা, আহত সৈন্যরা, এমনকি শব্দে লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে সারিবদ্ধ মৃত সৈনিকরাও। এদের অনেকেই সামান্য আঘাত পেয়েছে মাত্র। শেষরাতে জখম হয়ে কোন

ডেরায় ঢুকতে পারেনি বলে মাইনাস বিয়াল্লিশ ডিগ্রি তাপমানে জমে পাথর হয়ে গেছে । বাকিরা হাসে, আবার কাঁদে, বিলাপ করে নিঃশব্দে ; সহসৈনিকের মৃত্যু যে কী কষ্টদায়ক !

রানাডের কথায় অবাক লাগে । আজই মহাদেবের পায়ে স্প্লিন্টার ঢুকেছে আর ও বলছে, হিমবাহকে ডরাই না, গোলাকে ভয় পাইনা, আরো কত ডায়ালগ ! তবু ওরা নিঃশব্দে শোনে । কেউ কেউ উঠে বসে । বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে শোনে একে অন্যের গল্প ! গল্পের যে-কোন মোড় থেকে, যে-কোন ডায়ালগ থেকে নিজস্ব স্মৃতি মেশানো এক সমান্তরাল গল্পে বুঁদ হয়ে থাকে । এভাবেই সারারাত গল্প করে সাতটি অভিনব গল্পের রচয়িতারা, শুরু নেই শেষ নেই, এমন গুদামে পাশাপাশি রাখা সাতটি আনাজের বস্তার মতন ।

পরদিন সকালে রামস্বরূপের আর. টি. সেটে নিজেদের ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করে রবিশংকর কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলে । জবাবে অশ্লীল সব গালি বেতারে ভেসে আসে । কোন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট তার অধস্তন কর্মচারীদের এমন অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেবে তা কল্পনাও করা যায় না ! ওরা যেন ইচ্ছে করে আগুণ লাগিয়েছে ! রবিশংকর রাগে-দুঃখে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে । মা-বাপ তুলে গালি দিলো লোকটা ! রামস্বরূপের সামনে এয়ারফোর্সের প্রেস্টিজ বরফে মিশে গেল । ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না আর রবিশংকর । সুরিন্দর রেগে কমান্ডিং অফিসারকে গালি দিতে শুরু করে । রবিশংকর ওকে চুপ করায় । — তুই তো লেখাপড়া শিখেছিস সুরিন্দর, শরীফ বাপের ছেলে তুই ! সুরিন্দর দুঃখে ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে । আমাদের সবকিছু পুড়ে গেছে তবু সি. ও. বকছে ! রবিশংকর সান্ত্বনা দেয়, জান্ তো বেঁচেছে, আবার হবে সবকিছু, চিন্তা করিস্ না — সব ঠিক হয়ে যাবে !

সারাদিন টেলিফোন এক্সচেঞ্জে হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে বসে থাকে ওরা । সকাল থেকে বিকেল অব্দি তুষারপাতের জন্যে সার্জেন্ট মিত্র আজ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাতে পারেনি । দিনরাত জলের প্রয়োজন । এক্সচেঞ্জের দু'জনের সঙ্গে রবিশংকর ও সুরিন্দর গিয়ে পাকা বরফ কেটে আনে একবার । পরে প্রয়োজনে কাঁচা বরফ দিয়ে কাজ চালানো যাবে । একদিনে দু'বার বরফ কাটতে যাওয়া অসম্ভব । রবিশংকরের 'সব ঠিক হয়ে যাবে' কথাটা মনে ধরলেও কী করে সব ঠিক হবে বুঝতে পারে না সুরিন্দর । যা যায় তা কি আর ফিরে পাওয়া যায় !

বিকেলে আবার রামস্বরূপের সেট টিউন করে সার্জেন্ট মিত্রকে 'ওকে' রিপোর্ট দেয় সুরিন্দর। আজ সারাদিন কোন শত্রুর গোলা আসেনি । একরকম অপেক্ষায় জাহাজডুবি নাবিকদের নির্জন দ্বীপে বসে দিন কাটানোর মতন । কেন জানি আজ কোন গল্পই জমছে না । চুট্‌কি জোকস্ ইত্যাদিতে সময় কাটাচ্ছে অনেকে । সুরিন্দর ও রবিশংকর ওদের হাসিতে যোগ দিয়েও হাসতে পারছে না । এক প্রকট বিমর্ষতার রাহুগ্রাসে আক্রান্ত ঠোঁট ফাঁক হয়ে হাসি বেরোয়, কথা বেরোয়, সামান্য খাবার ঢোকে, যথেষ্ট পানীয় ঢোকে, কিন্তু মন সবসময় কাঁদতে থাকে কখনো শৈশব-কৈশোরের নিজস্ব নদীর দুই তীর ছাপিয়ে আবার কখনো যৌবনের কোন চোরা স্রোতের ঘূর্ণিতে ।

গোলা আসতে শুরু করলেই ছুটে গিয়ে বরফের গুহায় ঢুকতে হবে । অপেক্ষায় সন্ধে হয় । দূর দিগন্তেও কোন জাহাজ দেখতে পায় না নাবিকরা । আপাতত শত্রুর আক্রমণের কোন ভয়

নেই। সাধারণত এত ঘন তুষারপাতে গোলা আসে না । যত রাত বাড়ছে ততই নিরাপত্তা বাড়ছে। ওরা একজন-একজন করে বাথরুম সেরে এসে জুতো মোজা খুলে গরম জলের টিনে পনের কুড়ি মিনিট পা ডুবিয়ে বসে থাকে । কেউ কেউ বসে থাকে আধঘন্টা বা তারও বেশি সময় । ততক্ষণে পরবর্তী জনের জল গরম হয় দু'টো স্টোভ অনবরত ভনভন করে জ্বলছে । আরো দু'টো তেল ভরে তৈরি করা আছে । বাইরে পেচ্ছাব করে এসে রামস্বরূপ তুষারপাতের শেষ রিপোর্ট দেয় 73·SN এবং সারাদিনে মোট উনত্রিশ সে. মি তুষারপাত হয়েছে ।

ঘন তুষারপাতে হাওয়া কম থাকে । তাই মাইনাস উনত্রিশ ডিগ্রিতেও ঠাণ্ডা লাগে না । রুম টেম্পারেচার অবশ্য মাইনাস সতেরো মাত্র । বরঞ্চ বেশ গরম লাগছে । শুধু কান গাল হাতের তেলো আর জুতো খালার পর পায়ে ঠাণ্ডা লাগে । ওরা একে-একে সবাই স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ে । সবাই চেপেচুপে ঘুমানোর চেষ্টা করে । যত কষ্টই হোক, রোজ না ঘুমালে শরীর দুর্বল হয়ে যে-কোন মুহূর্তে স্থায়ী ঘুম এসে গ্রাস করবে । একেকজনের শরীরে একেকরক বোঁটকা গন্ধ । নিঃশ্বাসে বিড়ি আর খৈনির গন্ধ । সব একাকার হয়ে একসময় সব্জিমাণ্ডি বা নর্দমার কাছাকাছি এলাকার লোকদের মতন সহ্য হয়ে যায় । সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না । ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যেও সেই দুর্গন্ধ ঢুকে যায় । তারপর আর কিছু টের পাওয়া যায় না ।

পরদিন আকাশ পরিষ্কার হলে হেলিকপ্টার আসে । জাহাজডুবি হয়ে কোন নির্জন দ্বীপে আশ্রয় নেওয়া নাবিকেরা দূরদিগন্তে জাহাজ দেখতে পায় । এই ভয়ংকর পরিবেশে বন্দি সৈনিকদের বুকে খুশির বাণ ডাকে । চার-পাঁচ কি.মি. দূরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত আওয়াজ শুনতে পেয়ে রবিশংকরের শরীরে নতুন উদ্দীপনা, বেঁচে থাকার প্রেরণা ফিরে আসে । খাবার কেরোসিন, অস্ত্রশস্ত্র । অসুস্থ, মরণাপন্ন এবং মৃতদেহের সারি হেলিপ্যাডে ।

রবিশংকর ও সুরিন্দরের হাতে পাইলটরা নামিয়ে দেয় তিনটে রামের পেটি, আর দু'টি আর. টি. সেট. এবং ব্যাটারি । অনেক কষ্টে হ্যাচেড়-প্যাচোড় করে দু'ঘন্টা পরে ওরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পৌঁছায় । ফেরার পথে পোড়া রাশিয়ান হাটের পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধে টের পায় তুষার পাতেও আগুণ পুরো নেভেনি । পুরো তিনদিন পর আগুণ থামে । শেষ দু'দিন স্বজনহারা শরণার্থীর মতন ধিকিধিকি জ্বলছিল । হাবিলদার রাণাডে ও এক্সচেঞ্জের সৈনিকরা ওদেরকে তাড়াতাড়ি নিজেদের ডেরা বানিয়ে চলে যাওয়ার কথা বলে, কিন্তু অন্য কোন সাহায্য করে না । ওদের কাজগুলিই তখন বড় হয়ে যায় । রবিশংকর একবার সাহায্যের কথা বলায় রাণাডে ভ্রূ কুঁচকে ঝাঁঝ দিয়ে 'নেহী' বলে । অন্যদের হাবভাবও এরকম যেন, শুতে দিয়েছি তাই বেশি । হাত বাড়ায় রামস্বরূপ মীনা । সেজন্য তৃতীয় দিনেই ওরা রামস্বরূপের তাঁবুতে চলে যায়।

ওকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন দুপুরে ড্রপিং জোনে গিয়ে প্যারাশুট ইত্যাদি হেঁচড়ে এনে তাঁবু টাঙায় । ঠিক তাঁবু নয় । চারকোণায় আটটা বরফভরা খালি তেলের ব্যারেল লাগিয়ে টেলিফোনের তার দিয়ে বেঁধে কয়েক পরতা প্যারাশুটের কাপড়ের ভেতরে স্কিটবোর্ড ঢুকিয়ে দেওয়াল ও ছাদ তৈরি করে । স্কিটবোর্ড দিয়েই দরজা বানায় । তারপর সারি দিয়ে জেরিক্যান বরফের উপর

বিছিয়ে মেঝে ও তার উপর একপাশে আরো একশো কুড়িটা জেরিক্যান থাক-থাক সাজিয়ে ডবল বেড কাম অফিস ।

সেই ঘরে বসেই আজ ওরা স্টোভে হাত সেঁকছে । দিনসাতেক ওরা কখনোই নিজেদের গরম করতে পারেনি । কাজ করতে-করতে হাত জমতে-জমতে বরফ হয়ে গেলে রামস্বরূপের তাঁবুতে গিয়ে স্টোভ জ্বালিয়ে খানিকক্ষণ হাত সেঁকে । রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে । তারপর আবার লেগে পড়ে ।

এ এক অসহায় বেঁচে থাকা ! এত কষ্ট তবু দায়বদ্ধতা অপরিসীম । গত সকালে লেহ্ থেকে কোর্ট অফ ইনকোয়ারি টিম এসে জ্বলে যাওয়া রাশিয়ান হাট আর শ্রীরাম হোন্ডা জেনারেটরে, ফটো তুলে নিয়ে গেছে । আর অজস্র জেরা । কৈফিয়ত দিতে দিতে মুখে ফেনা উঠে যায় বারবার । শালারা উড়ে এসে পুলিশি জেরা করছে — থাক্ না কয়দিন এখানে, তাহলেই বুঝবি কয়টা পাম্পে স্টোভ জ্বলে, কয় হ্যাচকায় চালু হয় জেনারেটর, স্পার্ক প্লাগ সাফ করতে কেমন আঙুলের চামড়া উঠে যায় ! কিভাবে প্রাতঃকৃত্য সারি আমরা—একবার করে দেখে যা না !

একমাত্র সাক্ষী রামস্বরূপ । আর কেউই কেমনি কিছুই দেখেনি বা জানে না বলেছে । উন্নাসিকতা বা কোন বিরুদ্ধভাব নয় । সব্বাই ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল । আসলে ভয় । কেউই নিজের-নিজের শান্তি নষ্ট করতে চায় না । নির্ধারিত ছুটি ঠিক সময়ে যেতে চায় । রামস্বরূপ ব্যতিক্রম । সবসময় সঙ্গে থেকে ও এয়ার ফোর্সের ছেলে দু'টিকে ভালবেসে ফেলেছে । প্রতিদিন তরকা দিয়ে রান্না করে খাওয়ায় । ও আবার রান্নাটান্না একদমই করতে পারে না ।

কোর্ট অফ ইনকোয়ারি টিমের জেরায় রামস্বরূপ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা বাক্যই বারবার বলে যায়, ইনকা কোই গলতি নেহি সাহাব, সব কিস্মত কা খেল্ হ্যায় ! কৌন আপনে আপ্ কো জ্বালানা চাহ্তা হ্যায় সাব ?

রবিশংকর স্লিপিং ব্যাগের ভেতর কৃতজ্ঞতায় ছটফট করে । ছটফট করে সুরিন্দর । শোঁ শোঁ বাতাসে তাঁবুর প্যারাশুটের দেওয়াল ফুলে ফুলে ওঠে । তলায় ঝোলানো বরফ ভারে জেরিক্যানগুলি একে অন্যের গায়ে লেগে এক অদ্ভুত ছন্দে জাগিয়ে রাখে ওদের ।

❑ বেসক্যাম্পে মৃত্যুর গন্ধ ও গ্রীনল্যাণ্ড

রাত কত জানে না অলোক । জানতেও চায় না । শুধু অতিক্রম করতে চায় । ইঁদুর দাপায় স্লিপিং ব্যাগে । ইঁদুর খাবার নিয়ে বারবার বিলেটের দেওয়ালের ফোঁকরে ঢুকে রেখে আসে । দেওয়ালের গোড়ায় মেঝেতে ইঁদুরের গর্ত কতবার মাটি পাথর গুঁজে বন্ধ করেছে ওরা। কিন্তু ইঁদুরেরা ঠিক গর্ত খুঁড়ে নেয় আবার । যতই ভাবে সব ভুলে ঘুমিয়ে পড়বে, এক অদৃশ্য ইঁদুর অথবা অনেককটা ইঁদুর চেতনার মেঝে খুঁড়তে থাকে । চারপাশে মাটি জমতে থাকে । উচ্ছার মাটি জমে সবুজ পাহাড় অস্তিত্বের আকাশ স্পর্শ করে । কোথায় সবুজ পাহাড় ! জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে জয়ন্ত ছটফট করছে ।

চিত্তর বিছানা থেকেও বারবার মচমচ শব্দ শোনা যাচ্ছে । ও হয়ত ভাবছে — সবুজ । পাঁচ ফিট লম্বা শুয়োকলমা । বারো মন বিঘে প্রতি । সুস্বাদু । ওর বাবা তাই বিক্রি না করে নিজেদের জন্যে রাখতো ! সেই অক্টোবরে বাবার অসুস্থতার খবরে ছুটি গিয়ে জয়ন্ত আর দেখতে পায়নি । পনের বিঘে সুফলা জমির মায়া ত্যাগ করে অজানা ফসলের দেশে চলে গেছে । ওর স্মৃতিপটে যখন তখন সাদা থান জড়িয়ে ভাসে এক শ্রাদ্ধ ।

ন্যাড়ামাথা তিনভাই পুকুরের পাড়ে মণ্ড পাকানো পিণ্ডিগুলি কলাপাতায় রেখে ধীর পায়ে সবুজ ঘাসের পাকদণ্ডি দিয়ে ফিরছিল । তখন একটা বিশাল কাক — কালো কুৎসিত, সচরাচর নিগণে, বাংলায় এত বড় কাক দেখা যায় না ; চিলের মতন উড়ে এসে পিণ্ডিগুলির পাশে বসে । শক্তিশালী ঠোকরে ভাঙে । হিমবাহে বড় পাকিস্তানি দাঁড়কাক দেখে চিত্ত অলোককে এই কষ্টের কথা শুনিয়েছে ।

ও ছুটে তাড়াতে গেলেই শোনে আর্ত চিৎকার, তাড়াস্ না ভাই — ওটা তোর বাবার আত্মা! ঝোপ ঠেলে পাতা সরিয়ে বেরিয়ে এসে হেডমাস্টারমশাই'র বিধবা মা । পরণে সাদা কাপড় । এত ভাল লাগত আগে ! চিত্ত ভাবতো, কুমু বুড়ো হলে এরকম দেখাবে । চিত্ত হয়ত তখন তাড়া করতো ! তখুনি মনে পড়ে — হেডমাস্টার মশাই — কুমু, বলে কিনা — একটা কালো কাক, নোংরা কাক ...... একজন সৈনিককে কাক নিয়ে এত উত্তেজিত হতে দেখে, উত্তেজনায় বরফ ছেড়ে বাংলায় চলে যেতে দেখে অলোকের অবাক লাগে ।

মাটি লেপা বারান্দায় নববিধবা মাকে ঘিরে বসে দুই বুড়ি । দৈ আর বসোগোল্লা দিয়ে পঙ্কজ ধানের চিঁড়ে খায় । চিত্ত যে বছর চাকরিতে ঢুকেছে বাবা প্রথম পঙ্কজের চাষ করেছিল । ঘন কালচে সবুজ পাতা আর তিনফুট লম্বা বিশাল ধানগাছ দেখিয়ে বলেছিল, ভাল চিঁড়ে হবে । বাবা ফসলের নাড়ি-নক্ষত্র জানতো ।

বাব্যকে কাক বলে বুড়ি দই চিঁড়ে রসোগোল্লা খায় । মা ওদের পাশে বসে । অসহ্য ! বৌদি বলে, পুরুষমানুষকে এত আবেগবান হতে নেই — আগেকার মানুষ — ওদের বিশ্বাস — তুমি সৈনিক !

সৈনিক আবেগ কোথায় রাখবে ? স্তব্ধ শ্যালো মেশিনের পাশে বাতাবি লেবু গাছের ছায়ায় বসে সেই বিকেলে ঘাসের পাতা ছিঁড়-ছিলো চিত্ত । কুমু চোরকাঁটার ডগা দাঁতে ।

— এখন ?

—আর কী ? বাবা পনের বিঘে রেখে গেছে, চাকরি ছেড়ে মায়ের কাছে থাকবো, প্রতিবছর ফসল বেচে যা থাকবে — জমাবো, জমি কিনবো, হাজার দশের ফসল বেশি, বিঘে প্রতি বাইশ মন —

— হাজার দশ কেমন ধান ?

—এক শিষে দশ হাজার দানা — বুক আগলে রাখতে হয় সোনা —

— মেসোমশাই সফল ! সর্ষে ফুল যেমন নিজের সবুজ রঙ শুঁটির শরীরে দিয়ে হলুদ এবং একসময় ফ্যাকাশে হয়ে ঝরে যায় ! তোমরা পাকা চাষা এখন —মনে-প্রাণে তুমিও —

কবিত্ব না বিদ্রূপ ? কথাগুলি ঝন-ঝন করে। সমস্ত রক্ত উর্ধ্বমুখী। ডাইনীবুড়ি, কালো কাক, দই চিঁড়ে রসোগোল্লা — চাষা চাষা ! এখনো ভাবলে কেমন লাগে ! শক্ত হাতের আঙুলগুলির আঘাতে নিমেষে গরম গালে লাল দাগ !

কুমুর বিস্ময় এবং অভিমান । দু'টো বছর কেটেছে চরম লজ্জায় । আগে পাওয়া দীর্ঘ চিঠিগুলি বারবার ওল্টায় । একবার পোড়াতে গিয়ে পারেনি । অনেক ভেবেছে ধান-সর্ষে-কুমু, কুমু-ধান-সর্ষে... । সেদিন বেহ্‌লানা বাজারে আখের রস খেতে গিয়ে কথায়-কথায় চিত্ত কিনে নেয় এনফিল্ড কোম্পানির এক ছোট মেশিন । যখন পুকুরে বেশি জল, পাশের ধান ও তিল ক্ষেতে অনায়াসে সেচের কাজ করা যাবে । দু'জন চেষ্টা করলেই হাল্কা মেশিনটা তুলে নিতে পারবে ।

গল্পঅলা ও আর একজন সাইকেলে উঠিয়ে বিলেটে রেখে আসে । চিত্ত ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়ে ঢেকে রাখে । মাঝে মধ্যেই সার্ভিসিং করে । অলোকের প্রশ্নে এই প্রথম খোলে মনের পাতা - এই টেরাগু টক্‌পো রোডে চলতে চলতে । ওর জন্যে অলোকের কষ্ট হয় । তবু একসময় অলোক এত জোরে হেসে ওঠে যে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, পাগল ! এ কথায় —হা-হা-এ তে নেহাৎই উপমা। — এতে বিদ্রূপ কোথায় ? চিত্ত মিন মিন করে বলে, আসলে ওর ঠাম্মাও —

—শাট্ আপ ! আজও কি ওকে ভুলতে পারছিস ? তুই ওকে চিঠি লেখ্ ! আজই লিখবি, সব পরিষ্কার করে লিখবি, ও এখন কি করছে ?

— নিগণ স্কুলেই চাকরি পেয়েছে-অ্যাডহক —

— যদি অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যায় ? — এ কী বললো অলোক ! ওর মুখটা হঠাৎ নীলচে হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায় । চোখে চোখ রেখে অনুভব করে ওর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে অগুণতি ছায়া। ক্রমে ছায়ারা হয়ে পড়ে সব যন্ত্র । বোমারু বিমানের ফর্মেশন । এক ঝাঁক সোনালি যুদ্ধবিমানের লো লেভেল স্ট্রাইক । ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা আগুণ ছিটকে আসে ধানক্ষেতে—খালে-বিলে । পুকুরের জলে অ-লৌকিক ঢেউ । শালুক পাতা ফুটো হয়ে ডোবে-ভাসে । গঙ্গাফড়িং উতিউতি বিভ্রান্ত শালুকের পাপড়ি ছোঁয়ে । শ্যামলা মেয়েরা কাঁখের কলসি ফেলে সটান শুয়ে পড়ে ক্ষেতের আলে-আলে। সবুজ ঘাসের মাঠে রাখালকে ভুলে দিশাহারা গরুর দল লেজ তুলে ছুটতে থাকে যে যেদিকে পারে । শান্ত পুকুরে কোথাকার ঘূর্ণি এসে দোলায় নরম ডাঁটি আর ফুল । সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম চিত্তর নিজস্ব কুমুদিনী — বারবার এই দোলায় ডুবে যায়, হারিয়ে যায়. এনফিল্ড মেশিন ক্ষেতে জল ঢালে — ধানের শিষ দেখা যায় — এই দিগন্তবিস্তৃত সবুজের মাঝে হাঁটু গেড়ে ও চোখ বুঁজে প্রার্থনা করে, এই ঢেউ, এই ক্ষরণ থেমে যাক্ !

তখুনি বিকট শব্দে একঝাঁক রূপালি বিমান প্রতি-আক্রমণ করে । ভয়, ভীষণ ভয় করে ওর। অলক্ষ্যে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণে পৃথিবী দুলে ওঠে । সেই দুলুনি থামার আগেই পরবর্তী বিস্ফোরণ । ওর চোখের সামনে মানুষজন গাড়ি-ঘোড়া ঘর-বাড়ি সব আকাশে উড়ে যায় । গাঢ় নীল ও রক্তরঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলী বিশাল ব্যাঙের ছাতা । তারপরই কালো ছাই ঝুরঝুর করে পড়তে থাকে । পড়তে-পড়তে-পড়তে পড়তে দুই গগণচুম্বী পর্বতমালা-কালোয় কালোয় ঢেকে যায় । কালো বরফ । ঠাণ্ডা-কালো হাওয়া ।

ইঁদুর লাফিয়ে পড়ে। বেসক্যাম্পের ধাড়ি ইঁদুরেরা স্লিপিং ব্যাগের উপর রুটির টুকরো নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। আচমকা হাঁটু চাগিয়ে তুললে ভারি শব্দে ফ্লোরে আছড়ে পড়ে। চি চি চিক্‌চিক্ চিক্। জয়ন্ত এবং আরো ক'জনের নাকের ডাক ইঁদুরের দাপাদাপির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুই যুযুধান পক্ষের লড়াইয়ের মতন বীভৎস।

জেগে গেলেই একটু পরে বাইরে যেতে হয়। শীতল তীব্র হাওয়া। পাহাড় ও উপত্যকা ধূ-ধূ সাদা। মাঝে কালো বরফের শৃঙ্গগুলিও সাদা হয়ে আছে। ঘরে ফিরে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়েও হাড্ডির ঠক্‌ঠকি থামাতে চায় না। যুদ্ধ চলতে থাকে। অথচ চিত্ত এই বরফের দেশে সবুজের স্বপ্ন দেখে সবসময়। জয়ন্ত এখনও প্রলাপ বকে যাচ্ছে। সকালে জোর করে নিয়ে যেতে হবে ডাক্তারের কাছে। অলোক আবার ঘুমানোর চেষ্টা করে। সত্যি-সত্যি ঘুমিয়েও পড়ে একসময়। ঘুম ভাঙায় বেড টি।

সকালে শোনে সত্যি বিস্ফোরণের কথা। বেস ক্যাম্পের অস্ত্রশালাটি ছাই হয়ে গেছে। ওরা দু'জন দু'জন করে গিয়ে দেখে আসে। সবার শেষে আলোক আর চিত্ত। গার্ড দু'জনের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বিস্ফোরণে। এসব দেখে এর থেকেও ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়লে শিউরে ওঠে অলোক।

তিনদিন ধরে জ্বরে ভুগছে জয়ন্ত। হাই টেম্পারেচার। দিনের বেলায় একটু কম থাকে। রাত হলেই জ্বর বেড়ে যায়। ডাক্তার ক্যাপ্টেনসাহেবও অসহায়। এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন সুযোগ নেই। রক্ত, পেচ্ছাব পরীক্ষা না করে শুধু আন্দাজে কী চিকিৎসা করবে! গতকালই হুণ্ডর মিলিটারি হাসপাতালে রেফার করেছে। কিন্তু আবহাওয়া ভাল না হলে, হেলিকপ্টার না এলে তো পাঠানো যাবে না! বরফ জমে সড়কপথও বন্ধ।

ওর জন্যে ভয় করছে। এখানে সব রোগই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। অপর্যাপ্ত চিকিৎসা এবং আবহাওয়া খারাপ থাকায় একদিনের ব্যবধানে দু'জন মারা গেছে। একজন ১৮ বছর বয়সী হরিয়ানি সৈনিক তিন দিন হেঁটে বিশ হাজার ফুট উঁচু এক পোস্টে চড়ার দু'দিন পর থেকেই পায়খানা, পেচ্ছাব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কিছুই করার থাকে না। তিলে তিলে ছেলেটা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দু'বছরও চাকরি পুরো হয়নি। কোন রিবনই ওর বাড়িতে যাবে না। এই কি সৈনিকের মৃত্যু? কোন সৈনিকই এরকমভাবে মরতে চায় না! সেদিন ওর ফিনারেলে যেতে পারেনি এয়ারফোর্সের কেউ। আরেক দুর্ঘটনা ওদের সারাদিন ব্যস্ত রাখে।

দুর্গম সীমান্ত পোস্টে খাবার পৌঁছুতে গিয়েছিল চিতা হেলিকপ্টার। আগের বিকেলে একটা ছোট্ট ধসে ওখানে বেশ ক্ষতি হয়েছে। হেলিপ্যাড বরফে ঢাকা। পাইলট বুঝতে পারেনা — কোথায় কী? উইন্ডশক্‌স্ কোথায় চাপা পড়েছে, কোথায় ল্যান্ড করবে, নাকি ফিরে যাবে — এরকম দোদুল্যমান সময়ে হঠাৎ অদ্ভুত কাঁপুনি টের পায় পাইলট। ইঞ্জিনের আওয়াজ পরিবর্তনে অভিজ্ঞ কান প্রমাদ গোণে। এরকম চলতে দিলে যে কোন মুহূর্তেই আগুন লেগে যেতে পারে। অথবা বিস্ফোরণ। পাইলট ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়। এখনো গ্লাইড করে কিছুটা যাওয়া যাবে।

কিন্তু কোথায় হেলিপ্যাড? আন্দাজে যেখানে স্কিড ছোঁয়ায় — ভুল! নরম বরফ। সমতল

হঠাৎ ঢালে পরিণত। প্রচণ্ড গতিতে হেলিকপ্টার খদের দিকে ধাবমান। ইজেক্ট করার সুবিধা হেলিকপ্টারে নেই। দরজা খুলে লাফায় দু'দিকে দু'জন।

ভাগ্য ভাল গড়াতে গড়াতে ওরা দেখে চিতা অনেক নিচে বিশাল একটা বরফের চাঁই বা বরফঢাকা পাথরে আটকে গেছে, অনেক দূর থেকে কোথাও হাঁটু অব্দি, আবার কোথাও কোমর অব্দি বরফ পেরিয়ে আসছে কোমরে দড়ি বাঁধা জোয়ানরা। ছোটা অসম্ভব। সামান্য অসাবধান হলে কোন বরফের ফাটলে তলিয়ে যেতে হবে।

প্রায় আধা ঘন্টা পর ঐ পদাতিক সৈনিকদের সাহায্যে পাইলটরা কোমরে দড়ি বেঁধে নিচে হেলিকপ্টারের কাছে গিয়ে শোনে তখনো ওদের কলসাইন ডেকে কন্ট্রোল স্টেশান থেকে জয়ন্ত কল দিয়ে যাচ্ছে। পরিচিত আওয়াজে ভরসা পেয়ে ওরা সাড়া দেয় এবং সব ঘটনা জানায়। কোথায় আজ এয়ার মেনটেন্যান্সের পর জয়ন্তকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল। সকালে ফ্লাইটে ওর রিলিভার নিয়ে এসেছে ওরা। এখন জয়ন্তই ওদের উদ্ধারকারীর ভূমিকায়। জ্বরের তোড়ে গলার আওয়াজ বারবার বসে যাচ্ছে, কিন্তু নতুন কন্ট্রোলারকে এখনো ভালমতন ব্রিফিং দিয়ে উঠতে পারে নি বলে অপারেশানটা ও নিজেই সামলাচ্ছে।

সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ পার্টি পৌঁছুতে দুপুর গড়িয়ে যায় নানা কারণে। অবশেষে দু'টো আর্মির চিতা উড়ে গিয়ে ওদের উদ্ধার করে আনে। এর মধ্যে ঐ হেলিপ্যাডের বরফ সাফ করা হয়েছে। হেলিকপ্টারকেও ঢাল থেকে দড়ি বেঁধে টেনে তুলেছে অনেক কষ্টে। উইন্ডসকস্‌টাকে বরফমুক্ত করেছে জোয়ানরা। সকালে এই হেলিপ্যাড স্টেট না জেনে আসাই ভুল হয়েছে। এখন মাথার চুল ছিঁড়ছে ওরা। সার্জেন্ট মিত্র বলেছে ঐ পোস্টের সঙ্গে এখনো কোন কনট্যাক্ট হয়নি। তবে ক্যাজুয়ালটি থাকার খবর এসেছে বিকেলে। দু'জন পাইলটই এ অঞ্চলে অভিজ্ঞ। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে উড়ে গেছে ওরা কোন কিছু পরোয়া না করেই। মানবিকতাই এখানে মূল ইন্ধন জোগায়। এখন বেস ক্যাম্পে ফিরে পাতার পর পাতা স্টেটমেন্ট লিখছে। আরো কত জায়গায় কত স্টেটমেন্ট দিতে হবে এখন, কে জানে। মানুষের মতন হেলিকপ্টারকেও সিলিং লেভেলের চাইতেও দু'তিন হাজার ফুট বেশি উচ্চতায় প্রায় প্রতিদিনই যেতে হচ্ছে বারবার।

ইঞ্জিনের গণ্ডগোলও প্রথম ঘটনা নয়। তবে পোস্টে গিয়ে এরকম বিপত্তি এই প্রথম। কোর্ট অফ ইনকোয়ারি হবে। দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তি হবে ওদের। ক্যারিয়ারটাই তছনছ হয়ে যেতে পারে ইনকোয়ারির রিপোর্ট বিরূপ হলে। তাই ভেবেচিন্তে স্টেটমেন্ট লিখছে ওরা।

বিকেলে খবর আসে — পরদিন রিকভারি পার্টি যাবে। লেহ্ থেকে এম.আই. ১৭ হেলিকপ্টারে 'চিতার ইঞ্জিন আসবে। টিমে চিত্তরও নাম আছে। খবর পেয়ে চিত্ত লাফিয়ে ওঠে। কত গল্প শুনেছে ফ্রন্টের! — তোমরা তো বারবার যাবে অলোকদা, আমার সুযোগই হতো না! খুশিতে টগবগ করে চিত্ত।

পরদিন সকালে ওকে সুইজা‌‌ ‍্যান্ডে তৈরি টুপি, দস্তানা, ডাউন জ্যাকেট, ডাউন ট্রাউজার, উলেন থার্মাল শক্‌স এবং কোফ্ল্যাখ জুতো ইস্যু করে অলোক। ও দেরি না করে স্টোরে দাঁড়িয়েই এইসব পোশাক শরীরে চাপায়। তার উপর কর্টিনা চশমা পরলে মনে হয় চিত্ত চাঁদে যাচ্ছে। ও নীল আর্মস্ট্রঙের মতন টলমল পায়ে ঘবলাগু-ঘবলাগু করে হাঁটে।

লেহ্-থয়েস থেকে আসা অন্য বিশেষজ্ঞরাও একই পোশাক পরে নেয়। তারপর ওরা উড়ে যায়। চারটি চিতা। একটির দুই দুরজা খোলা। পাইলট - সীটের পেছনে নতুন ইঞ্জিনটা বসানোর পর আর দরজা বন্ধ করা যায় না। চিত্ত এবং একজন এয়ারফ্রেম ফিটার তখন নির্দেশ পেয়ে দরজা দু'টো হেলিকপ্টারের নাকের সঙ্গে টানটান করে বেঁধে দেয়। হেলিকপ্টার ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার কোন কো-পাইলট ছাড়াই ইঞ্জিন নিয়ে আকাশে ওড়ে। কী বুকের পাটা! পেছন পেছন ইঞ্জিন ফিটার ও এয়ারফ্রেম ফিটারদের নিয়ে বাকি হেলিকপ্টার তিনটি।

এমন ঘটনা নজিরহীন। আঠারো হাজার ফিটেরও বেশি উচ্চতায় মাইনাস বিয়াল্লিস ডিগ্রি তাপমানে ইঞ্জিন পাল্টে আট ঘন্টার মধ্যে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার সারিয়ে নিয়ে আসার কৃতিত্ব পৃথিবীর আর কোন বিমানবাহিনীর নেই।

এমনি নজিরহীন আট বছর ধরে এই অমানবিক লড়াই। অনেকে খবরই রাখে না। পৃথিবীর উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্রে দু'দেশের সৈনিকদের যৌবনে শ্মশান ঢুকে পড়ে জনগণের অজ্ঞাতেই। অলোকের আজ চন্দ্রভানের কথা, হুণ্ডর হাসপাতালে ও খালসার ট্রানজিট ক্যাম্পের সেই সান্নিধ্য মনে পড়ে।

রাজপুত রেজিমেন্টের ২৮ বছর বয়সী সৈনিক চন্দ্রভান বিশ হাজার ফুট উঁচু অবজারভেশান পোস্টে থেকে সান্ত্রি ডিউটি সেরে এক হাজার ফুট নিচে নামার সময় খচ্ করে বুকে একটা ঘাই লাগে ভেতর থেকে। এক-মুহূর্ত দাঁড়িয়ে শ্বাস নেয় খানিকক্ষণ। কিন্তু ব্যথাটা থেকে যায়। ও তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে বরফের তলায় চলে যাওয়া বাসস্থানের প্রবেশপথে হুমড়ে পড়ে। কেরোসিনের ব্যারেলের দুই দিক গোল করে কেটে তিন তিনটে পরপর জুড়ে রেখেছে ওরা। তার ভেতর দিয়ে ক্রলিং করে ঢুকতে হয়। ভেতরটা অপ্রশস্ত। মদের বোতলে ফিতে ঢুকিয়ে তৈরি কুপির আলোতে বাবলু তখন স্টোভ জ্বালিয়ে গ্রেসিয়ার হালুয়া বানাচ্ছে। বাবলুকে নিজের কষ্টের কথা ভালমতন বলার আগেই কুড়ুলের কোপের মতন ওর ফুসফুসে ঘাই লাগে দ্বিতীয়বার।

বাবলু বল্মীক তক্ষুণি স্টোভ ছেড়ে এসে চেপে ধরে ওকে। কুপির কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখতে পায় চন্দ্রভান চোখ উল্টে দিয়েছে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত খোম্-খোম্ আওয়াজ। ওকে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে বাবুলু বুক মালিশ করে। ফ্লাস্ক থেকে গরম জল মুখে ঢেলে দেয়। কিন্তু চন্দ্রভাণ বুকে গুলি খাওয়ার মতন ছটফট করে যন্ত্রণায়। এরকম অভিজ্ঞতা বাবলুর নেই।

বাবলু তাড়াতাড়ি পায়ে কোফ্ল্যাখ গলিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি পারে এম.আই. রুমে যায়। ডাক্তার সাহেব এক-মুহূর্তও দেরি না করে এর সঙ্গে আসে। তারপর দু'জনে আবার হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকে। ডাক্তারসাহেবের টর্চের আলোয় বাবলু দেখে স্থির নিথর চন্দ্রভান। ডাক্তারসাব স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে ভালমতন দেখে। ধমনীতে একটা ইনজেক্‌শন দেয়। তারপর পালস্ ধরে বিড়বিড় করে, পালমোনারি অ্যামবোলিজম। আঁতকে ওঠে বাবলু।

— তার মানে সাহাব? কাঁদো কাঁদো আওয়াজে জিজ্ঞেস করে।

— ফুসফুসে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে — ডাক্তারসাব জোরে জোরে চন্দ্রভানের বুকে মালিশ করতে-করতে জবাব দেয়? বাবলু মনে-মনে ভাবে, বাঁচবে তো? ও একদৃষ্টে ডাক্তারসাহেবের চেহারার দিকে চেয়ে থাকে। কুপির আলোয় চেহারা ভৌতিক। ডাক্তারসাহেব মাথা নাড়ে। —

কই, এখনো কোন স্পন্দন পাচ্ছি না। তবু বাবলুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলে, তুমি আরো আধঘন্টা এরকম ম্যাসাজ করবে, যদি কোন সাড়া পাও দরজা দিয়ে মাথা বের করে বাঁশি ফুঁ দেবে। তারপর আবার বলে, মুশ্‌কিল হ্যায়। আমার জন্যে অপেক্ষায় আছে আরো দুই পেশেন্ট।

বাবলুর মুখে কথা সরে না। সে প্রাণপণে বুক ডলতে থাকে চন্দ্রভানের। কিন্তু কিসের বুক। এ যেন পাথর ডলছে। একসঙ্গে এই পদাতিক কোম্পানিতে ঢুকেছে ওরা। মধ্যপ্রদেশের সাগরে একসঙ্গে ট্রেনিং। তারপর কখনো পাঞ্জাব, কখনো আসাম, কখনো শ্রীলংকা ঘুরে অবশেষে এই হিমবাহ। পাশাপাশি থেকে থেকে দু'জন দু'জনের চোখের ভাষা বুঝতে পারে। একে অন্যের গোপন সব কথা জানে। সেই চন্দ্রভান আজ নিথর। বাবলু ক্রমে বুঝতে পারে — আর আশা নেই। ও যখন ডাক্তার ডাকতে গেছে সেই সুযোগে অন্ধকারের দরজা-জানালা খুলে ঘুমিয়ে পড়েছে চিরনিদ্রায়।

আমি কী জবাব দেব ওর বউকে ? মনে পড়ে রেল-স্টেশানে বাবলুর মা চন্দ্রভানের হাত ধরে বলেছিল, আমার ছেলেটাকে দেখো। এতদিন কথা রেখেছে চন্দ্রভান। সবসময় ছায়ার মতন থেকেছে ওর পাশে। শ্রীলংকার বাত্তিকোলায় অ্যামবুশ্ ফায়ারিংএ বাবলুর পাছা আর উরুতে যখন গুলি লাগে এই চন্দ্রভানই ম্যান্‌গ্রোভার ঝোপ থেকে তুলে ওকে কাঁধে করে নিয়ে ছুটেছে টিলা - জঙ্গল ভেদ করে। তারপর যতদিন সম্পূর্ণ সেরে না উঠেছে রোজ সকাল বিকাল ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে এসে দেখে যেত। সেই চন্দ্রভান আজ কঠিন পাথর। বাবলু ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। কোনমতেই শরীর কাঁপিয়ে আসা কান্নার ঢেউকে রুখতে পারে না ও। দুর্গন্ধময় চিটচিটে স্লিপিং ব্যাগে উপুড় শুয়ে ডুকরে-ডুকরে কাঁদে। চন্দ্রভানের স্থির চোখ-মুখে চুমু দেয়। এই পৃথিবীতে ও আজ একবারে একা হয়ে গেল।

অক্টোবরে তৈরি এই ফাইবার গ্লাসের ঘর এখন সম্পূর্ণ বরফের নিচে। ধোঁয়া আর মশলার গন্ধ মিলে-মিশে উৎকট ঝাঁঝালো আস্তানা। সৈনিকের থাকা-খাওয়া-ঘুম-প্রার্থনা আর একেঅন্যকে সান্ত্বনা জোগানোর খুপড়ি। বাকি ছ'জন এখন অবজারভেশান পোস্টে। কাল সকালে ফিরবে। সমস্ত ঝাঁঝালো গন্ধ ছাপিয়ে ওরা তখন পাবে মৃত্যুর গন্ধ। ওদের কিছুই বলতে হবে না বাবলু'র। বলতেও পারবে না ও।

❑ বেঁচে আছে চন্দ্রভান !

এ সময় বেস-ক্যাম্পের বরফে সৈনিকদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে চোখ ছলছল করে ওঠে। ফর্সা গালের উপর আলগা কালির ছোপ। কোটরে বসা চোখের পাতাগুলিও কালো হয়ে গেছে কেরোসিনের ধোঁয়ায়। অলোকের প্রশ্নে থিরথির করে কাঁপে ওর গালের চামড়া, থুত্নির দাড়ি। দু'বার গলা ঝেড়েও কিছু বলতে না পেরে কেঁদে ফেলে বাবলু বাল্মীক। অলোক ওকে জড়িয়ে ধরে। ওর শরীর কাঁপছে। পা কাঁপছে থরথর করে। অলোক ওকে রাস্তার পাশে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া এক বিশাল পাথরের খাঁজে বসায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় অলোক কাঁপছে। চোয়াল কাঁপছে সবচাইতে

বেশী। দাঁতে-দাঁতে ঠক্‌ঠকি। সে-ও কোন কথা বলতে পারে না। শরীর গরম করার জন্য স্পট জাম্প করতে থাকে। শ্বাস ফুলে উঠতে শুরু করলে জাম্প থামিয়ে কদমতল করতে শুরু করে।

ফিউনারেল প্যারেড এগিয়ে যায়। মৃতের শরীরের সঙ্গে চিপকে আছে জামাকাপড়। স্কিটবোর্ডের উপর ওকে শুইয়ে জাতীয় পতাকা ঢাকা শ্মশানযাত্রা ধীর কদমে এগোচ্ছে। সামনেই শ্মশান। জমাট বাঁধা নুব্রার তীরে বরফের উপর এরকম চিতা প্রায়ই সাজাতে হয়। হিমেল হাওয়ায় বরফকণার তীক্ষ্ণ সূঁচগুলি ক্রমাগত নাক ও গালের উন্মুক্ত অংশে বিদ্ধ হতে থাকে। রাইফেলের ডগা স্নো বুটে ছুঁইয়ে বাটের উপর দুই হাত সারিবদ্ধ অধোবদন সৈনিকবৃন্দ কমান্ডাররাও উপস্থিত। একটা সরু প্যাকিং বাক্সের কাঠে প্যারাশুটের সাদা কাপড় পেঁচিয়ে, ঘিয়ে ডুবিয়ে তৈরি অগ্নিশলাকা। এখানে আজ সাংবাদিক ডব্লিউ. পি. এস. সন্ধু এবং ফটোগ্রাফার প্রমোদ পুশ্‌কর্ণের উপস্থিতি ব্যতিক্রম। এরা হিমবাহে মিলিটারি অপরেশান নিয়ে লিখবে। দিল্লি থেকে পারমিশান নিয়ে এসেছে।

অলোক ভাবে, ওরা কষ্টের কথা কতটা বুঝতে পারবে! সৈনিকরা নিজেদের কষ্ট বলতে জানে না। সাংবাদিকদের তো বলবেই না। ওরা লিখবে যুদ্ধের ইতিহাস, পরিসংখ্যান। করাচি চুক্তি, সিজ ফায়ার লাইন, সিমলা চুক্তি, লাইন অফ কন্ট্রোল, ল্যাঙ্গি চিউড ৯৮° পূর্ব এবং ল্যাটিচিউড ৪২° উত্তরের পর মনুষ্যবাসের অনুপযোগী দুর্গম এলাকা, সিয়া কাঙ্গরি-তেরাম-সালতোরো - সুপর্ণো-রাকাপোশি-ঘাসেরব্রুম-রিমো গ্রুপ-মামোস্টড কাঙ্গরি, কে - টু ইত্যাদির ফাঁকে-ফাঁকে বিশ্বের বৃহত্তম সব হিমবাহের কথা। মিডিয়াম্যানদের আছে রাশি-রাশি তথ্যের সম্ভার। লিখবে ১৯৮৪ সালের ১৩ এপ্রিল কুমায়ুন রেজিমেন্টের একটা কোম্পানি প্যারাড্রপ করার পর পরবর্তী দিনগুলিতে কেমন করে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন অঘোষিত যুদ্ধ।

ওরা শৈত্যের কথা, মৃত্যুর সংখ্যা লিখবে। কিন্তু জানতেই পারবে না সৈনিকদের স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন, যৌন বিকারের কথা। যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরলেও পাগলাগারদের শূন্যতায় পৌঁছে যাওয়ার গল্প ওরা লিখবে না। আত্মরতি কিম্বা স্বপ্নদোষে পরিধেয়গুলি কেমন আঠা-আঠা — প্রতিদিন পাল্টে যাওয়া মানচিত্র! বাবলু'র পোশাক দেখে এই মানচিত্র অলোক চিনবে, কিন্তু সাংবাদিক চিনবে না। অলোক টের পায় জমাট শ্বেতসারের আঁশটে গন্ধ, দীর্ঘ অস্নাত একেকজন বোঁটকা-গন্ধের কস্তুরীমৃগ!

সাংবাদিকরা জানবে না— ধ্বজভঙ্গের পরিসংখ্যান। যুদ্ধে মরার চাইতে সম্পূর্ণতা হারিয়ে ফিরে যাওয়া অনেক কষ্টের। অলোক নিশ্চিত, এখানে অনেক মৃত্যুই আত্মহত্যা মাত্র।

সাংবাদিকরা কয়েকটি ফরোয়ার্ড বেসে যাওয়ার জন্যে অলোকের সঙ্গে কথা বলে। হেলিকপ্টার মুভমেন্ট ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। ওদের হিসেব মতন ভারতীয় ক্যাজুয়ালটির হার গড়ে শতকরা তেষট্টি আর পাকিস্তানের ১৯৮৯ অক্টোবরে ডন পত্রিকায় সাংবাদিকদের কাছে বলা স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শতকরা আশি। নেতাদের বৃথা আস্ফালন, কূটনৈতিক প্রহসন— দফায় দফায় উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকের ব্যর্থতার বলি সৈনিকরা পোড়ে সীমান্তের এপারে, ওপারে। অলোক

অবাক হয়ে যায় এরকম কথা শুনে । সাংবাদিক ভদ্রলোকের চোখে এক প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা । ও হয়তো এই শোকযাত্রায় আক্রান্ত । ওদের উপস্থিতি অলোকের মনে আশার সৃষ্টি করে । ওরা ফিরে গিয়ে লিখলে এ-নিয়ে হয়তো লোকসভায় আলোচনা হবে । জনমত তৈরি হবে । বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের মধ্যস্থতায় হয়তো থেমে যাবে এ যুদ্ধ । কিন্তু অলোকরা যে ওদের সব প্রশ্নেরই ভাসা-ভাসা জবাব দেওয়ার নির্দেশ পেয়েছে । ওরাই বরং অনেক নতুন খবর শোনায় । সৈনিকদের জন্য সরকারের কত খরচ ! প্রতিদিন কত কোটি টাকা খরচ হচ্ছে ।

ফরোয়ার্ড পোস্টগুলিতে এক লিটার কেরোসিন পৌঁছোনোর খরচ নাকি প্রায় ১৩০ টাকা, আর একটি ফ্রুটি জাতীয় টেট্রাপ্যাক ৪৫ টাকা । ওদের কাছে এমনি আরো অনেক খরচের কথা শুনে চোখে ভাসে— অভুক্ত-অর্ধভুক্ত অনেক-অনেক হাড়জিরঝিরে শরীর । হে দুর্ভাগা দেশ, খণ্ডিত দেশ, বিতর্কিত সীমান্তে যুযুদধান কৃষক সন্তানরা ! ধমনীতে পরস্পরের প্রতি আরোপিত বিদ্বেষের আগুণ ! হায় সভ্যতা ! শুধু তথ্য দিয়ে সাংবাদিকরা আজ অলোকের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে । তবু ওদের অনেক প্রশ্নে নীরব থাকতে হয় । অলোক অক্ষমতা জানায় । এ-ও বুঝতে পারে এত তথ্য থাকলেও ওদের প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থাকবে ।

ওরা কি অনুভব করতে পারবে, বাবলুর শূন্যতা ? সহ-সৈনিকের হঠাৎ বিয়োগে সে-ও আজ জীবন্ত লাশ । চন্দ্রভানের মৃতদেহ কাঁধে সে যেন নিজেরই শরীর কাঁধে ভূতের মতন চলে । শ্মশানে তোলার আগে সৈনিকদের কাঁধ থেকে জাতীয় পতাকা ঢাকা লাশটি কোম্পানি কমান্ডাররা নিজেদের কাঁধে তুলে নেয় । বাবলু নিথর দাঁড়িয়ে থাকে । অলোক ওর কাঁধে টোকা দিয়ে ডাকলে খানিকক্ষণ হা করে তাকিয়ে থাকে— যেন স্মৃতিভ্রষ্ট নজরুলের দৃষ্টি । ওকে জড়িয়ে ধরে অলোক আপাতত সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলতে চায় । কোন প্রশ্নের জবাব দিতে ভাল লাগছে না । মনটা একদমই ভাল নেই আজ । বাবলুর কম্পিত শরীর ওর সঙ্গে পাথরে বসে থাকে । তারপরই সবাই ফিউনারেল প্যারেডে অংশ নেওয়ার আদেশ পেলে উঠে এগিয়ে যায় ।

চন্দ্রভান আঠারো দিন আগে মরে গেছে । পোষ্ট থেকে লাশটা পিঠে বেঁধে অতি কষ্টে আরেক জোয়ানের সঙ্গে দড়িবাঁধা হয়ে ঝুলতে-ঝুলতে নিকটবর্তী ফরোয়ার্ড বেসে নেমে এসেছে বাবলু বল্মীক । ঐ বেসের উচ্চতা সাড়ে উনিশ ফুট। ওখানে এলাকার একমাত্র হেলিপ্যাড । এখন অলোকের মুখোমুখি চিতার ওপাশে দাঁড়িয়ে আগুণে কাঁপছে কৃশ বাবলু'র অস্থিচর্মসার শরীর । কালো তেলচিটে চামড়া কুঁচকে গেছে । কে বলবে বয়স মাত্র আঠাশ ! লম্বা চুল । উড়ন্ত দাড়ি । তেলচিটে ছেঁড়া ফাটা পোশাক । একটি ফিটফাট সাদা উইন্ডচিটার এখন ঢিলে । কাকতাড়ুয়া ।

ক্রমাগত তুষারপাত । জেরিক্যানের দেওয়াল ঘেরা মন্দিরে স্লিপিং ব্যাগ মুড়ে লাশটাকে ওরা শুইয়ে রাখে আবহাওয়া ঠিক হওয়ার অপেক্ষায় । দীর্ঘ আঠারো দিন পর এয়ার ও. পি. -র পাইলটরা মারাত্মক টেলউইন্ড নিয়ে অপ্রশস্ত হেলিপ্যাডে নামে ছয় x ছয় = ছত্রিশটা বরফভরা ব্যারেল একসঙ্গে বসিয়ে তার উপর লোহার পি. এস. পি. শীট্ মোড়া হেলিপ্যাড । চন্দ্রভানের শরীর এত বিশাল যে হেলিকপ্টারে ঢোকাতে ওর পা দু'টি কুড়ুল দিয়ে কাটতে হয় । এই কঠিন কাজটিও করেছে বাবলু স্বয়ং । এরপরও ও দাঁড়িয়ে আছে শ্মশানে । পায়ের কোফ্ল্যাখ জুতো দু'টি

কাঁচা বরফের ভেতর ঢুকে গেছে। ও ভাবছে, কী বলবে চন্দ্রভানের স্ত্রীকে। এখনো মেয়েটি জানেই না যে, সে বিধবা।

ওর গর্ভে এখন চন্দ্রভানের তৃতীয় সন্তান। বাবলুকে বলেছে চন্দ্রভান। এ মাসেই প্রসব হওয়ার কথা। ও কিছু টাকা, ভস্ম আর রিবনে লাগানো মেডেল পাবে। অন্তত এটুকু পাবে ভাগ্যবতী! যাদের স্বামীরা বরফের ফাটলে অতলে হারিয়ে যায়, ধসে চাপা পড়ে, তারা এতটুকুও পায় না।

ঘিয়ের টিন উল্টে দিলে বরফের উপর দাউদাউ জ্বলে ওঠে, তারপর কেরোসিন। অলোকের হঠাৎ মনে হয় চন্দ্রভান বেঁচে আছে। সেই হুগুর হাসপাতালে অপারেশানের দু'তিনদিন পর থেকে শেষ রাতে ঘুম ভেঙে প্রায়ই পাশের বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটা কখন জাগবে সেই অপেক্ষায় থাকতো অলোক! এই বুঝি বিছানা থেকে নেমে বুখারি জ্বালাবে লোকটা! আজ মনে হচ্ছে, এই বুঝি উঠে আগুণ থেকে বরফে নেমে আসবে। এ যেন সার্কাসের খেলা। না হলে চারিদিকে বরফের পাহাড় সাক্ষী রেখে সূর্যহীন দুপুরের তুষারপাত এবং সৈনিকের অশ্রু দেখার আহ্লাদে অমনি জামাকাপড়ে চোখ বুঁজে সহ্যশক্তি দেখায়? সালতোরো এবং কারাকোরামের মাঝে বরফের সমুদ্র 'সিয়াচেন' ইন্দিরা কোল এর বাইশ হাজার ফুট থেকে প্রায় একশো কি. মি. দক্ষিণে এই বেস ক্যাম্পে নেমে এসেছে। হাজার হাজার চন্দ্রভান নানা উচ্চতায় যুযুধান। তাই শুয়ে থাকা চন্দ্রভান হাসছে।

বেস ক্যাম্পে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে স্লিপিং ব্যাগ সরাতেই দেখা যায় বীভৎস দাঁতের পাটি। মন্দিরের ইঁদুর ওর ঠোঁট খেয়ে ফেলেছে। এই মৃত্যুকে বাবলু বলে — স্বর্গে যাওয়া! গীতায় লেখা আছে, কৃষণজী অর্জুনকে বলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে মরলেই স্বর্গলাভ। পূজারিজীর শেখানো বুলি! বাবলুকে দেখে খারাপ লাগে। ওর সাদা পাশাক সবুজে-কালো চিটচিটে। অভিযোগহীন চোখ দু'টিতে গত তিন মাসের বিভীষিকার ছাপ স্পষ্ট। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো মানুষের মতন বলে, কোন্ পূর্বজন্মের পাপে সফেদ পানিও আমাকে স্বর্গে পাঠায় নি! ওর মুখে টমেটো পচা দুর্গন্ধ। আজ বোধ হয় দাঁত মাজে নি বাবলু।

আন্দামান নির্বাসনকে হিন্দি বলয়ে কালাপানি বলে। তুলনায় সফেদপানি একশোগুণ কষ্টকর। অলোকের মনে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকরা বোকা। হাততালির বদলে তুষারবর্ষণকারী আকাশে ফায়ারিং করছে যেমন রাতের আঁধারে ওরা শত্রুর গুলির জবাব দেয়।

আগুণ। আবার আগুণের দিকে, কালো ধোঁয়ার দিকে, বারবার আগুণের দিকেই চোখ পড়ে। ওরা তাই দেখতে এসেছে। অনুভব করছে এই সৎকার। বাইরে থেকে যেমন দেখছে তেমনি, ভেতরটা জ্বলছে বলেই হয়তো জয়ন্ত ও আরো অনেক জয়ন্ত প্রতি-রাতে গুমরে কাঁদে।

সেদিন ঘোরের মধ্যে কাটে সন্ধ্যা। সবার মুখেই চন্দ্রভান। গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে গা মোছে অলোক। উত্তেজনায় টেনশানে এই ঋণাত্মক তাপমানেও ঘেমে গেছিল। নিজের কোন কষ্টই আজ কষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। আজ আর খাবার মডিফিকেশান করতে বসে নি কেউ? কোনমতে লঙ্গর থেকে আনা আধাসিদ্ধ আলুর তরকারি রসোগোল্লার খালি টিনে গরম করে দু'টো-চারটে রুটি খায় সবাই। কারো মুখে হাসি নেই।

রাতের স্বপ্নেও সেই সৎকার । চন্দ্রভানের জায়গায় নিজেকে দেখে আঁতকে ওঠে অলোক । হলদে ছোপ-ছোপ দাঁতের পাটি । পা দু'টি বুকের উপর — কী বীভৎস । শেষরাতে কুপি জ্বালিয়ে বসে সিগরেট ধরায় । হাত কাঁপছে । দু'টো দেশলাই কাঠি খরচ হয় । শরীর কাঁপছে থির-থির । মনে পড়ে বাবলু'র সেই কম্পন । ধোঁয়া গলায় গেলে কাশি ওঠে । খক-খক কাশির শব্দে একজন দু'জন করে সবাই উঠে বসে । একে-একে সবাই দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায় সব্বার হাত কাঁপছে । শরীর কাঁপছে থির-থির । বাবলু এই মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে আঠারো দিন কাটিয়েছে কেমন করে ! বিষধোঁয়া গলায় গেলে সবাই কাশে । বিলেট থেকে কাশির শব্দ পৌঁছে যায়, আর্মির ব্যারাকগুলিতে । খানিকবাদে সমস্ত ব্যারাক থেকে কাশির শব্দ ভেসে আসে । কাশির শব্দে বেসক্যাম্পের শেষরাত গড়িয়ে যায় ভোরের দিকে । ব্যারাকে-ব্যারাকে বুখারি জ্বলে ওঠে । বুখারি জ্বলে ওঠে ওদের বিলেটে । উত্তাপে অনেকক্ষণ পর কাশি থামে ওদের ।

আজ বরফ হাঁটু অব্দি । এখনও অবিরাম তুষারপাত । আজ বেস ক্যাম্পে পেঙ্গুইনরা প্রাতঃকৃত্য সারতে বসতে পারছে না । হাঁটু ভাঁজ করতে গেলেই পেছনে বরফ লেগে যাচ্ছে । কোদ্যাখ দিয়ে যতটা সম্ভব বরফ সরিয়ে কোনমতে বসার চেষ্টা করে অলোক । স্কুলজীবনের নী বেণ্ডশাস্তির মতন একটু ঝুঁকে । কিন্তু সম্পূর্ণ হালকা হতে পারে না । ভালমতন পেট হালকা করতে পারেনি কেউ । একটা অস্বস্তি থেকেই যায় । গোমড়া মুখে ফিরে এসে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে বুখারির পাশে বসে সবাই । চন্দ্রভানের ভস্ম এতক্ষণে নিশ্চয়ই এক ফুট বরফের নিচে । অলোকের মনে পড়ে খালসারে প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে দূরের তিরিত গ্রামে তেরঙ্গা উত্তোলন দেখে এসে চন্দ্রভানের স্টোভেই হাত সেঁকেছিল ও ।

❑ হিমবাহ মূষিকের গল্প

বেসক্যাম্পে সারাদিন লেপের তলায়, স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে নানা অবস্থায় শুয়ে-বসে থাকা অস্বস্তিকর । অনেকেই অসুস্থ — খিটখিটে । প্রায়ই বেশি মদ খেয়ে সামান্য বিষয় নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায় । একে অন্যের মা-বোনকে অতি আদরের সম্বোধন করে । হাতাহাতি হয়ে যায় প্রায়ই । শান্তি-স্থাপনে বেগ পেতে হয় । মদ খায় না বলে অলোকের প্রায়ই টক ঢেঁকুর ওঠে । মুখভরা টকরস বারবার বাইরে ফেলে গরম জলে মুখ ধুয়ে বিলেটে ফেরে । তবু ঝগড়া এড়াতে মদ খায় না ও । এরকম চলতে থাকলে অচিরেই পাগলাগারদ হয়ে পড়বে এই পরিবেশ । অলোকের আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে । ও আজ একা-একাই হাঁটতে বেরোয় টেরাঙ-টকপো রোডে । মুখে টকরস উঠে আসছে বারবার । ও থুঃ করে রাস্তার কিনারায় ফেলে।

পা টিপে টিপে হাঁটতে হচ্ছে । একটু এগিয়েই অলোক পরিচিত একজনকে পেয়ে যায় । হাবিলদার উপেন্দ্রপ্রসাদও ওকে দেখে অবাক । ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে । ওর পাশাপাশি চলছিল আর এক কিংবদন্তি পুরুষ নায়েব সুবেদার তরসিম সিং । উপেন্দ্রপ্রসাদ অলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় । তরসিমের চোখ দু'টি ভীষণ উজ্জ্বল । উপেন্দ্র'র সঙ্গে অলোকের মার্চ মাসে

শেষ দেখা হয়েছে লেহ্ জেনারেল হাসপাতালে।

উপেন্দ্রপ্রসাদ তখন নাসপাতি খেতে খেতে ডাকে আসা 'সৈনিক সমাচার' হাতে নিয়ে হাসপাতালের কাঠের বেঞ্চে বসে ছিল। ওর নাকে তখনো ব্যান্ডেজ বাঁধা। সৈনিক সমাচারে ছবিসহ ওদের কীর্তিকাহিনী ছাপা হয়েছে, শিরোনাম — দ্য গ্রেট গ্লেসিয়ার র‍্যাটস্‌! সুবেদার তরসিম সিং মাসখানেক আগেই ছুটি পেয়ে অমৃতসরের কাছে নিজের গ্রাম বাটালায় গেছে। আজ ওকে পেয়ে সব মনে পড়ে যাচ্ছে অলোকের। তরসিমের বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী। জালিয়ানওয়ালাবাগ বধ্যভূমি থেকে যে ক'জন প্রাণ নিয়ে ফিরেছে ওর বাবা তাদেরই একজন। পাতলা মেদবিহীন মজবুত গড়ণের তরসিমকে কখনোই অসাধারণ মনে হয় না। যেমন মনে হয়, উপেন্দ্রপ্রসাদকে। কিন্তু চোখ দু'টি ব্যতিক্রম। কোন আর্মি জে. সি. ও.-র এত জ্বলজ্বলে চাহনি এই প্রথম দেখল অলোক। পরিচয় হওয়ার পর তরসিম যখন জড়িয়ে ধরে, মনে হয়, ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন। কী প্রচণ্ড শক্তি ওর পেশিতে। ওর চাপে মুখে আবার টকরস উঠে আসে।

কী বিচ্ছিরি ব্যাপার। সন্ধ্যায় ও গিয়ে এম. আই রুমে বললে নার্সিং অ্যাসিস্টেন্ট দশটা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট দেয়। তক্ষুণি দু'টো ট্যাবলেট মুখে পুরে কটর-মটর চিবোতে-চিবোতে বিলেটে ফেরে ও।

অলোক পিচ্ছিল বরফে ডিগবাজি খেয়ে খাদের দিকে গড়িয়ে পড়ছিল প্রায়। তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় নিজের শরীর দিয়ে ওকে বাঁচায় তরসিম। নুব্রার উৎসমুখের কাছে গ্লেসিয়ার দুর্গা মন্দির। এই মন্দিরে সমস্ত প্রতীক সাজানো রয়েছে। এখানে পুজো এবং শপথ নিয়ে দলবেঁধে পদযাত্রা শুরু করে সৈনিকে.া। পিচ্ছিল বরফের পাহাড় চড়তে বারবার হাঁটুমুড়ে হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে ওকে। তরসিম সিং সঙ্গে থাকায় রক্ষে! ও-ই ট্রেনিং দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় এক কি. মি চলার পথে মাঝেমধ্যেই বিপজ্জনক গ্লেসিয়ার ডিপোজিট এবং ফাটল। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পর ট্রেনিং সাইটে পৌঁছোয় ওরা।

নানারকম গিঁট দড়ি বেঁধে ঝুলতে-ঝুলতে গভীর খাদ পেরিয়ে যাওয়া, আইস অ্যাক্স আর কোমরে বাঁধা দড়ি নির্ভর খাড়া দেওয়াল চড়া, দড়ি ছাড়া শুধু কুঠার এবং পায়ে কাঁটা লাগানো জুতো পড়ে খাড়া ওঠা-নামা, সিঁড়ি লাগিয়ে ফাটল পার হওয়া, ফাটল থেকে সহসৈনিককে উদ্ধার করার পদ্ধতি। অবাক হয়ে অলোক দেখে সব।

পারদর্শী হয়ে উঠলে স্পেশাল অস্ত্রশস্ত্র চালনার শিক্ষা দেওয়া হবে। সবশেষে সারভাইভ্যাল টেস্ট। দশজন করে কোমরে দড়িবেঁধে হিমবাহে যাবে সারারাতের জন্যে। সকালে ঠিকমতন ফিরলে — উত্তীর্ণ। অন্যদের আবার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আজ ওদের ট্রেনিং ইনচার্জ উপেন্দ্রপ্রসাদ। তরসিম অলোককে সব বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আজ একদল সৈনিকের ইনডাকশান। এরা দাড়ি কামিয়ে স্নান করে এসেছে। আগামী তিন মাস এই আয়েস ভুলে যেতে হবে। প্রত্যেকের পিঠে রুক্‌স্যাক্‌। সৈনিকরা বলে রকশুক। এতে রয়েছে গরম কাপড়, স্লিপিং ব্যাগ, প্রিয়জন এবং আরাধ্য দেবতার ফটো, সাবান, টুথপেস্ট, গামছা বা খাকি তোয়ালে এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কেরোসিন স্টোভ। স্কাচ্‌ শব্দে হঠাৎ জোরালো ফ্ল্যাশ

জ্বলে উঠতে পেছন ফেরে অলোক দেখে সেই ফটোগ্রাফার প্রমোদ পুশ্‌কর্ণ নিজের কাজ করে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে নানা এ্যাঙ্গেল থেকে ট্রেনিং ও ইনডাকশানের ফটো তুলছে । অলোককে দেখে হেসে এগিয়ে আসে ও । পেছন-পেছন ডব্লিউ. পি. এস. সন্ধু-ও ।

— এরকম ফাটা জ্যাকেট দিয়েছে নাকি আপনাকে ? আলোক হেসে পুশ্‌কর্ণ'র কনুই দেখায়।

— না সাহাব, আপনাদের মতন স্ট্রং রিফ্লেক্স অ্যাকশান নেই তো, কাল বুখারির পাশে বসে তাপ নিচ্ছিলাম, কখন লেগে গেছে, সন্ধু না দেখলে তো— মুখ দিয়ে চুক-চুক আফশোসের শব্দ করে অলোক । সন্ধু হেসে বলে, মিত্রসাহেবের থেকে শিক্ষা নাও পুশ্‌কর্ণ, সেই ত্রিপুরার ছেলে, ফ্যামিলিম্যান, এখানে প্রায় তিন মাস ধরে আছে, তবু তোমার মতন বুখারিকে বিবি ভাবে নি ।— হা-হা হাসে পুশ্‌কর্ণ । অলোক হাসতে গেলে ওর মুখে আবার টকরস উঠে আসে । বিরক্ত হয়ে থুতু ফেলে বরফে । পকেট থেকে দু'টো অ্যান্টাসিড চট করে মুখে দেয় । তারপরই ওদের আলোচনায় যোগ দেয় আবার । সাংবাদিকদের গাইড বাবলু বল্মীককে আজ অনেকটা ফ্রেশ লাগছে। ডাক্তার নাম্বুদ্রিপাদ ওর কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে বলে, এরকম সবারই হয়, সবুজ শাকসব্জি নেই — টিনের খাবার সব — কী করবে ?

বাবলু গল্প শোনায় সন্ধুকে, হিমবাহে খাবার সিদ্ধ হতে দুপুর গড়ায়, রাত ভোর হয় — সব জমে শক্ত পাথর, তাই চকোলেটের সিঁড়ি তৈরি হয় আর বিস্কুটের দেওয়াল — বাবলু সদ্য পোস্ট থেকে ফিরেছে বলে আজ ওর কোন টাস্ক নেই । ওকে তাই সাংবাদিকদের সঙ্গে দিয়ে গেছে কোম্পানি কমান্ডার । অলোক নিশ্চিত ওর এই জবাব শুনলে কোম্পানি কমান্ডার মোটেই খুশি হতো না ।

সন্ধু জিজ্ঞেস করে, চকোলেট বিস্কুটের গুড়ো, কাজুবাদাম আর পাউডার দুধের সঙ্গে সুজি ডালডায় ভেজে বেশি পরিমাণে মিশিয়ে — হামারা গ্লেসিয়ার হা-লু-য়া ! বিজ্ঞাপণের শিশুর মতন হাসে বাবলু, এছাড়া গরম ম্যাগি নুডলস্‌ মোড়া ডিমের ওমলেট ! চড়চড় করে ফাটা ঠোঁটে বাবলুর লালচে ঘা হা হয়ে যায় !

ক্যাপ্টেন নাম্বুদ্রিপাদ ফোড়ণ কাটে, তারপর দেখবে প্রত্যেকের ওজন সাত থেকে বারো কে. জি. কমে গেছে !

অলোক ভাবল যত কম পারে টিনফুড ---ব ও । এমনিতে ভালও লাগে না । সমস্ত টিনফুডের স্বাদ একইরকম বিটকেল। কে জানে, আবার কবে খেতে পাবে সবুজ এবং তাজা খাবার!

ততক্ষণে আলোচনা চলে গেছে ভূত প্রসঙ্গে । বাবলুর মতন সাহসী লোক ভূতের গল্প বলে! কোন্ পোস্টে কে এক জে. সি. ও সাহেব নাকি মারা গেছিল । লাস পাওয়া যায় নি । বরফের ফাটলে অতলে তলিয়ে গেছে তার দেহ । কিন্তু ওর আত্মা রাত হলেই ঘুরে বেড়ায় । আগে যেমন কড়া প্রশাসক ছিল লোকটা এখনও সান্ত্রি ডিউটির সময় কারো চোখে তন্দ্রা এলেই নাকি হঠাৎ এসে থাপ্পড় মেরে জাগায় ! বাবলুর চোখে তাকিয়ে বোঝা যায়, এই গল্পটা ও বিশ্বাস করে ।

অলোক ভাবে, মানুষ কত দুর্বল হয়ে পড়ে এখানে ! যে লোকটা বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে কাটিয়েছে আঠারো দিন লাগাতর, আজ সে-ই ভূতের গল্প শোনায় ! চন্দ্রভানের লাশ নিয়ে মন্দিরে থাকতো বলেই নাকি ভূতে ধরেনি ! পুশ্‌কর্ণ ওর কব্জি দেখিয়ে বাবলুকে জিজ্ঞেস করে, আমাকে তো ভূতে ধরবেই না বল্মীক সাহাব, তুমি এই তামার ব্রেসলেটটা দিয়েছ ! বাবলু লাজুক হেসে মাথা নেড়ে বলে, সে জানিনা স্যার। অনেকেই এখানে এই ব্রেসলেট পরে। ব্লাড প্রেশার ঠিক রাখার জন্যেও নাকি ভাল। ক্যাপ্টেন সাহেব এ কথায় হেসে ফেলে, — রাবিশ; মানসিক শক্তি দেয় বলতে পারো ! ক্যাপ্টেন সাহেবের দৃষ্টিতে প্রজ্ঞা, হাসিতে প্রত্যয়।

অলোক মনে মনে ভাবে, মানসিক শক্তিটাই তো আসল ! মানসিক শক্তি নিয়েই তো বেঁচে আছে হিমবাহ মূষিকরা।

বেশি উৎরাই বলে ফেরার সময় এতটা কষ্ট হয় না। বারবার পিছলে ওরা একে-অন্যের ঘাড়ে উল্টে পড়ে। পার্কের স্লিপারে নামার মতন। ফেরার পথেও আলোচনার বিষয় হিমবাহ। সন্ধু মনে-মনে ভাবে — কী লিখবে !

— এখানে সৈনিকদের ব্যস্ততা আবহাওয়া নির্ভর। খারাপ আবহাওয়ায় চুপচাপ মনখারাপ করে বসে থাকা, অথবা ন্যুড ছবিঅলা তাস খেলা। ভাল আবহাওয়ায় সবাই মহাব্যস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত সবকিছু ঠিকঠাক করা, ফরোয়ার্ড পোস্টে রেশান পৌঁছানো — আরো কত কাজ ! প্রতি-মুহূর্তেই প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ। জীবন-মৃত্যুর ঘনিষ্ঠসম্পর্ক। রোজ তাগড়া জোয়ানদের মৃত্যু দেখতে-দেখতে ওরা শ্মশানের ডোমের মতন পাথর হতে থাকে। প্রিয়জন, বেঁচে থাকা, সব সম্পর্ক অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। সৈনিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক বেশি আন্তরিক। চরম প্রতিকূল পরিবেশেও একের বিপদে অন্যরা জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোন অফিসার বা জে. সি ও. কারো প্রতি অবিচার করলে সহসৈনিকরা গজগজ করে। আগুণ লালন করে রক্তে, হিমবাহের প্রবল ঠাণ্ডাতেও। ওরা ভুলেও আমার কাছে তা প্রকাশ করেনি, কিন্তু ভাব-ভঙ্গিতে বুঝতে পেরেছি।

বাবলু বলে স্নো-স্কুটারে সোনম থেকে অবজারভেশান পোস্টে খাবার পৌঁছাতে গিয়ে কেমন করে বরফের ধসে পথ হারায়, কেমন করে চব্বিশটি ঘন্টা স্কুটারের চারপাশে ক্রমাগত লাফঝাঁপ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে ! সন্ধুর বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এখানে বিশ্বাস করতে হয়— এরকম অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা। মনে-মনে এই ঘটনাটাও নোট করে রাখে ও লেখার জন্যে।

অলোক ডায়েরি লেখে। ছোটবেলা থেকেই প্রতি-রাতে ঘুমানোর আগে ডায়েরি লেখার অভ্যাস করিয়েছে বাবা। এখানে এসে কিছুদিন সেটা সম্ভব হয় নি। এক লাইন লেখার আগেই কলমের কালি শুকিয়ে যায়। কত আর বারবার বুখারিতে গরম করে লেখা যায় ! তাই গত ছুটি থেকে ফেরার সময় দু'টো এইচ. বি. পেন্সিল কিনে এনেছে। ও এখানে পেন্সিলে ডায়েরি লেখে। সাংবাদিক সন্ধুকে আপাতত একটা পেন্সিল ধার দিয়েছে। সন্ধু কৃতজ্ঞ। ঐ পেন্সিল দিয়েই ও এখন লিখছে।

প্রতীক্ষায় পেরিয়ে যায় একটার পর একটা দিন। সূর্যোদয়-সূর্যাস্তহীন, পূর্ণিমা-অমাবস্যাহীন, রেডিও টেলিফোনি সেট ছাড়া একরকম যোগাযোগ বিহীন দিনগুলি। প্লেন আসে না। বাড়ির

খবর নেই। হয়তো অনেক ক'টা চিঠি একসঙ্গে পাবে। — এই ক্রমাগত তুষারপাত থামবে কবে? সন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করে অলোক। প্রশ্নটা তো ওর নিজেরও। সঠিক জবাব দিতে পারে না। সন্ধু লিখে যায়, সেদিন একটা আর. টি. সেট টিউন করে পাকিস্তান নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ ক্রিকেট সেমিফাইনালের ধারাবিবরণী শোনে ওরা। কী উত্তেজনা ক্রিকেটে! অবশেষে আফশোষ। পাকিস্তান জিতে যায়। আর্টিলারি ফায়ারিং -এর শব্দ ভেসে আসে। এক রাউন্ড গোলার দশ রাউন্ড জবাব। এই পাকিস্তান বিরোধীতার আগুণ লালন করেই হয়তো প্রতিকূল পরিবেশে ওরা বেঁচে আছে। দিনের - পর - দিন অবিরাম তুষারপাত, সকালে-বিকালে নিয়ম করে গোলাবর্ষণ। যেন যুযুধান দুই পক্ষের সৈনিকরা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে। জাহাজ ভরে-ভরে অস্ত্রশস্ত্র আরব সাগর দিয়ে এসে দুই দেশের উপকূলে নামে। তার পর থ্রি-টনার, সিক্স-টনার করে সীমান্তে চলে যায়। কঙ্কালসার দৌলতরাম, আর হাড়-জিরজিরে গুলাম হোসেনরা সীমান্তের এপারে-ওপারে আরো নুয়ে পড়ে ঋণের ভারে। নিজের লেখাটা পড়ে আরো লেখার প্রেরণা পায় সন্ধু।

অনেকদিন পর এক ভোরে রোদ দেখে ধড়মড়িয়ে ওঠে অলোক। বাইরে বেরিয়ে দেখে ঠাণ্ডা ভীষণ। কিন্তু বেস ক্যাম্পের সমস্ত সৈনিক ও অফিসাররা রোদ দেখতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আকাশভরা ছেঁড়া ছেঁড়া হাই ক্লাউড দেখে ও বুঝতে পারে রোদ বেশিক্ষণ থাকবে না। দু'টো সিস্টেমের মধ্যবর্তী ফাঁক যতক্ষণ, ততটাই রোদ পাবে ওরা। তখন রোদের প্রতিফলন চারপাশের তুষারাবৃত পাহাড়ে ঠিকরে সোনালি আবহের সৃষ্টি করেছে। সোনালি রোদে আশায় ঝলমল করে সন্ধু ও পুশ্‌কর্ণের চেহারা। রেডিও টেলিফোনিতে লেহ্‌ থেকে অপারেটর জানায় ওর চিঠি হেলিকপ্টারে থয়েস রওনা হয়ে গেছে।

খানিক বাদে থয়েসের অপারেটর প্রাপ্তি সংবাদ জানায়। বেস-ক্যাম্পের লোডের সঙ্গে চিঠিগুলি প্যাক করে দিয়েছে ওরা। অলোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। স্বল্প পরিসরে ছুটির স্মৃতি গণগণে। সুখের কাছে যাওয়া বড়ো সুখের নয়। স্মৃতিনির্ভর সুখচর্চায় বিষণ্ণ অসুখের ছায়া আড়ি পাতে। বাইরে আর রোদ নেই। কত কথা-কত গল্প আলজিভে লেগে আছে। ব্যাঙের মতন লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। অলোক সাধারণত এ কাজ রাতের আঁধারেই করে সংগোপণে। আজ চিঠি আসছে খবর পেয়ে সব কিছু অস্বাভাবিক হয়ে যায়। নিবিড় মুহূর্ত ঘন হলে স্মৃতিকে বলতে হয় — ওইখানে থামো কিছুক্ষণ। কে-ই বা অযাচিত রম্যসুখ চায়! অভিমানে জ্বলে খাণ্ডবের ক্ষুধা। কারো সাধ্য নেই জিভ ছুঁয়ে নিভিয়ে দেয়ার। স্লিপিং ব্যাগের ভেতর বিন্দু-বিন্দু জমা হয় অন্যতর উষ্ণতা, চাপা থাকে অস্থিরতা — আকুলতা। কিন্তু দেখতে-দেখতেই ঘন মেঘে ঢেকে যায় আকাশ।

দুপুরের পর থেকে আবার তুষারপাত শুরু হওয়ায় থয়েস থেকে এখানে হেলিকপ্টার আসার সমস্ত সম্ভাবনাই বরফে মিলিয়ে যায়। শুধু অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়ে অলোকের মুহূর্তগুলি। ওরা যে কেন চিঠি আসার খবর দেয়!

এই তো উনিশে পাঁচ ও আট এপ্রিলের চিঠি পেয়েছে। অন্তরা দোল পূর্ণিমার কথা লিখেছে। অথচ মনে হয় কতযুগ পেরিয়ে গেছে বাড়ির কোন খবর নেই। অনন্তকাল। প্রতীক্ষায় বরফ

জমে-জমে মন খারাপ করা সময়ে পাহাড়গুলির উচ্চতা বাড়ে । কখনো দু'পাশের পাহাড় কাছে এগিয়ে চ্যাপটা করে দিতে চায় ।আড়াল করে আকাশকে ।নির্দয় আবহাওয়া চারপাশে অনিশ্চয়তার ঘাগরা মেলে অসহায় জীবদের ঢেকে রাখে । অন্যের কষ্টও সকলের মনে সংক্রামিত হয়, তবু সবাই জানতে চায় ।

চোখ-মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয় । রাতে স্লিপিং ব্যাগের তলায় শুয়ে সে-সব কাতর চেহারা চোখে ভাসে ।ইঁদুরের উৎপাতে ঘুম আসে না ।কাল সকালে সূর্য ওঠার কথা। অন্ততঃ তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই ।আজ বিকেলে স্যাটেলাইট বুলেটিন পেয়েছে ।কিন্তু ইদুরেরা ওর এই প্রত্যয়কে খেলো করে তোলে ।তুচ্ছ প্রাণী হে অলোক মিত্র, তুচ্ছ তোমার জ্ঞান, কতটুকু জান তুমি ক্ষুদ্র জীব ? বলতে পারো এই হিমবাহে আমরা, ইঁদুরেরা কেমন করে বেঁচে আছি ? কেমন করে এসেছি এখানে ? আমাদের তো আর চিনে কাকেদের মতন পাখা নেই ! বলতে পারো আমরা শত্রুপক্ষ না মিত্র ?

ওরা খাবার নিয়ে যুদ্ধ করে ।এসময় অলোকের জন্যে অন্তরা ছাড়া আর কেউ নেই । এক বিশিষ্ট মুদ্রায় অন্তরাকে ছোঁয় স্লিপিং ব্যাগের উত্তাপে ।আলো নিভে গেছে কত আগে !অন্ধকারে অন্তরা হারিয়ে যায় বারবার ।লুকোচুরি খেলে ।ছোটবেলার নতন ।সেই ফ্রকপরা মেয়েটি । অলোক হঠাৎ সচেতন হয়ে ভাবনা থেকে দ্রুত সরিয়ে দেয় ওকে ।যুবতী অন্তরাকে তৈরি করে । কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণতা পায় না ।একবারও পাওয়া যায় না ।অস্থির সময় ফুঁসতে থাকে ।বিদীর্ণ করতে চায় পৃথিবী । ক্ষুরের শব্দ শোনা যায় শুধু । ক্ষ্যাপা চমরী ষাঁড়ের পিঠে ছিলিঙ পানচুক জানবাক্ না অলোক নিজে ! শুধু ক্ষুরের শব্দ আর প্রবল ঝাঁকুনি । তারপরই এক গভীর খাদ । তখুনি ইয়াকটা ঘোড়া হয়ে যায় ।প্রবল হ্যাঁচকায় লাগাম টানে অলোক ।দু' পা শূন্যে তুলে বিকট হ্রেষ্যায় আঁশটে গন্ধে ভরিয়ে দেয় পৃথিবী ।দূর থেকে কে যেন অনবরত ডেকে যাচ্ছে ওকে । স্লিপিং ব্যাগের তলায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে অলোক । এত রাতে কে ডাকে ? কোথায় এখন অন্তরা ? সেই ফ্রকপরা মেয়েটি এখন অনেক বড় হয়েছে ।বউ হয়েছে ।কিন্তু চেহারাটাই আর স্পষ্ট হচ্ছে না স্মৃতিতে । অলোকের এখুনি একবার অন্তরাকে পেতে ইচ্ছে করে ।

জয়ন্ত ভাবে লতার কথা । ভীষণভাবে পেতে ইচ্ছে করছে ওকে । বিছানায় লতা খুব বাধ্য মেয়ে । কয়েকটি দীর্ঘ চুম্বনের পর অবলীলায় গলে পড়তে থাকে । উপুড় কিম্বা চিৎ, পাছার নিচে বালিশ দিয়ে হাঁটু মুড়ে অথবা পেটের নিচে বালিশ রেখে যখন যেমন ভাবে চেয়েছে লতা নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে ।

লতার বুকে গোঁজার কথা ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত উপুর শুয়ে স্লীপিং ব্যাগের মুখ ঢাকার জন্য তৈরী নরম অংশটা গালের নিচে রাখে । অজান্তেই বাঁ হাত পৌঁছে যায় নাভির নিচে । ইনারের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসা পুরুষাঙ্গে হাত ছোঁয়াতেই সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। লতার সঙ্গে মিলনের সমস্ত ইচ্ছা ওখানে জমা হয়েছে । সে ডানহাতে মাথাটাকে ধরে গাল আর ঠোঁটে একে দেবে দীর্ঘ চুম্বন । ঠোঁটের ছোঁয়ায় লতার প্রতিটি অঙ্গ অস্থির হয়ে উঠবে । বাঁ হাতের গতিময়তায় ওর শিশ্ন আরো ফুলে পৃথিবী ভেদ করতে চায় । সে লতাকে আরো কাছে টানে ।তখুনি শুনতে পায়, " এসব কী করছো পাপা ?"

রিন্টুর অবাক চোখে তাকিয়ে ওরা দু'জনেই হতভম্ব। তিনমাস লাগাতর ফরোয়ার্ড পোস্টে কাটিয়ে ও প্রথমবার ছুটিতে চণ্ডিগড় গেছিল। সেই বেসামাল দুপুরে হঠাৎ জেগে উঠে রিন্টু ওদেরকে এমনি দেখে ফেলে। লতা দ্রুত হাতে চাদর টেনে নিজেদেরকে ঢেকে নেয়। কিন্তু রিন্টু জয়ন্ত'র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, " তুমিও রবিকাকুর মতন মাকে মারছো ? তুমিও দুষ্টু !"

রিন্টুর কথায় যেন বিদ্যুৎ ছিল, দুজনেরই কেঁপে ওঠে। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। লতা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। সে জয়ন্ত'র চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না। চোখ নামিয়ে নেয়। জয়ন্ত মনে-মনে লতার গলা টিপে ধরে। লতা ছটফটায়। জয়ন্ত লোহার শিকের মতন আঙুল ঢুকিয়ে ওর গলা ফুটো করে দেয়। ওর চোখ দু'টি ঠিকরে বেরিয়ে আসে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ বেরিয়ে আসে। জয়ন্তের বাঁ হাতের গতি আর কয়েক ঝাকুনিতে ওর ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত ওর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা আর ঘৃণা ওর পুরুষত্বের সঙ্গে উদ্‌গারিত হয়। এ যেন অগ্ন্যুৎপাত। লাভা ছড়িয়ে পড়ে হাত, ইনার, স্লীপিং ব্যাগ আর উরুদেশ ভিজে যায়। সে লতাকে নানা মুদ্রায় পেতে ভালবাসতো। সে প্রতিদিন লতাকে সঙ্গমে বাধ্য করতো।

রবিকে নিয়ে লতা কি সেই অভ্যাসটাই বজায় রেখেছে ? ওর হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস এখন এত দ্রুত লাফাচ্ছে সে কি এখুনি মরে যাবে ? জোরে, আরো জোরে শ্বাস নিয়েও বিন্দুমাত্র অক্সিজেন পাচ্ছে না। বেসক্যাম্পে কি অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছে ? তাঁবুর উপর ইঁদুরের দৌড়ঝাঁপ। স্লীপিং ব্যাগের উপর চাপানো লেপের বাইরে মুখ বের করলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু জয়ন্ত আর থাকতে পারে না। সে উঠে বসে নাক বের করে জোরে-জোরে শ্বাস নেয়। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে অলোকের ফ্লাস্কটা নেয়।

এটুকু পরিশ্রমেই হাতের পেশীগুলি কাঁপতে শুরু করে। কয়েক দিনের জ্বর ও ইঞ্জেকশান-ঔষধের প্রভাবে জয়ন্ত ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে ফ্লাস্কের ঢাকনা খুলে ঢকঢক করে দুই ঢোক গরম জল খায়। ওরেব্বাপ, এ যে ফুটন্ত জলের মতন গরম, খাদ্যনালী জ্বলতে-জ্বলতে জলটা পাকস্থলীতে যায়। সেখানেও তখুনি জ্বলন শুরু হয়। পেটব্যথা করে। জয়ন্ত এই ব্যথা উপভোগ করে। যে কোন কষ্টই এখন ওর কাছে বেশ উপভোগ্য। ঢাকনা লাগিয়ে ফ্লাস্কটা যথাস্থানে রেখে দেয়। তারপর স্লীপিংব্যাগ ও লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারেই লেপটা দিয়ে বিছানাটা ঢেকে দেয়। স্নো বুটের ভেতর পা গলিয়ে সে ধীরে ধীরে দরজা অব্দি এগোয়। দরজায় হেলান দিয়ে রাখা দু'টি কেরোসিনের জেরিক্যান সরিয়ে দরজা খলুতেই সে হাঁপিয়ে ওঠে।

বাইরে বেরিয়ে বরফের উপর পেচ্ছাব করার সময় জোরে-জোরে শ্বাস নেয়। আবার বিলেটে ঢুকে কেরোসিন ভরা জেরিক্যান দু'টিকে দরজায় হেলান দিয়ে রাখে। না হলে এই ছিটকিনিহীন দরজাটা যখন -তখন হাওয়ার দাপটে খুলে পড়ার সম্ভাবনা। আর সম্ভাবনা রয়েছে শুকনো খাবার ও ইঁদুরের খোঁজে কোন স্নো লেপার্ডের অতর্কিত ঢুকে পড়ার। ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর আর টলোমলো পায়ে বিছানায় পৌঁছে প্যারাশুটের ছেড়া কাপড় নিয়ে ইনার আর উরুদেশ মুছে নেয়। এতক্ষণ স্লীপিং ব্যাগের বাইরে থাকায় ঠক-ঠক করে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। একবার ভুল করে ঠক-ঠকি লাগা দাঁতের ফাঁকে জিহ্বা এসে পড়ায় কামড় লাগে। তাড়াতাড়ি স্লীপিং ব্যাগের

ভেতর ঢুকে জিহ্বার ব্যথাটা সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করে। উপভোগ করে ব্যথার তীব্রতা। পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা থামিয়ে দিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করে। কিন্তু ইঁদুরদের দৌরাত্মে ঘুম আসে না। রিন্টুর চেহারা চোখে ভাসে। এই অবোধ শিশুর চোখের সামনে যা সব ঘটেছে, তার পরিণাম কত ভয়ানক হতে পারে ভেবে শিউরে ওঠে জয়ন্ত। সে মনে-মনে ভাগ্যকে দোষ দেয়। এখানে পোস্টিং পাঠানোর দায়ে রেকর্ড অফিসকে গালি দেয়। এখানে না এলেই তো ওর জীবনে এ সব বিপত্তি আসতো না। আর একবার গালি দিয়েই হাসি পেয়ে যায়। ওকে না পাঠালে আর কাউকে পাঠাতেই হতো। হায় ভগবান! এ যুদ্ধ থামে না কেন?

একবার ঢোঁক গিয়ে সে আবার বিড়বিড় করে, হে ঈশ্বর, আগামীকাল যেন আকাশ পরিষ্কার থাকে, আগামীকাল যেন আমার রিলিভার আসে। রিন্টুর কথা ভেবেই সুস্থ হয়ে চণ্ডীগড় ফেরার ইচ্ছা জাগে মনে, অথবা মোটামুটি একটা চিকিৎসা করে পাঠিয়ে দিলেও হবে, চণ্ডীগড় গিয়ে ভালমতন চিকিৎসা করানো যাবে। সে ভাবে, চণ্ডীগড় ফিরে মিলিটারি হাসপাতাল ছাড়াও বাইরে টোটাল চেক আপ করাবে। এই যে প্রাণান্তকর কষ্টে টাকা উপার্জন করছে, সে সব কোন্ দিনের জন্যে? এসব ইচ্ছেকে প্রকট করার জন্যে মনে-মনে বাচ্চাদের মতন আঠারোর নামতা, উনিশের নামতা বলতে থাকে। নামতা বলতে-বলতে ধীরে-ধীরে ঘুমের দেশে তলিয়ে যায়। ইচ্ছের কাজু, ইচ্ছের কাঠবাদাম ইত্যাদি নিজের অস্তিত্বে বহণ করা ধেড়ে ইঁদুর জয়ন্তের ঘুমের মধ্যে বেসক্যাম্পের ইঁদুরদের দৌড়-ঝাঁপ আর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

পরদিন ভোরে সত্যি সূর্য ওঠে। অনেক আগেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ও দেখে এসছে দু'টো পাস্ই নিচু মেঘে ঢাকা। তখনও হালকা তুষারপাত। একটা প্রবল আশা ওর মনে খেলা করে। বুখারি জ্বালিয়ে আর. টি. তে অন্য সব পোস্টের ওয়েদার জেনে নিয়ে অস্থিরতা বাড়ে। নির্বাসিত যক্ষ ছটফট করে প্রেয়সীর কথা ভেবে। পূর্বমেঘেরা সাদা পর্বতশিখর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ধীরে ভেসে যায়। হয়তো প্রবল বাতাসে অনেক দ্রুতই ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু যক্ষের মনে হয় বড়ো ধীরে যায় এই মেঘ।

এই অনিচ্ছা দেখে রাগ হয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখের জল শুকিয়ে গেছে। লিপকেয়ার ভেসিলিন ঠোঁটের ফাটা আটকাতে পারেনি। একটু হা করলেই গলা শুকিয়ে যায়। ওর এই অসহায় দশা দেখে মেঘ হাসে। পূর্বাকাশ থেকে আলোর ছটা ক্রমে মেঘেদের লাল কমলা সোনালি রঙে রাঙিয়ে দেয়। তারপর দেখতে-দেখতে এক সময় দুই শৃঙ্গের মাঝখান দিয়ে হঠাৎ ড্রপ খাওয়া আগুনের বলটা দেখা যায়। অলোকের মুখে হাসি ফোটে। হাসলেই আবার ফাটা ঠোঁটের ঘায়ে টান পড়ে ককিয়ে ওঠে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আর ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেটের তিনটে কোর্স খেয়ে ফেলেছে ও ইতিমধ্যেই। তবু ঘা সারেনি।

সকাল আটটায় রোদ ওঠে। সবাই চঞ্চল এক অধীর আগ্রহে। এ সময় জল্পনা-কল্পনা ছাড়া কারো আর কোন কাজ নেই এখানে। হেলিকপ্টার আসতে পারবে কি পারবে, না! কার কার চিঠি আসবে!

ঠিক ন'টায় সবুজ এম. আই. ১৭ এসে নামে। একরাশ সোনাঝরা রোদ্দুর ঝলমলে। দ্রুত

শুরু হয়ে যায় তেল ভরা, মালপত্র নামানো - ওঠানোর তৎপরতা । দ্রুত হিমবাহের দিকে র‍্যাশান উড়ে যায় । আর একটা এম. আই. ১৭ আসে । মালপত্র নিয়ে, তেল ভরে উড়ে যায় । এয়ার ট্রাফিক ভেহিক্যালে অলোক, জয়ন্ত ও সার্জেন্ট জৈন ব্যস্ত হয়ে পড়ে । সার্জেন্ট সুভাষ জৈন জয়ন্ত রিলিভার । ওর এ্যাক্লিম্যাটাইজেশান হয়ে গেছে কবে ! কিন্তু ওয়েদার খারাপ থাকায় জয়ন্ত আর ফিরতে পারে নি ।

গ্রাউন্ড ক্রিউরা এসে চিঠি দিয়ে যায় । প্রত্যেক চিঠিই এখানে মূল্যবান ! কত প্রত্যাশার পরই না জবাব আসে ! অলোক চিঠিগুলি অন্য সহকর্মীদের পৌঁছে দেওয়া তো দূরের কথা নিজেরটা খুলে পড়ারও সুযোগ পাচ্ছে না আজ । যত সময় যাচ্ছে অস্থিরতা বাড়ছে । এখন ত্রে চিঠি হাতের মুঠোয় ! না জানি এই ফ্যাকাশে হলুদ খামে কী অপেক্ষা করছে ওর জন্যে !

এসব ভাবতে-ভাবতেই চোখের সামনে একটা ধস্ নেমে আসে । দুঃস্বপ্নের মতন । প্রকৃতির অন্যতম বিধ্বংসী শক্তি এই ধস্ লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে দুনিয়ার বিশাল সব পাহাড় পর্বতের আকৃতি বদলে দিয়েছে । এই তো কিছুদিন আগে প্রায় একুশ হাজার ফুট উঁচু বানা পোস্টের সমস্ত তাঁবু ও অনেক সৈনিককে চাপা দিয়েছে একটি ছোট্ট ধস্ । পাঁচজন মারা গেছে । বাকিরা শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি । সামনের প্রাকৃতিক আড়ালটাই সরে গেছে । প্রায় এক সপ্তাহ কঠিন পরিশ্রমের পর অন্য একটি আড়ালে আবার নতুন পোস্ট তৈরি হয়েছে । বেস ক্যাম্পে সাজাতে হয়েছে ডজনখানেক চিতা । মৃত্যু সংবাদে সৈনিকদের পরিবারে ধস্‌নেমেছে ।

প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও ধস্ নামে গোলার আওয়াজে, হেলিকপ্টারের আওয়াজে । অথচ এই ভয়ংকর পরিবেশে হেলিকপ্টার নবজাতকের কাছে মায়ের দুধের মতন । জাঠ জওয়ানরা আদর করে এম. আই. ১৭ হেলিকপ্টারের নাম দিয়েছে—দেবীলাল । চিতাকে ওরা বলে—চৌতালা । অলোকের হাসি পায় । দেবীলাল-চৌতালার শব্দে মুহুর্মুহু ধস্ নামে ।

আবহাওয়া ভাল থাকলে হেলিপ্যাডগুলি মহাব্যস্ত । একদিনে সর্বাধিক সত্তরবার অব্দি রেকর্ড আছে । এক রাউন্ড এয়ার মেনটেন্যান্স সেরে ফিরে আসা একটি হেলিকপ্টারের ঘূর্ণায়মান ব্লেডে তখন ছিটকে পড়ছে রোদের ছটা । অলোক ভাবছে, কখন খাম খুলে চিঠি পড়বে ! অন্য একটি এম. আই. ১৭ ডিসেন্ট পারমিশান নেয় । জয়ন্ত পারমিশান ট্র্যান্সমিট করার পরই খাম ছিঁড়ে অন্তরার চিঠিটা বের করে অলোক । তখুনি সালতোরোর দুই শৃঙ্গের মাঝখান থেকে হুড়মুড় করে নামে পাউডার দুধের মতন ধস্ । নিমেষে পাদদেশের তাঁবুগুলি, দু'টো দাঁড়িয়ে থাকা থ্রি টনার চাপা দিয়ে প্রায় চার মাইল ছুটে ঘূর্ণির মতন জমাট বাঁধা নব্রা পার হয় । আরো এক মাইল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টার, রিফুয়েলিং ভাউজার, হেলিপ্যাড সব সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে দেয় । ডিসেন্ট ক্লিয়ারেন্স নেওয়া পাইলট আতংকে চিৎকার করে । রিসিভারে আর্তকণ্ঠ, হোয়াট ইজ দিস ?

—নাথিং বাট পাউডার অ্যাভলাঞ্চ স্যার, প্লিজ ক্লাইম্ব আপ অ্যান্ড হ্যাভ এনাদার অরবিট ! জয়ন্তের আওয়াজ কাঁপে । গতরাত থেকে ওর ভীষণ জ্বর ।

শেষরাতে ও সকালে ঘোরে প্রলাপ বকছিলো । ক্যাপ্টেন নাম্বুদ্রিপাদ কলকাতা মেডিক্যালের ছাত্র । নিজের মাতৃভাষা লিখতে না জানলেও বাংলা ভালই জানে । গল্পে-গল্পে এখন বেশ ঘনিষ্ঠ।

প্রলাপ শুনে ওর চেহারায় অন্যরকম দুঃশ্চিন্তার ছাপ। ওরাও সেই প্রলাপ শুনে থ'। জয়ন্ত একটা ইঁদুরকে বকছে। এরকম স্পষ্ট আওয়াজে কি কেউ প্রলাপ বকে!

সমতলের গুদাম থেকে এক চালের বস্তায় করে চলে আসা ঠাণ্ডায় সিঁটিয়ে পড়া ইঁদুর নাকি সৈনিকের হস্তমৈথুনে ছিটকে পড়া বীর্য খেয়ে প্রাণশক্তি ফিরে পায়। হিরোশিমা-নাগাসাকির ভস্মে সেই ইঁদুর পয়দা করে হাজার-হাজার। ছটফট করতে করতে জয়ন্ত গালি দেয়, শালা রবি — জারজ ইঁদুর! অলোকের হাসি পায়! কষ্টের হাসি।

ক্যাপ্টেন নাম্বুদ্রিপাদ তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশন দেয়। — পাগল হয়ে যাচ্ছে লোকটা! বিড়বিড় করতে-করতে বলে নাম্বুদ্রিপাদ, মিত্রসাহেব ও কবিগুরুকে গালিগালাজ করছে, বাঙালিদের এই দোষ, বড় বেশি কবিতা, তাই প্রেম, আর দাগা খেয়ে কবিগুরুকেই — ডাক্তারসাহেবের ভ্রু কুঁচকানো।

এত কষ্টেও ওর কথা শুনে হাসি পায়। জয়ন্ত কাকে বকছে নাম্বুদ্রিপাদ জানে না! এই রবি ওদের ট্রেনিং সেন্টারের বন্ধু। জয়ন্ত রবিকে ওর স্ত্রী'র সঙ্গে সম্ভবত এমনি পরিচয় করিয়েছিল। ও জানতো, রবি গরিবের ছেলে শুধু প্রতিষ্ঠার পেছনে ছুটছে। ওর পরিশ্রম ভাল লাগতো। তখন কি আর জানতো, ওর বিশ্বাসের সুযোগে এই আদর্শ পুরুষ, শালা ইঁদুরের বাচ্চা—যৌবনের গোপন অবদমিত ইচ্ছাগুলির ঘ্রাণ নেবে জয়ন্তের নিজস্ব উদ্যানে।

এই ধস অপ্রত্যাশিত। হেলিকপ্টার উঁচুতে ওঠে। আর একটি চক্কর লাগিয়ে আবার ফাইনাল অ্যাপ্রোচে এলে ধোঁয়াশা ফিকে হয়ে আসে। দূর থেকে ভেসে আসা সৈনিকদের সমবেত আর্ত চিৎকার ছাপিয়ে হেলিকপ্টারের শব্দ।

ইনজেকশান দেওয়ার খানিক বাদেই জয়ন্তের তাপমান স্বাভাবিক। তারপরই রোদ দেখে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। ইঁদুরেরা সব দেওয়ালের ফোঁকরে, কালো বরফের গর্তে ঢুকে পড়ে। বাকি সবাই হেলিকপ্টার রিসিভ করার জন্যে তৈরি। তখন আর একটিও ইঁদুর দেখা যায় না। হেলিকপ্টার আসার খবর এমনি রোমাঞ্চকর। এই শব্দ টনিকের মতন সৈনিকদের চাঙ্গা করে। আজই জয়ন্ত চলে যাবে—লেহ্ জেনারেল হাসপাতালে।

হেলিকপ্টার নর্মাল ল্যান্ড করে দাঁড়িয়ে থাকা এম. আই. ১৭-র রঙও তখন সাদা হয়ে গেছে। ইঞ্জিন অন করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই ঝুরঝুর করে বরফ সরে গিয়ে আবার রোদে চকচক করে সবুজ রঙ। যেন কিছুই হয়নি।

খানিক বাদেই খবর আসে চারটে তাঁবু চাপা পড়েছে এই ধসে। ভাগ্যিস্ ভেতরে কেউ ছিল না। কিন্তু একান্ত আপন তৈজসপত্র-স্যুটকেস, প্রিয়জনদের ফটো এবং চিঠিপত্র সব একশো ফুট বরফ ও পাথরের নিচে। এই ধস্ প্রায় সাত মিনিট পশ্চিম থেকে পূর্বে ধেয়ে গেছে।

অলোক ভাবে, সৈনিকদের এক জীবনে এরকম কতবার সর্বস্বান্ত হতে হয়! উড়ে যাওয়া জয়ন্তকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ধীর পায়ে বিলেটের দিকে হাঁটে অলোক। পকেট থেকে অন্তরার চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করে। এর আগে হেলিপ্যাডে অন্য সবার চিঠি দিয়ে দিয়েছে ও। এতক্ষণে ফুরসৎ পেয়ে সবাই চিঠি পড়তে-পড়তে বিলেটে ফিরছে। আর্মির লোডাররা বাকি

মালপত্র ত্রিপল দিয়ে ঢেকে যার-যার চিঠি এসেছে— খুলে পড়ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বেস হেড-কোয়ার্টারের সামনেই ভরদ্বাজ এক আশ্চর্য খবর শোনায়, ধসে চাপা তাঁবুগুলি থেকে সৈনিকদের ড্রাই-র‍্যাশন, কাজু, কিসমিস ইত্যাদি বের করে আনছে কতগুলি ইঁদুর। অলোকের মনে পড়ে যায় জয়ন্তের প্রলাপ। এর সঙ্গে বর্তমান ঘটনার কোথায় একটা মিল যেন রয়েছে। হিরোশিমা-নাগাসাকি ভস্মের বরফে বেড়ে ওঠা ইঁদুরেরা প্রকৃত সৈনিক। এই চরম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ওরা বেপরোয়া লড়ে যাচ্ছে।

❑ সফেদ পানি

— দাদা রুকো, কালি বিল্লি!

হেমন্ত বলে, হ্যাট! রুকে হামারি দুশমন। হাম নাহি রুখ্‌তে! এই সব অন্ধবিশ্বাসকে পরোয়া করেনা ও। প্রিয় কবি নজরুলের কবিতা মনে পড়ে, মনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি ...। হেমন্ত ভাবে, আজো বেঁচে আছি আমরা ভারতবাসী টিকিদাড়ি নিয়ে! জুত করে সীটে বসে দু'বার দাড়ি চুলকে স্নো স্কুটারের গিয়ার পাল্টায় ও। তারপর ফ্যাট-ফ্যাট শব্দ করে হিমবাহের পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

প্যাটন ট্যাঙ্কের মতন দু'পাশে মোটা চেন লাগানো চাকার দাগ থেকে যায় পাকা বরফের উপর জমা তাজা বরফে। হেমন্তের দৃষ্টি শুধু একশো মিটার দূরে দূরে পোতা পথের নির্দেশ লাল পতাকাগুলির উপর নিবদ্ধ। কর্টিনা চশমার পারপ্লেক্সের মধ্যে দিয়ে লালরঙকে রোদে খয়েরি আর ছায়ায় কালো লাগে। প্রচণ্ড হাওয়ার তোড়ে পতাকাগুলি সশব্দে কাঁপে। স্নো স্কুটারের শব্দ অতিক্রম করে পত-পত শব্দ শোনা যায়। আর শো-শো বাতাস।

বাবলুটা কেমন যেন হয়ে গেছে। যে বাবলু বল্মীক ওর থেকে দশ - বারো কে.জি. বেশি ওজনের চন্দ্রভানকে কাঁধে নিয়ে কুড়িহাজার ফুট উঁচু হেলিপ্যাডে নেমে এসেছে, মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে আঠারোদিন লাগাতর আবহাওয়া ঠিক হওয়ার অপেক্ষা, হেলিকপ্টার আসার অপেক্ষা করেছে, নিজের হাতে কুড়ুল দিয়ে বন্ধুর পা কেটে হাঁটু অব্দি শরীর ও পা একসঙ্গে জড়ো করে কোলে নিয়ে হেলিকপ্টারে বসে বেসক্যাম্প পৌঁছেছে, সে-ই আজ পথে কালো বিড়াল দেখে ওকে দাঁড়াতে বলে!

এই হিমবাহের সাড়ে আঠারো হাজার ফিট উচ্চতায় বিড়াল এল কোত্থেকে? বেসক্যাম্পে ইঁদুর দেখেছে অনেক। পথে প্রথম ও দ্বিতীয় হল্টক্যাম্পেও ইঁদুর দেখেছে। বিড়াল শেষ দেখেছে প্রায় বারো হাজার ফিট উঁচু বেসক্যাম্পে। আজ হঠাৎ মাইনাস চল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি তাপমানে বিড়াল দেখা চোখের ভুল মনে হয়। ওটা গেলই বা কোথায়? বাবলু হয়তো দেখেছে। কিন্তু হেমন্ত এখন কথা বলে একাগ্রতা নষ্ট করতে চায় না। সামান্য চুক্ হলেই আর রক্ষে নেই। পিঠ টান-টান করে বসে স্কুটার চালাচ্ছে ও সামনে কাছাকাছি দু'টো পতাকা দেখে ব্রেক চাপে। বিশাল একটা ফুট চারেক চওড়া ফাটল থেকে নীল ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

হেমন্ত স্কুটার থেকে স্টিলের উপর ফাইবার কোটিং লাগানো ছ'ফুট লম্বা মজবুত মইটাকে বাঁধন খুলে অতল ফাটলের এপার-ওপার করে দেয় । বুকের ভেতরে ধুকপুক বেড়ে যায় । এর মধ্যে পড়ে গেলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্টিলের মতন শক্ত হয়ে যাবে । বাবলু অতি সন্তর্পণে সেই মইয়ের উপর বসে পাছা ছেচড়ে ওপারে যায় । ওপারে পৌঁছতেই হেমন্ত ওকে নাইলনের দড়িবাঁধা একটা আইস অ্যাক্স ছুঁড়ে দেয় । তারপর দড়িটার অন্যপ্রান্ত স্নো স্কুটারের পেছনের রডে বক্‌লস্ দিয়ে আটকে দেয় । বাবলু আইস অ্যাক্সের ধারালো অগ্রভাগ বরফে গেঁথে দড়ি ধরে টানতে থাকে । র‍্যাশানসহ স্নো স্কুটারটাকে ঠেলে হেমন্ত সিঁড়ির উপর উঠিয়ে বসে পাছা ঘস্‌টে ফাটল পার হয় । এখানেই ফাটলটা মাত্র ফুট চারেক চওড়া । তারপর তো আট-দশ ফুট চওড়া হয়ে গেছে । বাবলু স্নো স্কুটারের পেছনে বসে জোরে-জোরে শ্বাস নেয় । হেমন্তও জোরে-জোরে শ্বাস নিতে থাকে । বুকের ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা যেন বেরিয়ে আসবে । মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম নিয়ে সঙ্গে আনা থার্মোফ্লাস্ক থেকে গরমজল খায় এক ঢাক্‌না করে । গ্লেসিয়ার জ্যাকেটের পকেট থেকে একমুঠি বাদামগিরি বের করে কিছুটা বাবলুকে দিয়ে আর বাকিটা নিজে চিবিয়ে খায় । তারপর আবার সীটে বসে ফ্যাট-ফ্যাট চলতে শুরু করে ।

হেমন্ত প্রথম স্কুটার দেখেছে বিলোনিয়ার গ্রামে ও যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র । প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ডাক্তারবাবু স্কুটারে আসা-যাওয়া করতেন । মাঝে-মাঝে পেছনে বসে থাকতেন ডাক্তারবাবুর সুন্দরী স্ত্রী । ওর কী যে ভাল লাগতো । সীমান্ত গ্রামের ঐ দৃশ্য বারবার ওর স্বপ্নে এসেছে । তখন থেকেই ওর স্কুটারের শখ । আর্মিতে ঢোকার পর থেকে তিল-তিল করে টাকা জমিয়ে গতবছর এর সেই স্বপ্ন সাকার হয়েছে । কিন্তু তার আগেই সোনমার্গ ও পহেলগামে স্নো স্কুটারের কোর্স করে সপ্তম ভারতীয় দলের সঙ্গে অ্যান্টার্কটিকায় গিয়েছিল ।

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ! রাত্রিহীন ছয়মাস লাগাতর সূর্যের নিচে দিগন্ত বিস্তৃত শুধু বরফ আর বরফ । সেখানে পেঙ্গুইনরা ছিল । মাসখানেক থাকার পর ওদেব সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল যে ও যখন স্নো স্কুটার চালিয়ে পরফগলা জল আনতে যেত ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো । পরে কাছে এসে হাত থেকে কাজু আর বাদাম খেত । শেষের দিকে যখন বরফ গলতে-গলতে কাছাকাছি জলের উৎস এসে যায় হেমন্ত আর এতদূর যেত না । তখন ওরাও বাদাম, কাজু ও চিনেবাদাম খাওয়ার লোভে দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর অনেক কাছে চলে আসতো । হেমন্ত ওর ক্যামেরায় ওদের অনেক ছবি তুলেছে ।

সেজন্যেই সিয়াচেন আসার নির্দেশ পেয়ে খুব একটা খারাপ লাগেনি । ধারণাই ছিল না যে এখানে পেঙ্গুইনরা মরতেও আসবে না । অবশ্য কয়েক কোটি বছর আগে হয়তো ছিল । প্রাচীন প্রজাতির জলহস্তির হাড় পাওয়া গেছে এই হিমবাহেরই অন্যপ্রান্তে । এখানে যতদিন যাচ্ছে ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠছে । বাবলু সিয়াচেনকে বলে সফেদ পানি । হেমন্ত প্রথমে বুঝতে পারেনি । বাবলু বুঝিয়ে দেয়, উত্তর ভারতে আন্দামান নির্বাসনকে বলে কালাপানি । সেই নিরিখে এই সিয়াচেন ডিপ্লয়মেন্টকে এই অদ্ভুত নাম দিয়েছে ওরা । এখানে কাজু-কিসমিস খেলেও গ্যাস হয় । অ্যাসিড হয় । অ্যাসিডের ধাক্কায় বুকের পাঁজরে ব্যথা । অম্বল ঢেঁকুর ওঠে । বারবার মুখ ভরে ওঠে অম্লরসে । রাতে স্লিপিঙ ব্যাগ দুর্গন্ধে ভরে যায় । নিজের দুর্গন্ধে নিজেরই নাক ঢুকিয়ে রাখা

মুস্কিল। বাইরে বের করলে ঠাণ্ডার কামড় । বাধ্য হয়ে ক্রমে নিজের কেন অন্যের দুর্গন্ধও গা-সওয়া হয়ে গেছে । শিয়ালদহ থেকে বালিগঞ্জ যাওয়ার পথে ট্রেন যখন পার্কসার্কাস স্টেশনের পাশ দিয়ে যায় কেমন গা গুলোনো চামড়াপচা গন্ধে বমি উঠে আসে । হেমন্ত ভাবতো, এই অঞ্চলে এত ঘনবসতি লোকজন এত দুর্গন্ধে কেমন করে থাকে ? হিমবাহে এসে ও হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছে কেমন করে মানুষ বাধ্য হয় দূষণের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে । কিন্তু ভেতরে একটা থিক-থিকে ভাব থেকেই যায় । নিরুপায় নায়েক হেমন্ত সরকার ।

এখানে সবাই সাত-আটদিন পর-পর পায়খানায় যায় । পেচ্ছাব করতেই যতটুকু ঠাণ্ডা লাগে তা অবর্ণনীয় । এজন্যেই বেশিদিন এরকম পরিবেশে থাকলে লোকে নপুংশক হয়ে যায় । তবু এখানে বাঁচার জন্যে প্রচুর পরিমাণে গরম জল, বোর্ণভিটা কিম্বা হরলিকস্ মেশানো দুধ খেতে হয় কয়েকমুঠো কাজু, কয়েকদানা বাদামগিরি, কয়েকটা চিনেবাদাম দিয়ে । সারাদিনে এই খাবার । শুরুতে অনেকে ড্রপ করা ফ্রুটি গরমজলে গরম করে খায় । পরে অম্বলের সমস্যা শুরু হতে কেউ আর ছুঁয়েও দেখে না । এই সামান্য খাবারে পেটে মল তেমন তৈরি হয় না । আর সাত-আটদিন পর যেদিন পেট ভারী হয়ে আসে সেদিনও দুম করে চান্স নেয় না কেউ । গরম জল, গরম দুধ খেয়ে প্রচণ্ড বেগ তৈরি করে তাঁবুর পেছনে ছুটে যায় ।

শুরুতে ওরা কয়েকবার গুহার কাছেই পাকা বরফের দেওয়ালের আড়ালে কাঁচা বরফ সরিয়ে খালি তেলের ব্যারেল বসিয়ে দু'পাশে দু'টি প্যাকিং বাক্সের ঢাকনা দাঁড় করিয়ে ল্যাট্রিন তৈরির চেষ্টা করে । কিন্তু পরমুহূর্তেই বা কয়েকঘন্টার মধ্যেই তীব্র হাওয়া সেইসব কোথায় উড়ে যায় । এত তুষারপাত হয় যে দুই-একদিন পর ব্যারেলটাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না । আবার ঐ ঠাণ্ডায় ল্যাট্রিন তৈরির কথা ভাবলে রক্ত হিম হয়ে যায় ।

অগত্যা সপ্তাহান্তে কিম্বা দশ-বারোদিন পর কারো যখন বেগ চাপে কোনক্রমে গুহার বাইরে বেরিয়ে রেডিও অ্যানটেনার তারের খুঁটি ধরে দ্রুত চেন খলে কোনক্রমে পিচকারি মেরে মল বের করে দিয়ে সঙ্গে আনা গরম জল ভরা রামের বোতল থেকে জল নিয়ে শৌচ করেই আবার গ্লেসিয়ার প্যান্ট গলিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত ফিরে আসা । বাইরে মাইনাস পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিম্বা আরো কম তাপমানের তুলনায় বরফের গুহার ভিতরটা অনেক গরম । ভিতরের তাপমান কখনোই মাইনাস আট-দশ ডিগ্রির নিচে যায় না । তবু কম করে একঘন্টা স্টোভ জ্বালিয়ে হাত সেঁকতে হয় ।

এক কষ্টে মায়ের মুখ, দাদার চেহারা, শেফালির কথা খুব মনে পড়ে । শেফালি ওকে পেঙ্গুইন বলে ডাকে । প্রিয় পেঙ্গুইন বা তুষারমানব সম্বোধন করে চিঠি লেখে । গতবছর ও যেদিন আগরতলা থেকে স্কুটার কিনে দাদাকে পিছনে বসিয়ে বিলোনিয়া নিয়ে যায়— মা কুলোয় সিঁদুর লাগানো ডিম, আছোলা নারকেল, ধান, দূর্বা আর প্রদীপ নিয়ে আরতি করে । আমার পুলায় বংশের মুখ উজ্জ্বল কইছে । মায়ের হাত থেকে কুলো নিয়ে একটা ডাগর মেয়েকে আরতি করতে দেখে ওর কেমন যেন চেনা লাগে । দাদাকে ধীরে জিজ্ঞেস করে, ইগা কোন্-রে ?

দাদা বলে, হেই বাড়ির রবি বৈরাগীর মাইয়া শেফালি । হেমন্ত হেসে ফেলে । ও যখন ফৌজে

ঢোকে তখন শেফালি প্রাইমারী স্কুলে ! মেয়েরা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় । শেফালি তখন ঠোঁট উঁচু করে উলু-লু-লু করে জোকার দিচ্ছে । ওকে হাসতে দেখে মেয়েটির চোখ চক-চক করে ওঠে । হেমন্তের ভিতরে কেমন শিহরণ বয়ে যায় ।

তখন্ বাবলু চিৎকার করে ওঠে, দাদা রুকো, বাঁয়ে দেখো, উপ-র ! গগণবিদারী শব্দের মিছিল আর প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপটায় ও শিউরে ওঠে । হতভম্ব হয়ে যায় ।

বাবলু এতক্ষণ ওর পেছনে পা ফাঁক করে সীটটাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে । ওর কোমর যদিও সিন্থেটিক ফাইবারের বেল্ট দিয়ে ঐ সীটের সঙ্গে বাঁধা তবুও ও শক্ত করে আকড়ে ধরে থাকে । নায়েক হেমন্ত ভীষণ গোঁয়ার, ডাকাবুকো বলে কোম্পানীতে নাম রয়েছে । একই কারণে বাবলু ওকে পছন্দ করে । নাহলে আজ ওর সঙ্গে বেরোতে না । কালই তৃতীয় হল্টক্যাম্প থেকে এই সাপ্লাই বেসে এসে পৌঁছেছে ও । আগামী তিনদিন বিশ্রাম নেওয়ার কথা । কিন্তু বানা টপের জন্যে একটা জরুরী চিঠি রয়েছে বলে হেমন্তকে টাইগার এক্ষুণি যাওয়ার জন্যে ডিটেইল করেছে । সোনম পৌঁছুতে লাগবে মাত্র ঘন্টাচারেক । সেখান থেকে সোনমের টাইগার ল্যাণ্ডলাইনে নির্দেশ পাঠাবে বানা টপে ।

এই দূরত্ব লিংকে গেলে ভোর থেকে সন্ধ্যা অব্দি হেঁটে প্রায় বারো ঘন্টায় পার হতে হতো । এখানে দূরত্ব মাপা হয় ঘন্টা ও দিনের হিসেবে । কোথাও গোড়ালি ছাপানো কোথাও হাঁটু সমান বরফের মধ্যে দিয়ে প্রতি তিন কদম লিংকে চলে ওরা দাঁড়িয়ে এক মিনিট শ্বাস নেয়, তারপর আবার তিন-চার কদম যায় । এমনি হাঁটার গতিতে একদিনে ফৌজিরা কতদূর পৌছবে সেই হিসেবে দূরত্ব মাপা হয় ।

এই কচ্ছপগতির তুলনায় স্নো স্কুটার যেন পংখীরাজ ঘোড়া । টগ-বগ ফ্যাট-ফ্যাট-ফ্যাট । কিন্তু আজ কেন জানি বুকটা দুড়-দুড় করছে বাবলু'র । ওদের গ্রামদেশে যাত্রার সময় কালো বিড়াল সামনে দিয়ে গেলে এগিয়ে যেতে নেই । যদি যেতেই হয় তাহলে একটু থেমে অথবা পিছিয়ে এসে আব্যর এগোতে হয় । কিন্তু হেমন্তদাদাকে এইসব কে বোঝাবে ! কিছু বললেই বাঙ্গালি কবিতা শোনায় । পাগল কাহিকা ! ও শংকায় আঁকড়ে ধরে রাখে স্নো স্কুটারের সীট । জিগরি দোস্ত চন্দ্রভানের ফুসফুসে ফ্লুয়িড জমে মৃত্যুর পর থেকে ওর শরীর মন দুইদিক থেকেই ভীষণ দুর্বল লাগে । কোন কিছুই ভাল লাগে না । গত এগারোদিন জীবন্ত লাশের মতন লিংকে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে হেঁচড়ে এনেছে পেটের দায়ে আর এক অজানা আশংকায় । নিজের উপর ঘেন্না হয় । আরো একমাস এখানে থাকতে হবে । আবহাওয়া বিরূপ হলে এই সময় প্রলম্বিত হয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ দিনও লেগে যেতে পারে । এরকম ভাবতে-ভাবতে দূরের কালো বরফের পাহাড় থেকে চোখ সরিয়ে বাঁ-পাশের সালতোরো রেঞ্জের দিকে তাকাতেই দেখে একটা বিশাল আগুনের গোলা ওপাশ থেকে এসে নিকটবর্তী শৃঙ্গের এপাশে গিরিশিরাটিকে ভেঙ্গে ফেলেছে আর দেখতে না দেখতে বিশাল বিশাল পাথর চাঁইয়ের মতন ধস্ নেমে আসছে । ও আতংকে চিৎকার করে ডাকে— দাদা রুকো, বাঁয়ে দেখো, উপ-র !

দ্রুত কোমর থেকে বেল্ট খুলে নেয় । তারপর এতদ্রুত সামনে ও পিছনে বরফের চাঁইগুলি

নেমে আসে যে, ওরা থম্ মেরে যায় । যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষা । মিনিট পাঁচেক গুঁড়ো পাউডার অ্যাভলাঞ্চে হিমসমাধি হতে থাকে । এত কাছে দাঁড়িয়ে ওরা কেউ কাউকে দেখতে পায় না । মায়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করে বাবলু । কিন্তু এমন সময়ে মায়ের চেহারাটাও মনে পড়ে না । কান্না পেয়ে যায় । স্মৃতিশক্তিও লোপ পেয়ে যাচ্ছে নাকি ! ও ডাবল লেয়ার কোফ্ল্যাখ জুতোর ভিতর আঙুল গুলি নাড়ে । দুইহাত একসঙ্গে করে এক হাতের গ্লাভসের তালুতে অন্যহাতে দিয়ে ঘুষি মারে । পাউডার অ্যাভলাঞ্চের গাড় কুয়াশা কেটে গেলে অবাক হয়ে দেখে ওরা বেঁচে আছে । হেমন্ত ছোট-ছোট লাফে স্পট জাম্প করছে । ওরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে । কিন্তু কতক্ষণ বেঁচে থাকবে সন্দেহ রয়েছে । সামনে পিছনে বড়-বড় বরফের চাঁইয়ের স্তুপ জমা হয়েছে । বাঁপাশে উত্তুঙ্গ সালতোরো পর্বতশ্রেণী আর ডান পাশে গভীর খাদ ।

হেমন্ত একমুহূর্তও দেরি না করে ওর রেডিও টেলিফোন সেট অন করে ডাকতে শুরু করে, ওয়ান-টু-ওয়ান-টু-টাইগার-টাইগার-টাইগার দিস ইজ সিয়েরা-সিয়েরা জিরো ওয়ান, সিয়েরা-সিয়েরা জিরো ওয়ান .... ! প্রায় পঞ্চাশবার ডাকার পরও কোন জবাব আসে না । কে জানে মেজরসাহেব সেটের কাছে রয়েছে কিনা ! অথবা ওর মনিটরে হেমন্তের ট্র্যান্সমিশন পৌঁছুচ্ছে কিনা ! বাবলু ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে প্যারাশুটের কাপড়ের টুকরো বের করে বারবার মাউথপিসটাকে মুছে দেয় । কিন্তু পরমুহূর্তেই কথার সঙ্গে বেরিয়ে আসা জলীয়বাষ্প মাউথপিসে বরফের আস্তরণ গড়ে দেয় । প্রায় আধঘন্টা চেষ্টার পর ওরা হতাশ হয়ে পড়ে । শ্বাস ফুলে উঠছে । হেমন্ত হাঁপাতে থাকে হাঁপানী রুগির মতন । বাবলু ওর বুক মালিশ করে দেয় । দ্রুত থার্মোফ্লাস্ক থেকে গরম জল ঢাকনায় নিয়ে ওকে খাইয়ে দেয় । আর আধঢাকনার মতন জল বাকি । এইটুকু হরকত করে ওরও শ্বাস ফুলে উঠছে এখন । অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই বাকি জলটা খেয়ে নেয় বাবলু ।

তারপর রেডিও সেট -এর ব্যাটারি খুলে স্ট্যাণ্ডবাই ব্যাটারি লাগিয়ে মাউথপিসটা আবার হেমন্তের মুখের সামনে নিয়ে আসে । হেমন্তের নাক ফেটে চৌচির । বোরোলিনের আস্তরণ ভেদ করে মাংস দেখা যাচ্ছে । কিন্তু ওর এই ব্যাপারে কোন হুঁশ নেই । রক্ত জমাট বেঁধে আছে । অ্যাভলাঞ্চে কেটেছে অথবা অমনি ঠাণ্ডায় ফেটে গেছে । হেমন্ত মরিয়া হয়ে মাউথপিসের পি.টি.টি. চেপে আবার ডাকতে শুরু করে, ওয়ান-টু-ওয়ান-টু ..... ।

বাবলু ভাবে, এখন কী হবে ? ক্রমে ওরা দুজনই নিরাশ হয়ে পড়ছে । রেডিও সেটটাই কি খারাপ হয়ে গল ? দু'টো ব্যাটারিই গতকাল চার্জ করা হয়েছে সোলার চার্জার দিয়ে । সারাদিন রোদ ছিল কাল । রোদ থাকলে এখানে দু'টো লাভ হয় । এক ❑ হেলিকপ্টার র‍্যাশান আর চিঠি নিয়ে আসে । খাদ্য থেকেও অনেক বেশি ক্যালোরি দেয় এই চিঠি । দুই ❑ ব্যাটারি চার্জ করা যায় । হেমন্ত ভাবে, টাইগার মেজরসাহেব এতক্ষণ প্রাইম মনিটর থেকে দূরে থাকবেন— এটা অবাস্তব । এমনি সংকষ্ট সময়ে হঠাৎ — মিউ ।

হেমন্ত চমকে ওঠে । চমকে ওঠে বাবলু-ও । ওরা ভুল শুনছে না তো ? কিন্তু দু'জনেই একসঙ্গে শুনেছে যে ! আবার বিড়ালের ডাক — মিউ ! ওরা হাঁ হয়ে যায় । বিশ্বাস হচ্ছে না । কান খাড়া করে রাখে বাবলু । হেমন্ত পা টিপে টিপে ঐ সামান্য পরিসরে এদিকে-ওদিকে চলতে

শুরু করে । বাবলু ওখানেই দাঁড়িয়ে । দুইজন একসঙ্গে চলার মতন জায়গা নেই । বাবলু কোফ্ল্যাখের ভেতর আঙুল নাড়ায় । নিজের পাছায় ও কোমরে ঘুষি মারে । তখুন হেমন্ত চেঁচিয়ে ওঠে— পা-ইছি, পাই-ছি !

— মতলব ?

—ইয়ে দ্যাখ তেরা বিল্লি ! হেমন্ত ওটার ঘাড়ে ধরে শূন্যে তুলে ধরে । এত ক্ষণ র‍্যাশানের প্যাকেটে ঢুকে বসেছিল । ওরা বিন্দুমাত্র টের পায়নি । হেমন্তের গ্লাভসের ফাঁকে ওটা আবার মি-উ করে ওঠে । বাবলু চেঁচিয়ে বলে, সরকারজী, ইসকে গলেমে দেখো !

হেমন্ত তাকিয়ে দেখে ওর বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে লকেটের মতন ঝুলছে কালো রঙের দেশলাই বাক্সের মতন দেখতে একটা কিছু । ও বাঁহাতে সেটাকে বের করে দেখে কিলোহার্ৎজ মেগাহার্ৎজ অঙ্কিত একটা ট্র্যান্সমিটার । এরকম ও সিনেমায় দেখেছে । নিশ্চয়ই এটা শত্রু শিক্ষিত বিড়াল । হেমন্ত দ্রুত এর স্যুইচ অফ করে দেয় । বাবলুকে বলে এত ক্ষণ আমরা যা যা বলেছি সব শত্রুরা শুনেছে । বিড়ালটাকে স্নো স্কুটারের সীটে রেখে দিলে ওটা ওখানেই কুঁকড়ে পায়ের ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে থাকে । হঠাৎ হেমন্তের মাথা কাজ করে । ও মিনি সেটটার টিউনিং ঘুরিয়ে নিজেদের ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করে । তারপর ট্র্যান্সমিট স্যুইট টিপে টাইগারকে ডাকতে শুরু করে । আর কী আশ্চার্য প্রথম ডাকেই নিজেদের রিসিভারে সাড়া পায়, সিয়েরা-সিয়েরা জিরো ওয়ান, দিস ইজ টাইগার, গো এহেড, কঁহা সে বোল রহে হো !

হেমন্ত সংক্ষেপে মেজরসাহেবকে ওদের বিপদের কথা জানায় । টাইগার বলেন, আমরা রিকভারি স্কুটার নিয়ে এক্ষুণি রওয়ানা হচ্ছি ; ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই তোমাদের কাছে পৌঁছে যাব, ততক্ষণ তোমরা সচল থাকো, বী অ্যাকটিভ ! ওভার অ্যাণ্ড আউট ! বাবলুর চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে । গোয়েন্দা বিড়ালটি তখনও কুঁকড়ে জুলজুলু করে তাকিয়ে আছে । ওর চোখ দু'টি টক-টকে লাল । বাবলু বলে, বিল্লিটাকে গুহায় নিয়ে গিয়ে কেটে খাবো ।

হেমন্ত ভাবে, বাবলু সেটা করতে পারে, বিহারের ব্রাত্যশ্রেণীর মানুষ, জমিদারদের ভাড়া করা রণবীর সেনার আক্রমণে আজ ওর তিনকূলে কেউ নেই ! ওর ভিতরে সবসময় ধিকি-ধিকি তুষের আগুন জ্বলছে । হেমন্ত'র খুব কষ্ট হয় । ওর জিহ্বা দিয়ে চু-চু শব্দ করে বিড়ালটার মাথায় গ্লাভস দিয়ে হাত বোলায় । ও হাতে কম্পন টের পায় । বিড়ালটা থর-থর করে কাঁপছে । এখন এখানে তিনদিকে দেওয়াল হয়ে যাওয়ায় একদমই হাওয়া নেই । ঠাণ্ডার তীব্রতা থেকে সামান্য রেহাই । তবুও নিঃসাড় হয়ে পড়ছে সব । ও বাবলুকে কেরোসিন স্টোভ জ্বালাতে বলে । যতটা তেল রয়েছে তাতে অনায়াসে ঘন্টাতিনেক জ্বালানো যাবে । এখানে হাওয়া নেই বলে সহজেই সা-সা শব্দে পাম্প স্টোভটা জ্বলতে শুরু করে । তার উপর মেসটিন বসিয়ে দুই অঞ্জলি তাজা বরফ চাপিয়ে দেয় ওতে । গরম জল দরকার ।

বাবলু হাত সেঁকে । ওর দৃষ্টি কিন্তু বিড়ালটার উপর নিবদ্ধ ! ওটাকে ও একদমই সহ্য করতে পারছে না । ঐটাও একদৃষ্টে এখন বাবলুকেই দেখছে । হঠাৎ বাবলু'র মনে হয় ওটা আকারে বাড়ছে । তা কেমন করে সম্ভব । কিন্তু ওটা বাড়ছেই । থাবাগুলো মোটা হয়ে এখন বাঘের বাচ্চার

মতন হয়ে গেছে। চোখ দু'টি যেন জ্বলছে। এক আগ্রাসী দৃষ্টি। মাথা ও শরীর মোটা হয়ে ভাল্লুকের মতন হয়ে উঠছে ওটা। বাবলু কি ভুল দেখছে ? বিড়ালটা কি শয়তানের আত্মা ? শালি শয়তান কি অওলাদ ! হঠাৎই বুকরিটাকে খাপ থেকে খুলে ওটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হেমন্ত রে-রে করে ওঠে। বিড়ালটা একলাফে এপাশে চলে আসে। বাবলু হুমড়ি খেয়ে বরফে উপুর হয়ে পড়ে।

— তু পাগল হো গয়া ক্যায়া ? হেমন্ত বাবলুকে তুলে ধরে। ওর শরীর কাঁপছে মৃগী রুগির মতন। দাঁতে-দাঁতে জোড়া লেগে গেছে। কষ দিয়ে সাদা-সাদা গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। বিড়ালটাও অন্যপাশে পা ছড়িয়ে পড়েছে।

হেমন্ত বাবলুকে স্বাভাবিক করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। টাইগার দলবল নিয়ে যতক্ষণ না পৌঁছোয় ওকে টিকিয়ে রাখতে পারবে তো ! নিজেরও হাত পা থর-থর করে কাঁপছে। সামান্য নড়াচড়ায় উরু ও হাঁটুর নিচের পেশিগুলিতে টান ধরছে। রিকভারি টিম ওদের খুঁজে পাবে তো ? শংকায় বুক কাঁপে। হাত-পা কাঠ হয়ে পড়ছে ক্রমে। হেমন্ত মায়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করে। সজল দু'টি চোখ। আরো দু'টি ভেজা চোখ শেফালির। হেমন্ত বাবলু'র মুখ প্যাড়াশুটের কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুছে ওর মুখে লাগিয়ে ফু দেয়। বাবলুর পিঠের পেছনে হাত দিয়ে বুক মালিশ করে দিতে থাকে। জয় ভারতমাতা, ভারতমাতা কি জয়, জোরে-জোরে বলে হাত চালায়। বিড়ালটা মরে টানটান হয়ে আছে। জিহ্বাটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

কে জানে এই জালিম বিড়াল কিম্বা বীর চন্দ্রভানের মতন বাবলুর বুকের সব শ্বাস এই সফেদ পানি শুষে নেবে কিনা। নিজেই বা ফিরবে কিনা কে জানে !

— উ লোগোকো ইধার বুলাউ ! হঠাৎ বাবলু'র মুখে দেহাতি হিন্দি শুনে চমকে ওঠে হেমন্ত। প্রায় নিভে আসা স্টোভের বার্ণারটা হঠাৎ আবার শো-শো শব্দ করে ওঠে। বাবলু'র চোখ এখনো বন্ধ। হেমন্ত জিজ্ঞেস করে, কিসকো বলাও বাবলু ? কঁহা ?

— নেতা লোগোকো, সাহাব লোগোকো বুলাউ — "মিনিট" -সফেদ - পানী মে .. বলে বিশাল হা করে একবুক বাতাস নেয় ও আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে আরো গ্যাঁজলা বেরিয়ে আসে। তারপরই নিথর হয়ে যায় ও। হেমন্তের কোন ডাকেই আর সাড়া দেয় না। কাঠ হয়ে আসা সহযোদ্ধার মাথা কোলে নিয়ে হেমন্ত প্রতীক্ষায় থাকে। ওর শেষ ইচ্ছার কথা ভেবে, দিল্লি কিম্বা ইসলামাবাদের বাতানুকুল কামরায় বসে যারা হিমবাহ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে সেইসব মহান নেতা ও অভিমানী বড়সাহেবদের সিয়াচিনে এনে মিটিঙ করানোর ইচ্ছা হেমন্ত কাকে জানাবে ? জানিয়ে কী লাভ ?

❑ নুব্রা ও ভগীরথ

এখন মোটামুটি ব্যস্ত কাটছে বেসক্যাম্পের দিনগুলি। ব্যস্ততা ওর ভাল লাগে। আবহাওয়া ভাল থাকায় গত পাঁচদিন নিয়মিত হেলিকপ্টার আসছে। মে মাসের রোদে বরফ গলছে। ধস্ নামছে। দুপুরবেলা তাপমান প্লাস ছয়-সাত হয়ে যায়। ভোরে মাইনাস আট-নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত সপ্তাহের প্রবল তুষারপাতই এত ধসের কারণ। আরো অনেক তাঁবু চাপা পড়েছে। সেগুলি আর উদ্ধার করা যাবে না। এখান থেকে একটা কোম্পানি এখন নদীর কাছাকাছি। ঠাণ্ডা হাওয়ার শিকার। এখন নদীতে বরফগলা তিরতির প্রবাহ। দুপুরে প্রবল স্রোত! সশব্দ! অন্য সময় বরফের নিচ দিয়ে কুলকুল শব্দ।

আলোকের মনে পড়ে আরেকটা নদী। মরুভূমির লুনীও এমনই মরসুমি। ও লুনীকে ভালবাসে। অন্তরা জানে। লাদাখের সঙ্গে জয়শলমীরের মেয়েদের স্নান না করার মিল দেখে অনুভব করে এই নুব্রা ও লুনীর মিল। যে কোন প্রবল পরিবেশের একটা মরসুমি মেজাজ, চরিত্রগত মিল রয়েছে। উদাহরণ মরীচিকা! মরু এবং মেরু দুই প্রদেশেই সত্য।

আজ রেডিও টেলিফোনি সেটে জয়ন্ত'র ডায়াগ্নসিস জানা গেছে। অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেস্। এখনো অসুস্থ। আগামীকাল প্লেন এলে ওকে চণ্ডিগড় পাঠানো হবে।

মনে পড়ে অন্তরার কথা। অলোক ভেবেছিল বিবাহ-বার্ষিকীতে বাড়ি পৌঁছে চমকে দেবে। কিন্তু এখন আর সে সম্ভাবনা নেই। সবাবাইকে ভুলে থাকলেই ভাল থাকা যায়। কিন্তু ও ভুলে থাকতে পারে না। ভুললে ও নিজেকেই খুঁজে পায় না। মনে হয় এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে বসে থাকা বিশাল সব পাথরের চাইয়ের মতন নিজেও জড় হয়ে পড়বে। ভাবতেই শরীর কেমন শিউরে ওঠে।

চিনেকাকের হলুদ ঠোঁট। গায়ের রঙ কালো না হলে মনে হতো অন্য পাখি। সাদা তুষারাবৃত পরিবেশে ওরা দারুণ সুন্দর! প্রথম-দিন তো ও ভুল করে পেঙ্গুইনের বাচ্চা ভেবেছে। জয়ন্ত বলে, না, এরা চিনেকাক! অন্তরার দাদা পক্ষী-বিশারদ। ও লিখেছে, চিন দেশে নাকি এরকম কোন কাক নেই। তাহলে জয়ন্ত এই নাম কোত্থেকে পেয়েছে! বাকি সব সৈনিকরা কাওয়া বলে। ওরা রুটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে টুকরোগুলি ছুঁড়ে দেয়। পাখিরা উড়ে-উড়ে কপাকপ খায়। কতো ক্ষুধার্ত এই পাখিগুলি! চোখগুলি বাচ্চা মেয়েদের মতন সদাচঞ্চল। যেন এক ঝাঁক কালো পায়রা!

মৌন পর্বতশৃঙ্গগুলি এখন সরব — ঝর্ণার শব্দে, প্রতিধ্বনিতে। সকাল দশটা নাগাদ বরফ গলতে শুরু করে। দুপুর দু'টো থেকেই এই শব্দ শোনা যায়। চারটে নাগাদ শব্দ বাড়ে। বিকেল ছ'টার পর আবার শব্দ কমতে থাকে। পশ্চিম কারাকোরামের পাদদেশে যেখানে ওরা প্রাতঃকৃত্য সারে এখন গোড়ালি ছাপানো ঠাণ্ডা জল। সকাল বেলা এর উপর দুধের সরের মতন বরফ জমে থাকে। দুপুরে ওদিক থেকে দুর্গন্ধ আসতে শুরু করে ওরা বিলেটের জানালা বন্ধ করে রাখে।

তাপমান আর আগের মতন এত নিচে নামে না। শুধু ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রকোপ মারাত্মক। আর মাঝে-মধ্যেই পিলে চমকানো গোলার শব্দ। ভয়ানক যুদ্ধ চলছে ফ্রন্টে। যদিও শত্রুর গোলার চাইতে ধসে মারা যাচ্ছে বেশি সৈনিক। সার্জেন্ট জৈন বলে, এই ধসে চাপা পড়া সৈনিকদের আত্মাই হলুদ-ঠোঁট, কমলা-ঠোঁট পাখি হয়ে যায়। কাকের মতন ওড়ে, ওরা কাক নয়!

জয়ন্তের রিলিভার এই সুভাষ জৈন পুণর্জন্মে বিশ্বাসী। এমনিতে বেশ হাসিখুশি। মনেই হয় না যুদ্ধ করতে এসেছে। এছাড়া উপায় কী! অলোককে বোঝায়, এখানে আমরা সবাই সমষ্টির অংশ, এই কাকেরাও, আমাদের উপর দেশের মানুষ একটা যুদ্ধ-জয়ের দায়িত্ব দিয়েছে, আমরা বেঁচে থাকি অথবা মরে পাখি হয়ে যাই — এ যুদ্ধ জিততেই হবে!

অলোক জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে না। জন্মান্তর আবার কি? মনে হয় সব মানুষের ভ্রম। কিন্তু এখানে জৈন সাহেবের এসব কল্প-গল্প ভালোই লাগে।

এগারোই মে ঘুম থেকে উঠে অলোক দেখে আবার ঘন তুষারপাত। সারারাতে প্রায় আট ইঞ্চি বরফ জমেছে। এখনো ঘন তুষার-বর্ষণ। ব্রেকফাস্টের পরই ও সিয়াচেন ব্যাটল স্কুলে পৌঁছে যায়। ওরা তখন বেরোচ্ছে। অনেকদিন পর ওকে পেয়ে তরসিম আর উপেন্দ্রপ্রসাদ বুকে জড়িয়ে ধরে।

সারা সকাল কাটে স্কি করে। গ্রাউন্ড স্নো কম বলে এখন আর স্কেটিং করা যায় না। এখানে কোন আর্টিফিশিয়াল স্কেটিং গ্রাউন্ডও নেই। ওরা তিনজন এক সঙ্গে পাহাড়ের ঢালগুলিতে স্কি করে। এ এক দারুণ নেশা। তখন আর অন্যদিকে মন যায় না। সব সময় বরফে দৃষ্টি নিবদ্ধ। সব ভুলে থাকা যায়। এজন্যেই স্কি ওর বেশি প্রিয়।

একটা পাহাড়ের ঢাল থেকে নিচে নেমে সেই বেগেই আর একটা টিবি পেরোতেই ওরা আচমকা দেখতে পায় দুই শৃঙ্গের ফাঁকে একটা স্নো লেপার্ড তিনটে বাচ্চা সহ। এক মুহূর্তের দেখা। ওদের গতি তখন প্রচণ্ড। স্নো লেপার্ড ও বাচ্চারা এই দ্রুতগতি আগন্তুকদের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এক মুহূর্ত হতভম্ব দাঁড়িয়ে তখুনি ওরা অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় দ্রুত খাড়া চড়ে যায়। এই আরোহণ দেখার মতন। সামনের বাঁক পেরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়েও আর দেখা যায় না। ওরা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে। কেউ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সেদিন বিলেটে ফিরে দ্বিগুণ খাবার খায় গল্পে-গল্পে। সবাইকে লেপার্ডের গল্প শোনায়। সবাই চোখ বড়-বড় করে শোনে। বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে আবার উপেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে দেখা। তখন জৈনসাহেব, চিত্ত আর অলোক পা টিপে-টিপে এগুচ্ছে। রাস্তাটা পিচ্ছিল। ওদের সামনেই দু'তিন-জন আছাড় খেয়েছে। উপেন্দ্রপ্রসাদ ওয়ান টনার গাড়ি থামিয়ে নেমে ওর হাত ধরে। গাড়ির চাকায় এখনও চেন বাঁধা। উপেন্দ্রপ্রসাদ হাত তুলে ইশারা করলে ঘট-ঘটাঙ ঘুঙুর বাজাতে-বাজাতে গাড়িটা সিয়াচেন ব্যাটল স্কুলের দিকে এগিয়ে যায়। কী বিশাল বুক উপেন্দ্র'র। চিত্ত নাম দিয়েছে—মিস্টার ইউনিভার্স।

চিত্ত'র অনুরোধে উপেন্দ্র আমাদের গ্লেসিয়ার শিবের গুহায় নিয়ে যেতে রাজি হয়। উপত্যকা থেকে প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচু। পুরো চড়াই তুষারাবৃত এবং অনেকটা খাড়া। পিচ্ছিল বলে

'আউট অফ বাউন্ড এক্সেপ্ট মাউন্টেনিয়রস্', নোটিশ বোর্ড লাগানো। উপেন্দ্র দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে। কী বলিষ্ঠ! আবহাওয়া খারাপ থাকা দিনগুলি রোজ এরকম কাটলে মন্দ না! অলোক ভাবে, চরৈবেতি! গতির মধ্যে থাকলে দেহ-মনে মরচে পড়ে না সহজে। তবে আজ পরিশ্রম একটু বেশিই করে ফেলেছে ও। এখন পাহাড় চড়তে বেশ কষ্ট হচ্ছে। প্রথম এক হাজার ফুট ওরা বারো মিনিটেই অতিক্রম করে। পরের চড়াই আরো দুর্গম। মাঝে মধ্যেই থেমে দাঁড়িয়ে ৩০ সেকেণ্ড- ১ মিনিট দম নিতে হয়। বুকের হাঁপর দ্রুত লয়ে। গুহা অব্দি পৌঁছুতে মোট ৩০ মিনিট লাগে। উপেন্দ্রপ্রসাদ ছাড়া ওরা তিনজনই হা-হা করে শ্বাস নেয়।

এখানে সৈনিক ছাড়া কেউ আসে না। গুহার ভেতর লাল-হলুদ কাপড়ে কালো বা নীলরঙে নামাঙ্কিত হাজারখানেক পতাকা। তিন কোণা-চার কোণা। এক পাশে সোনালি, সম্ভবত পিতলের সিংহাসনে শিবের মূর্তি। প্রকৃতি-নির্মিত লিঙ্গ এত বিশাল যে ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে নাকি গুহার ছাদে ঠেকে যায় এর শীর্ষ। আগামী দু'মাসে অনেক ছোট হয়ে যাবে। তখন সৈনিকরা আসবে ধূপকাঠি মোমবাতি নিয়ে। উপেন্দ্র প্রসাদ দু'হাত দিয়ে ঘন্টা বাজায় টঙ-টঙ। সেই শ্বেত পাথরের খাঁজে-খাঁজে ঝটপট করে কেয়েক জোড়া পাখা। ঘন্টার শব্দ গুহার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়। পাখিরা উড়ে-উড়ে এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে গিয়ে বসে। কেউ-কেউ আবার আগের দেওয়ালে ফিরে আসে, কারো হতচকিত ডানার ধাক্কায় কোন ঘন্টার দড়িতে লেগে অন্য ঘন্টায় ধাক্কা লাগে। ঠোকাঠুকিতে শব্দ বেড়ে যায়।

বড়-বড় পিতলের ঘন্টা। সব সৈনিকদের আনা। গুরু নানক, বুদ্ধ, যীশু ও কাবার ছবি পাশাপাশি টাঙানো। চিত্ত ও জৈনসাহেব এই সহাবস্থানের প্রশংসা করে। অলোক শুধু পাখি দেখে। অপ্রতুল আলোতে ওদের গায়ের রঙ বোঝা যায় না। তবে আকার দেখে মনে হয় সেই হলুদ-কমলা ঠোঁট পাখিগুলিই উড়ছে।

চড়ার সময় যেমন ঝুঁকে ভারসাম্য রাখতে হয় নামার সময় তেমনি পেছনে ঝুঁকে গোড়লির উপর শরীরের ওজন চাপিয়ে সতর্কভাবে নামতে হয়। পিছলে গেলে আর বাঁচার আশা নেই। তবু নেমে আসা অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর কোলের দিকে টানে।

উপত্যকা থেকে গুহাটা কত ছোট লাগে। এর থেকে আরো বড় কিম্বা ছোট ছোট অনেক গুহা নিশ্চয়ই আছে। এতদিনে জানা গেল পাখিরা কোথায় থাকে! উচ্ছিষ্ট টিনফুড আর চামড়ার মতন শক্ত রুটির টুকরা খেয়ে ওরা বাঁচে।

টিনফুডই ভাল লাগছে। এত বেশি ক্ষিদে পেয়েছে যে সবাই থালা চেটেপুটে খেয়েছে অনেক দিন পর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে ঘুমের জন্যে হা-পিত্যেশ করতে হয় না। শরীর অবশ করে ক্লান্তি তালিয়ে নিয়ে যায়।

অনেকদিন পর গভীর ঘুমে রাত পার হয়ে যায়। শেষ রাতে সাদা বাঘগুলি স্বপ্নে এলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ইস্? ওরা এত ক্ষিপ্র, ভাল করে দেখাই হলো না।

—আচ্ছা, এই ধু-ধু বরফে বাঘেরা কী খেয়ে বেঁচে থাকে? ঐ বাচ্চা তিনটি কী খেয়ে বড় হবে? ওর প্রশ্নে নাম্বুদ্রিপাদ বলে, দাঁড়াও, ছিলিঙ পানচুক জানবাককে জিজ্ঞেস করবো, ছেলেটা

অনেক জ্ঞানে —

— কেমন আছে পানচুক এখন ? বেশ কয়েকদিন হলো ওকে দেখতে যাইনি । আগে নিয়মিত যেতাম । ডাক্তারসাহেব ওর কথা বলায় হঠাৎ এক অহেতুক অপরাধবোধ জাগে অলোকের মনে ।

— ডিস্‌চার্জ দিয়ে দিয়েছে ওকে, কাল সকালেই চলে যাবে । মাস দু'য়েক বিশ্রাম নিয়ে তারপর ফিরবে আবার ।

ক'দিন হলো প্রতি দুপুরেই ক্যাপ্টেন নাম্বুদ্রিপাদ ওদের বিলেটে আসে । জয়ন্ত চলে যাওয়ার পরও । ক্যাপ্টেন সাহেব এখন খুব কাছের মানুষ । ভদ্রলোক তাস খেলে না । নিয়মিত মদ খায় না । রুগিদের সঙ্গে আর কতক্ষণ কাটানো যায় ! বেশিক্ষণ রুগিদের সঙ্গে থাকলে নিজেকেও অসুস্থ মনে হয় । সব সময় পেশেন্টদের দেখাশোনার জন্যে নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্টরা রয়েছে । রাতে বই পড়ে সময় কাটে । আগে দুপুরেও তাই করতো । জয়ন্ত অসুস্থ হওয়ার পর থেকে রুটিনটা পাল্টে গেছে ।

এখন দুপুরে খাওয়ার পরেই এক অমোঘ আকর্ষণে নাম্বুদ্রিপাদ এসে ঢোকে এখানে । চা-কফি-সিগারেট আর আড্ডা । অন্য অফিসারদের সঙ্গে থাকলে অ্যাটিকেটস্‌ মেনটেইন করতে হয় । সে বড় কৃত্রিম চলাবলা । সৈনিক বা জে. সি. ও.-দের সঙ্গেও দূরত্ব বজায় রাখতে হয় । একমাত্র এখানেই ও প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে, জোরে হাসতে পারে । জমানো বরফ গলে হালকা হয় ।

বিলেট থেকে বেরোলেই চারপাশ ভেজা । এই প্যাচ-প্যাচে ব্যাপারটা ওর ভাল লাগে না । আজ সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার । এক সকালের রোদেই বরফ গলেছে । এ সময় দিল্লিতে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমান । ওভারঅলের নিচের দিকটা কাদায় মাখা-মাখি হয়ে যায় । ইতি- উতি বরফগলা স্রোত । সব গিয়ে পড়ছে নুব্রার বুকে ।

—গৎবাঁধা প্রেসক্রিপশান লিখে একঘেয়ে লাগে না আপনার ?

— উপায় কী ? বিশেষ কিছু ঔষধই এখানে আসে ! ক্যাপ্টেন সাহেবের কথায় হতাশ, একটু উন্নত ব্যবস্থা, কিছু মূল্যবান ট্যাবলেট অনায়াসে মৃত্যুকে দূরে সরাতে পারে, পাতার পর পাতা লিখে জানিয়েছি এসব, হয়তো কাজ হবে —

দু'দিন ধরে দু'পক্ষই বেশ চুপচাপ । গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে না দু'দিন ধরে এই অস্বাভাবিক ঘটনায় সৈনিকরা আশাবাদী । যুদ্ধের তীব্রতা কি কমছে ? যুদ্ধ কি থামবে এবার ? এই আশা-নিরাশার দোলায় নুব্রার বুকে জমাট কঠিন বরফ ক্ষয়িষ্ণু । সন্ধ্যা ছ'টার পর চ্যানেল অফ হলে ওরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর কাছে দাঁড়িয়ে শব্দ শোনে আর গল্প করে ।

তখন সন্ধ্যা নামে । এক আজব সন্ধ্যা । সালতোরো রেঞ্জের পেছনে অস্তমিত সূর্যের কিরণে আকাশের ছোট-ছোট ঝিনুকের মতন মেঘমালাকে নানা রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে । তাই দেখে ডাক্তার নাম্বুদ্রিপাদ কবি সুমিত্রানন্দন পন্থের বিখ্যাত কবিতা 'বাদল' আবৃত্তি করে । এই কবিতায় মেঘের পরিদেরকে শিশু বলা হয়েছে, যারা পূর্ণিমার সমুদ্রে চাঁদের নরম জ্যোৎস্নাযধরে নিজেদের সুন্দর

ঝিনুকের ডানা মেলে সাঁতার কাটে । এই উপমা অলোকের খুব ভাল লাগে । সে মনে-মনে কবিতাটি আওড়ায় — 'ফির পরিয়োঁ কে বচ্চো সে হম / সুভগ সীপ কে পঙ্খ পসার ।/ সমুদ্র তেরতে শুচি জ্যোৎস্না মেঁ, / পকড় ইন্দু কে কর সুকুমার ।'/

অলোক অবাক হয়ে দেখে, সত্যি, মেঘেরা আজ পূর্ণিমার সরোবরে জ্যোৎস্নার নরম আলো ছুঁয়ে ডানা মেলে সাঁতার কাটছে । সে আবেগে নাম্বুদ্রিপাদের হাত ধরে নেয় । কখন ধরে নেয় নিজেও টের পায় না । একসময় টের পেয়ে আরো অবাক হয় । তখন চোখা-চোখি হতেই দু'জনে একসঙ্গে হেসে ওঠে । দু'জনের আবেগই প্রায় একইরকম দেখে ওরা পরস্পরকে আরো আপন ভাবে । দু'পাশের আকাশচুম্বী শৃঙ্গগুলি আর সামনের দুই সারি শ্বেত শৃঙ্গের মাঝা-মাঝি এক বিশাল প্রাকৃতিক মঞ্চের মতন সাদা বরফের চাদর ঢাকা কালো হিমবাহের উঁচু-উঁচু টিলা গুলি । এই ব্যাপক বিশালতার মাঝে ওরা কত ক্ষুদ্র প্রাণী, কত নগণ্য ও তুচ্ছ । তাই নরম জ্যোৎস্না ধরে অপরূপ সব ঝিনুকের ডানা মেলে শিশু পরিদের পূর্ণিমার সমুদ্রে সাঁতার কাটার কবিতা ওদের মধ্যে একটা অজানা নৈকট্য তৈরী করে, সে - যে কী— তা অন্য কাউকে বোঝানো যাবে না ।

নাম্বুদ্রিপাদের শর্ট সার্ভিস কমিশন । মেয়াদ পুরো হলে আর্মি ছেড়ে জমানো পয়সায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করবে । বিয়ে করেনি । দেশ, রাজনীতি, সমাজনীতি নিয়ে খুব স্বচ্ছধারণা পোষণ করে । স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশবিভাগ ও পাক-ভারত সম্পর্ক, যুদ্ধ, সৈনিক মনস্তত্ব, জয়ন্তর অসুখ — বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায় গল্প । কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, হিরোশিমা, নাগাসাকি, কালো ধোঁয়া থেকে বরফ । নুব্রার বুকে কার্যবাহী কুল্‌কুল শব্দ । মাঝেমধ্যে দু'একটা কালো বরফের চাঁই ভেসে যায় । খচ খচ শব্দে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা লাগে । আবার এগিয়ে যায় কালো স্রোতে ।

'ইন্ডিয়া টুডে'-তে লেখাটা বেরোনোর পর সারা দেশে নাকি বেশ হৈ-চৈহয়েছে ! জৈনসাহেব অন্য কাগজেও এর উপর পাঠকদের চিঠিপত্র পড়ে এসেছে । পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকায়ও নাকি এরকম আরেকটা লেখা বেরিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কামিশনের কর্তারাও নাকি এ নিয়ে হৈ-চৈ করেছে । কিছু একটা সমাধান হতে পারে— জৈনসাহেব ভীষণ আশাবাদী । নাম্বুদ্রিপাদ ততটা নয় । অলোকের মনে হয় দু'জনই ঠিক । এটাও হতে পারে, আবার ওটাও ।

এই মেলামেশা সেনাবাহিনীতে অস্বাভাবিক । অলোক ভাবে, আমাদের সঙ্গে এমন করে মেশে বলে নাম্বুদ্রিপাদকে অফিসারমহলে কথা শুনতে হয় না তো ? এ প্রশ্নটা সে কোনমতেই ওর সামনে রাখতে পারবে না ! কমিশনড্ অফিসার বলে কথা ! তাছাড়া নদীর এই শব্দ । কখনো অলোক ওদের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখতে পায় । চোখ বড়-ছোট হয় । চোয়াল নড়ে-চড়ে । মনে হয় ওরা একে অন্যের কথা শুনছে না । কেউ কারো কথা শুনতে চায় না । সবাই নিজের সঙ্গে কথা বলে ।

নদীর উৎসের কাছে দাঁড়িয়ে অলোকের মনে পড়ে শৈশব । মনে পড়ে তীর্থমুখ, গোমতির উৎস — গোমুখ । মনে পড়ে ছোট্ট ফ্রক পরা অন্তরার মিষ্টি চেহারা । ছোট মেয়ের লম্বা বেনী — সেই পূর্ণিমা রাতে ।

গ্লেসিয়ার দুর্গা-মন্দিরে পূজারী শঙ্খ ফুঁ দেয় । মনে হয় ভগীরথ । শিবের জটা থেকে গঙ্গাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসছে শঙ্খনিনাদে । জলের কল্লোলে শঙ্খনিনাদ চাপা পড়ে যায় । শঙ্খের শব্দে জলের স্রোত প্রাণ পায় । জল আর শঙ্খের শব্দ একাকার হয়ে যায় । শঙ্খের সহবাসে গঙ্গাগর্ভে জন্মনে নেয় কোটি-কোটি শঙ্খ । মানুষ শঙ্খ ফুঁ দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে । হিমবাহে যাওয়ার আগে এই শঙ্খনাদ হয়তো সৈনিকদের মনে এক অদম্য প্রত্যয় ও উত্তাপ সঞ্চার করে ।

❑ সার্জেন্ট জৈনের ডায়েরি

অলোককে ঝাঁকুনি দিয়েও সাড়া পাই না । একবার শুধু আমার দিকে তাকায়, কিন্তু মনে হয় না ও আমাকে দেখছে । কিরকম ডুবে আছে, হারিয়ে গেছে কোথায় যেন । ক্যাপ্টেনসাহেবও দূরের মানুষ । আমিও অগত্যা চুপ করে শব্দ শুনি । চুপ থাকলে এই জলোচ্ছাসের শব্দ আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায় । ছেলে - দু'টি-র কথা, স্ত্রী'র কথা মনে পড়ে। মায়ের হাসি, দাদিমার গায়ের গন্ধ ও গল্প, মনে পড়ে শৈশব । কাঞ্চীর সঙ্গে কর্ণাটের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতাম আমরা । এক বিদূষক ছিল । সে সবাইকে হাসাতে জানতো । কিন্তু যুদ্ধ দেখে, মৃত্যু দেখে ও নিজে হাসতে ভুলে গেছিল। দাদিমার কাছে সেই বিদূষকের গল্প শুনেছি । তবু যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতাম। যুদ্ধ একটা নেশা। জয়ের নেশা, প্রাপ্তির নেশা ।

আজ পঁচিশ বছর সৈনিক- জীবন কাটিয়ে এখন বুঝি যুদ্ধ একটা আদিম প্রবৃত্তি মাত্র । বুঝি—এর অন্তঃসারশূন্যতা, বুঝি—হাহাকার । এসব ভাবলে বুকটা কেমন ফাঁকা লাগে । মাথাটা ভারি হয় । তাই আমি একা থাকতে চাইনা । সার্জেন্ট মিত্র ও ক্যাপ্টেন নাম্বুদ্রিপাদের সঙ্গে ঘুরতে তাই আমার ভাল লাগে । কিন্তু এই চুপ করে প্রকৃতির মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা আমার পক্ষে কষ্টের । সেই অন্তঃসারশূন্যতা, হাহাকার আমার বুকটাকে খালি করে দেয় । প্রকৃতির হাহাকার অবিরাম ভেসে চলে কালো-বরফগলা জলের স্রোতে ।

ওদেরকে একরকম জোর করে টানতে-টানতে তাই ওখানে থেকে সরিয়ে নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাওয়া ইয়াকদের পায়ে-চলা সর্পিল পথ ধরে চলতে-চলতে আমরা অনেক হেঁটে সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করি । উপত্যকার সারি-সারি তাঁবু, গাড়িগুলি সব ছোট হয়ে যায় । ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আবছা অস্পষ্ট । একসময় সারি-সারি আলোয় উপত্যকা একটা বিশাল জাহাজের মতন । মায়াবি হাতছানি । অবশেষে ঘন শ্বাস আর ক্ষিদেয় ভেসে আমরা ফিরতে থাকি । ফেরার পথে নাম্বুদ্রিপাদ বলে, জৈনসাহেব, এ সময়ে এদিকে ঘুরতে আসা মানা — জানেন !

— জানি স্যার, কিন্তু মনে ছিল না ! এ অঞ্চলটি শত্রুর কামানের রেঞ্জে । বেশির ভাগ গোলা এখানটায় এসে পড়ে । যখন গ্লেসিয়ার ইন্‌ডাকশান হয়, সৈনিকরা লিংকে এগিয়ে যায়, তখনই অবশ্য বেশি গোলা আসে । আর বেশির ভাগ ইন্‌ডাকশান কাক ভোরে-ও গোধুলি -লগ্নে আলো-আঁধারিতে হয় বলে এ সময়ে গোলা আসার সম্ভাবনা বেশি । নাম্বুদ্রিপাদ হেসে ফেলে, আমরা তিনটি-ই পাগল; কারো মনে ছিল না, চলুন তাড়াতাড়ি পা চালান ! ভাগ্যিস্ কেউ দেখেনি!

প্রায় এরকম ঘুরতে বেরোই আজকাল । এতে যুদ্ধের চাপটা কম লাগে ! মনটা সামান্য হালকা হয় । এ এক অদ্ভুত গোপন যুদ্ধ । মার-মার কাট-কাট করে শেষ করে দেওয়া নয় । চালিয়ে যাওয়া, চালিয়ে যেতে হবে শুধু । ইউরোপে যেমন বুলফাইট হতো, কিম্বা আমাদের সাগর শহরের রাজবাড়িতে লড়াকু মোরগার যুদ্ধ ; এ লড়াই তেমনি কিছু লোককে আনন্দ দেওয়ার জন্যে, উত্তেজনার জোগান দেওয়ার জন্যে । স্যাটেলাইট থেকে প্রতিদিন এ যুদ্ধের ছবি চলে যাচ্ছে ধনী দেশগুলির কাছে । বিশ্বের তাবড়-তাবড় নেতা ও সেনানায়করা শীততাপ - নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে ওয়াইনের সঙ্গে ভিডিও স্ক্রিণে উপভোগ করছে । তারপর পালা করে যুযুধান দেশগুলিকে মারণাস্ত্র বিক্রি করছে ! আমরা লড়াকু মোরগ । ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই । থেকে-থেকে শুধু দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ।

একদিন খালসার রোডে হাঁটতে হাঁটতে বাঁদিকে দুই শৃঙ্গের মাঝে তৈরি অন্য এক ওয়াটার পয়েন্টের বিশাল ট্যাংক তিনটি'র পেছনে কিছুটা উপরে একটা নানারঙের আয়তাকার পতাকা উড়তে দেখে আমরা চড়তে শুরু করি । নিচে থেকে মনে হয় কত কাছে ! চড়াই আর শেষ হয় না । অনেক কষ্টে পৌঁছে দেখি একটা বিশাল পাথরের আড়ালে পাহাড়ের গুহায় এক গুম্ফা । প্রতিষ্ঠাপ্রস্তরে রঙ দিয়ে লেখা লাদাখ স্কোয়াডের সৈনিকদের বানানো গুম্ফাটি লামা ছুলটিং নিমা উদ্বোধন করেছেন ১৯৮৭ সালে । সম্ভবত লাদাখের নবীনতম গুম্ফা । আমি মনে-মনে একটা ধারণা তৈরি করে অলোককে বলি, এখানে কোন লামা থাকে না ?

—থাকবে কোথায় ? কাছে-পিঠে কোন গ্রামও নেই । বুদ্ধপূর্ণিমা বা বিশেষ কোন তিথিতে লাদাখ স্কোয়াডের সৈনিকরা কাছে-ধারে থাকলে হয়তো লামা আনিয়ে পুজো হয় । এখন পঞ্চাশ কি. মি.-র মধ্যে লাদাখ স্কোয়াডের কোন কোম্পানি নেই । তাই তালাবন্ধ । গুম্ফা থেকে উপরের দিকে তাকালে কারাকোরামের ঐ শৃঙ্গটিকে দু'হাজার ফুট নিচে থেকে যতটা উঁচু লাগছিল এখনো ততটাই লাগছে । নাম্বুদ্রিপাদ বলে, আরো দেড় দুই হাজার ফুট উঁচুতে একটা পাকা বাঙ্কার আছে, এখন অব্যবহৃত, ১৯৮৪-র অপারেশানের সময় পাকিস্তানি অবজারভেশান পোস্ট ছিল । মিডিয়াম রেঞ্জ গাম এই পোস্টকে পাহারা দিত ! একখণ্ড যুবতী মেঘ এখন পাহাড়টাকে জড়িয়ে ধরেছে । গুম্ফার আকাশে পাক খাচ্ছে কয়েকটা চিনেকাক ।

আমার অবাক লাগে । মনে হয় অবাস্তব, না স্যার, আপনার কি মনে হয় না এত উঁচুতে মিডিয়াম রেঞ্জ গান নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও অবাস্তব ব্যাপার ! আমার প্রশ্নে হাসে নাম্বুদ্রি পাদ, এত উঁচু ছিল না তখন !

— মানে ? হা হয়ে যাই আমি ।

— স্যার এডমন্ড হিলারির ছেলে পিটার হিলারির নেতৃত্বে সাতটি পাশ্চাত্য দেশের এক পর্বতারোহি দল পাকিস্তান থেকে সিয়া লা হয়ে এ পথ দিয়ে কারাকোরাম পাস অবধি গিয়েছিল । ওদের বর্ণনা অনুযায়ী কালো বরফ তখন প্রায় সাসোমার কাছাকাছি ছিল, কাজেই — অলোক-ও বইটা পড়েছে । মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় ও, বীর আহির ফিল্ড রেজিমেন্টের লাইব্রেরিতে বইটা আছে, কালো বরফ এখানে তখন প্রায় দুই-আড়াই হাজার ফুট বা তারো বেশি ! চিন্তা করুন তো আট বছরে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ কি. মি. পিছিয়ে গেছে কালো বরফ ! পৃথিবীর তাপমান প্রতিবছর

বাড়ছে — ওজোন হোল্‌ —

শেষের কথাটা এত জোরে চেঁচিয়ে বলে অলোক পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হয়ে শোনা যায় — হোল — হোল ! একটা ভয়ানক গর্জনের শব্দ সেই প্রতিধ্বনিতে মিশে যায় । আমরা সতর্ক হয়ে উঠি । এ সময় আকাশে এক বিন্দুও মেঘ নেই । চিড়িয়াখানায় গেলেই একমাত্র এ ধরণের গর্জন শোনা যায় । স্বপ্ন দেখছি না তো ?

গুম্ফার সামনে অনেকটা জায়গায় বরফ নেই । দুর্লভ মাটি বেরিয়ে আছে । এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি । মাটির উপর ফোঁটা ফোঁটা লালরক্ত আর কাদায় ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন । আমরা ঘাবড়ে যাই। কী ব্যাপার ! একটা অস্বাভাবিক গন্ধ টের পাই । শরীর শিউরে ওঠে ।

নাম্বুদ্রিপাদ সাবধানে চারপাশ ঘুরে দেখছে । হঠাৎ বড় পাথরের পেছন থেকে অলোকের নাম ধরে ডাকে । প্রায় আর্তকণ্ঠ ! আমরা একরকম ছুটে গিয়ে দেখি একটা মৃত মখ্‌পোল । ভয়ে চোখ-দু'টি বিস্ফারিত । মাথা ও শিঙ দু'টি ছাড়া পুরো শরীর ক্ষত-বিক্ষত । মখ্‌পোলটার আকৃতি ছোটখাট মোষের মতন । না জানি কেন আমার মনে পড়ে চন্দ্রভানের কথা । ওরও চোখ-দু'টি এমন বিস্ফারিত ছিল । ওরও ঠোঁট-দু'টি ছিল ক্ষতবিক্ষত । দাঁতের পাটি এমনি বেরিয়ে ছিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে । আমাদের ভয় লেগে যায় । যে-কোন সময় শিকারের কাছে ফিরে আসতে পারে লেপার্ডটা । মখ্‌পোলের জন্যে তো আর কেউ ফিউনারেল করবে না ! অমি ওদের হাত ধরে টানি । আমরা বড় পাথরের পেছনটায় আসতেই দেখি ভারি বস্তা টেনে আনার মতন ছিলিঙ পানচুক জানবাক সেই মৃত মখ্‌পোলটার সামনে এনে মৃত স্নো লেপার্ডটাকে একটা লাথি মেরে পাগলের মতন চিৎকার করে বলে, মিঙ্গবো.... বাকি উচ্চারণগুলি অস্পষ্ট । আর কথা শেষ না করেই হঠাৎ এলিয়ে পড়ে বাঘের গায়ে । আমরা ছুটে গিয়ে পানচুককে কাঁধে তুলে নিই । লেপার্ডের ফালা ফালা বুক ও পেটের রক্তে পানচুকের নিজের রক্ত মাখামাখি । বাঘটাকে মারতে গিয়ে ও নিজে কতটা আহত হয়েছে—বোঝা যাচ্ছে না ।

হঠাৎ সর-সর শব্দে আঁতকে আমরা দেখি মখ্‌পোলের মাংস মুখে একটা ইঁদুর এসে লেপার্ডের গা শুঁকে আবার গিয়ে গর্তে ঢোকে । আমরা দ্রুত উপত্যকার দিকে নামতে থাকি । অলোক মাথার দিকে আর আমি পানচুককে পায়ের দিকে ধরে আছি । নাম্বুদ্রিপাদ চলতে চলতেই যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করছে কোথা থেকে চিকিৎসা শুরু করবে । আমি ভাবতে থাকি সেই ইঁদুরটার মাংস মুখে গর্তে ঢোকার দৃশ্য । —বুদ্ধদেব, তোমার মূর্তির নিচে বসে ইঁদুরটার মখ্‌পোলের মাংস খাচ্ছে । একটু পরে খাবে বাঘের মাংস । এ সংসারে বাঁচতে গেলে লড়তে হয়, লড়াই করে ডুবতে হয়, ভাসতে হয় । চন্দ্রভানের ঠোঁট ইঁদুরে খেয়ে ফেলার ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় আমার । এই তো প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম । এই তো জীবের সহজাত ধর্ম, খাদ্য আর খাদক, যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন, এ জন্যেই লড়াই, — মানুষ তো জানোয়ারই —

ছিলিঙ পানচুকের মাথার দিকটা ঘাড়ে নিয়ে চলতে-চলতে সার্জেন্ট মিত্র আলিপুর চিড়িয়াখানায় ওর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে সাদা-বাঘ দেখতে যাওয়ার গল্প করে । আমি কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না । মহাবীর মানুষকে অহিংসা শিখিয়েছে । দাদুকে দেখেছি নাকে কাপড় চাপা দিয়ে থাকতো,

যাতে নিঃশ্বাসেও কোন ক্ষুদ্র প্রাণী মারা না যায় । ঠাকুর্দা মশা কামড়ালে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিত, কিন্তু মারতো না ।

বাবা আমার নাম রেখেছে, বিখ্যাত বীরের নামে । দেশের আজাদীর জন্যে সেই নেতাজী মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি মানতে পারেন নি । আমরা কাঞ্চী ও কর্ণাটের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতাম । আজাদ হিন্দ ফৌজ আর কাঞ্চীর সৈন্যদল একাকার হয়ে যেত কাঞ্চী সেনাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র জৈনের কাছে, এবং এভাবেই একদিন বিমান বাহিনীতে নাম লিখিয়েছি । ট্রেনিং শেষ হতেই দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আমি ব্যারাকপুর কন্ট্রোল টাওয়ারে পৌছে যাই । আমাদের স্টেশন কমান্ডার সেই যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন । সেন সাহেব একরাত্রে ট্র্যান্সপোর্ট বিমান দিয়ে বোম্বিং করিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের সব ক'টা বিমান বন্দর । আমরা সেই আক্রমণ ও যুদ্ধ জয়ের সাক্ষী ।

অলোক আর নাম্বুদ্রিপাদ এখনও বকবক করছে। সামনেই বেস ক্যাম্পে সিক কোয়ার্টার । আমাদের কাঁধে ছিলিঙ পানচুককে দেখে অনেক আগেই আরো কয়েকজন সৈনিক এগিয়ে ওকে কাঁধে নিয়েছে । সিক কোয়ার্টারের সামনে পৌঁছতে দু'জন নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট-ও তখন ছুটে আসে ।

❑ বিরহী যক্ষের ডায়েরি

আজ বিবাহ-বার্ষিকীর দিনে আমি নির্বাসিত । তুমি কেমন আছো অন্তরা ? আজ নৈরাশ্য বেদনা আর বুকভরা শূন্যতা নিয়ে নিশ্চুপ কর্তব্য পালনের দিন । বিবাহ-বার্ষিকীর মতন একটা মামুলি আবেগ কেন আমার দীর্ঘশ্বাস ভারি করে ! পাগলের মতন উপত্যকার এ প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি সারা বিকেল । নদী তীরে কোথাও পাথর, কোথাও গোড়ালি ছাপানো খটরমটর বরফের সর । ভাঙ্গি কাচের মতন ধারালো । থেকে থেকে ডানার ঝটপটানি টের পাই। অন্তরার পাঠানো গ্রিটিংস কার্ডটা ওভারঅলের বুক পকেটে । কার্ডের সাদা-পাখিটা উড়ে যেতে চায় । এ মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ছাপিয়ে শুধু একটি মাটির হৃদয়ের সরলতা, নিজস্ব নিবিড় অরণ্য ছারা আর কিছুই চাই না আমি । একটি আকুল মুখের পাশাপাশি আরেকটা কাতর চেহারা ভেসে ওঠে ।

মায়ের কথা মনে পড়ে । আমাদের মুখ চেয়ে কলুর গরুর মতন চাকরি ও সাংসারিক প্রতিকূলতার ঘানিতে ঘুরতে-ঘুরতে যৌবন নিংড়ে প্রৌঢ়ত্বহীন বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া ।

রাক্ষুসে উপত্যকার বিশাল শৃঙ্গগুলির মাঝে কত ক্ষুদ্র প্রাণী আমি—অনেক ছোট । যতনবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে পড়া দিনগুলির মতন । একবার ঘন জঙ্গলে ছোট বন্ধুদের সঙ্গে আমলকি পাড়তে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলি । দূর থেকে শুনতে পাই ওরা আমাকে ডাকছে কিন্তু কিছুতেই ওদেরকে খুঁজে পাই না । তখন সামনে দেখি সারা শরীরে রুইমাছের মতন আঁশ-অলা বিশাল গিরগিটির মতন সবুজ একটা জন্তু । লাল-পিংলা চোখ দু'টি তার জ্বল-জ্বল করে ! ভয়ে চিৎকার করে মাকে ডাকি ।

তেমনি বুকফাটা চিৎকারে সবুজ ত্রিপলঢাকা আর্টিলারি কামানগুলির চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে-অন্ধকারে, কই ? কোথায় মা, কোথায় আমার পরাণ জমি, স্বপ্নের ডিঙা ? অজান্তেই সমস্ত সত্ত্বা, সমস্ত আকুলতা ঘণীভূত হয়ে চিৎকার বেরিয়ে আসে, — মা-আ-আ......

যতনবাড়ি যার নামে সেই বুড়ো যতনকুমার জমাতিয়া কাঁঠাল কাঁধে ঝোপ ঠেলে এসে সেদিন আমার পিঠ ছোঁয় । আমি ভাবি, জঙ্গল দেবতা ।—ভয় পাওয়ার কিছু নাই খোকা, ঐটা বনরুই — শুধু ঘাসপাতা খায় —

বুড়ো আমাকে কোলে করে এনে মায়ের কাছে রেখে যায় । শৈশবের সেই দেবতার মতন আজ এই ঠাণ্ডা বাতাস ও বরফের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়াকে জঙ্গম করে জৈনসাহেব, মিত্র, ডোন্ট বি ম্যাড, কাম অন্ ! ঝাঁকুনি দেয় আমাকে । ঝাঁকুনিতে একটা ভূত আবার বর্তমানে ফিরে আসে। পা অবশ হয়ে গেছে ঠাণ্ডায় । লাফিয়ে-লাফিয়ে কদমতোল করে অনেক চেষ্টার পর চলার মতন অবস্থা হয় ।

নুব্রার বুক এখন অনেক চওড়া । কিশোরী খরস্রোতা । চাঁদ খুনসুটি করতে গিয়ে ভেঙে কুটিকুটি ।আজকের মতন এমন বিরহের সন্ধ্যা আর আসেনি । নীল আকাশ আলো করে পূর্ণচন্দ্র সমস্ত পাহাড়, বরফ আর নুব্রার বুকে প্রতিফলিত ।আমরা দু'জন চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটছি । অন্যদিন এরকম পাশাপাশি হাঁটলে জৈনসাহেব কত গল্প করে ! বেশি বলে স্ত্রী ও ছেলেদের গল্প । আমিও চুপ থাকি না । বরঞ্চ বাড়িয়ে বলি । সুখ ! বাস্তবের পিঠে লাগে কল্পনার ডানা — আমপাতা জোড়া জোড়া, কাঁঠালপাতা জোড়া, ছুটতে থাকে পাগলাঘোড়া — এভাবেই ছোটে বল্গাহীন সাতকাহন ।

আমার বিশ্বাস জৈনসাহেবও বাড়িয়ে বলে । বর্ণিত জীবন থ্রিলারের মতন । মানুষের জীবন কি এত সুন্দর সাজানো গোছানো উপাখ্যান ? আমার বিশ্বাস হয় না । যেমন সেদিন সাদা - বাঘ দেখতে গিয়ে হঠাৎ তোড়ার এমনই কানে ব্যথা শুরু হয় যে চিড়িয়াখানা থেকে তক্ষুণি ট্যাক্সি করে শিশু-চিকিৎসকের চেম্বারে যেতে হয় । বাস্তব এমনই খাপছাড়া । আবার সাজানো ঘটনার মতনও ঘটে যায় কখনো-সখনো ।

এখানে জৈনসাহেব ও আমার মধ্যে চিঠি পাওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা । অনেকটা লটারি পাওয়ার মতন অনুভূতি । মিসেস জৈন শুরুতে টেক্কা দিত প্রতিদিন একখানা করে লিখে ।আমার হিংসা হতো । এখন স্কুলে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর আর অন্তরার সঙ্গে পেরে উঠছে না । এখন জৈনসাহেবের কথাবার্তায় হিংসা টের পাই ওভারঅলের বুকপকেট থেকে কার্ডটা আবার বের করে দেখতে গেলে বুখারির সামনে হেমন্তের খামটা পড়ে যায় । জৈনসাহেব ওটা উঠিয়ে আমার হাতে দিয়ে মৃদু বকুনি দেয়, ভাগ্যিস নুব্রার তীরে ফেলে আসেনি !

বিলোনিয়ার হেমন্ত সরকার ওর বাড়িতে দেওয়ার জন্যে চার হাজার টাকা দিয়ে গেছে । অক্টোবরের আগে ছুটি যেতে পারবে না হেমন্ত । ফরোয়ার্ড পোস্টে-এ যাচ্ছে । মানিঅর্ডার করতে অনেক খরচ হয়ে যাবে । ব্যাঙ্ক না থাকায় ড্রাফ্‌ট পাঠানোর কোন সুবিধা নেই । অনেক ভেবে টাকাটা নিয়েছি । সৈনিকরা একে অন্যকে কত বিশ্বাস করে ! কত কষ্টে উপার্জিত টাকা । এর

কোন রসিদ আমি লিখে দিইনি । ছুটি থেকে ফেরার পর বা এ জীবনেই আবার কখনো ওর সঙ্গে দেখা না-ও হতে পারে । হেমন্ত আমার কথা শুনে হাসে । দু'শ টাকা বাঁচানোর জন্যে চার হাজার আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে, একটা চিডি দিয়া জানাইয়েন ! আমি প্লাস্টিক প্যাকেটে মুড়ে টাকাটা সযত্নে আইডেনটিটি কার্ডের সঙ্গে বুক পকেটে রাখি । বুকে নিয়ে খাই, ঘুমাই, যুদ্ধ করি । কবে যে হেমন্তের মায়ের হাতে তুলে দিতে পারবো ওর কষ্টের উপার্জন ! কথার খেলাপ হবে না তো ?

বুখারির পাশে বসে চিত্ত ও সার্জেন্ট জৈন এখনও বকবক করছে । আমি মনে-মনে করুণ হাসি । কিছু একটা করে তো সময় কাটাতে হবে ! অন্যরা মদ খায়, তাস খেলে । ওরা ব্যতিক্রম। স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে এই মন খারাপ করা রাতে ওদের আ লফাল খারাপ লাগে না । সময় কাটানোর জন্যে নাচ-গান-ফাইট-সেক্স-সেন্টিমেন্ট ভরপুর মশলা সিনেমার মতনই ওদের গল্পে কান পেতে রাখি । শীতল সময়ে এসব গল্পও উত্তাপ জোগায় ।

বছর-সাতেক আগে ব্যাঙ্গালোর পাগলাগারদে এক সহকর্মীর অভিনয়-কে এসকর্ট করার জন্যে আমাকে যেতে হয়েছিল । সেখানে কিছু সত্যিকারের পাগল ছিল । দুই গ্লেসিয়ার-ফেরত সৈনিক সেখানে বেঞ্চে বসে, বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে, এমনকি পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে থেকেও দু'জন-দু'জনকে অসংলগ্ন শব্দবিন্যাসে অবিরাম গল্প বলতো । এখন বুঝতে পারি জীবনের একটা পর্যায়ে সৈনিককে আকাশ-কুসুম কথাবার্তায় পেয়ে বসে । বিশেষ করে একা সময়ে কাউকে কাছে পেলে । একজন পাগল অন্যকে না দেখে থাকতে পারে না । প্রকৃতির বিশালতায় নিজের অস্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষায় অসফল হলে নাবিকদের মতন মানসিক রোগের শিকার হয় সৈনিক । যা ঘটে না, তাই দেখে এবং শোনে । তখন অবাক হয়েছিলাম । আজ ওদের কষ্ট বুঝতে পারি ।

সেজন্যেই হয়তো সৈনিকদের সবসময় নানা অহেতুক কাজে ব্যস্ত রাখা হয় । হিমবাহ-ফেরৎ যোদ্ধারা আর রিজার্ভ সৈন্যরা রোজ এখানকার পাথর তুলে ওখানে সাজায় । সাদা - পাথর এক জায়গায় জড়ো করে কমান্ডারের রাশিয়ান হাটের চারপাশ — সাজাহানের তাজমহল, কালো পাথর আলাদা করে অ্যাড জুটেন্ট সাহেবের কৃষ্ণমহল, রঙিন পাথর দিয়ে ইউনিট ও কোম্পানির ডাকনাম লেখে যাতে উড়ে যাওয়া হেলিকপ্টার থেকে পড়া যায় । ভাঙা প্যাকিং-বাক্সের কাঠ জোড়া দিয়ে তার সঙ্গে ক্যাট-ই ব্যারেল লাগিয়ে ডামি কামান সাজায় । ক্রিয়েটিভ আর্ট— হা-হা!

এই ফরোয়ার্ড এরিয়ায় অক্সিজেন কম বলে বেশি কায়িক-পরিশ্রম করানো যায় না । তাই অন্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলির উপর বেশি জোর দেয় কমান্ডাররা । এরকমই হয়তো নির্দেশ থাকে । প্যারেড পি. টি. -র মতন ছকে বাঁধা টাস্কের বদলে এরকম কল্পনাশ্রিত টাস্ক তৈরিতে মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের সাহায্য নিতে হয় । একেকজন তখন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ! জীবনে প্রথম কল্পনা ও সৃষ্টির স্বাদ পেয়ে ক্ষ্যাপামির পর্যায়ে পৌঁছে যায় কোনকোন কমান্ডারের ইচ্ছা । ক্যাপ্টেন নাম্বুদ্রিপাদ বলে, সব শালা মানসিক রুগি ! সার্জেন্ট জৈন বলে, কোন হাস্য-ব্যঙ্গরসের কবিকে এখানে নিয়ে এলে আজব সব সৃষ্টি করতো —

জৈন সাহেব নিজেই চেষ্টা করে কিছু তুকবন্দি লিখেছে, একেবারে খারাপ হয়নি ! আমিও ভাবছি লিখবো — মনের কথাগুলি লিখে রাখবো আর কি ! — নিজের জন্যই ! কাঠপেন্সিলে

লিখতে হবে। এই গ্রীষ্মেও এখানে ডটপেন কিম্বা কালির কলম দিয়ে লাগাতর লেখা যায় না। কালি জমে যায়—যখন-তখন থেমে যায়।

কেউ জানতো না বিবাহ-বার্ষিকী। কার্ডটা কাউকে দেখাই নি। শুধু জৈনসাহেব দেখেছে। অন্যরা ভেবেছে, রোজ যেমন এক-একজনের থাকে, তেমনি গতকাল আমার মন খারাপ ছিল। সবার তোয়াজে অথবা নীরব চাহনিতে আমি তা টের পাই।

দিন পাঁচেক আগে এক সহকর্মী স্ত্রী-কন্যাকে লেহ্ এনেছে। আজ রেডিও টেলিফোনে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে। মহাশয়ার আজো মাথা ব্যথা। রোজই বমি করছে। তবে এখন আগের থেকে অনেক কম। মেয়েটারও সর্দি-কাশি মাথা ব্যথা কমেছে। বয়স চার। আমারও ইচ্ছে করে অন্তরা ও তোড়াকে নিয়ে আসতে। টেরাঙ-টকপো রোডে হাঁটতে হাঁটতে কল্পনায় লেহ্ থাকার বন্দোবস্ত করতে থাকি। বাসন কোসন স্টোভ সব জোগাড় করি। তখুনি বিস্ফোরণের শব্দ। চমকে দেখি লাল পতাকার সীমা পেরিয়ে চলে এসেছি অনেকটা। দু'জন শ্রমিক দূর থেকে চিৎকার করে কিছু বলছে। ডিনামাইট ব্লাস্ট করে পাহাড় ভেঙে বুলডোজারে রাস্তা বানাচ্ছে ওরা। চিত্ত আমার হাত ধরে টানে। দু'জনেই উল্টোদিকে উর্ধ্বশ্বাস ছুটতে থাকি। আর বুঝি বাঁচবো না! এখুনি পায়ের তলার পৃথিবী চৌচির হয়ে যাবে। বিস্ফোরণে ছিন্ন - ভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়বো কোন্ সে অতলে। এই মরিয়া দৌড়ের মধ্যেও হঠাৎ মায়ের চেহারাটা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। সর্বংসহা মুখমণ্ডলে টলটলে দু'টি চোখ।

তখুনি পরবর্তী বিস্ফোরণ। আমরা টেরাঙ-টক্‌পোর যে সংকীর্ণ কোণায় পৌঁছে গেছিলাম সেখানেই পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে বিশাল চাঁই। ওফ্, একটুর জন্যে বেঁচে গেছি আজ! মাত্র কয়েক সেকেন্ডের পার্থক্য। বিস্ফোরণে ছোটখাট বরফের ধস্‌ও নামে। আমরা তাড়াতাড়ি আরো নিচে চলে আসি। এখানে পাঙ্গা নেওয়া বিপজ্জনক।

চিত্ত ভাগ্য মানে। ও বলে, ভাগ্যে না থাকলে সৈনিক হয়ে ফরোয়ার্ড এরিয়ায় আস হতো না, কত বায়ু সৈনিকই তো পুরো চাকরি জীবনে একবারও আসেনি! কখনো একা যেতে-যেতে ওর নাকি নিজেকে মনে হয় তুষার মানব। কোনদিন অন্য কোথাও ছিল ভাবলে মনে — স্বপ্ন! বাস্তবে ওর কেউ নেই। এই নুব্রার উৎসমুখে হিমবাহ থেকেই জন্ম। অনন্তকাল ধরে ও এখানে আছে। আকাশের তারা, চাঁদ আর সূর্য কোটি-কোটি বছর ধরে দেখছে!

আমি ভাগ্য মানি না। কিন্তু ওর এই অনুভূতিগুলি আমাকে অবাক করে না। নেহাতই কাকতালীয়ভাবে আমারও এরকম অনুভূতি হয়েছে কখনো। নিজেকে মনে হয়েছে এই পর্বতমালা ও উপত্যকার সমবয়সী। আর কোথাও ছিলাম না কোনদিন। যেতেও পারবোনা। অদৃশ্য এক যাদুকরের মায়াজালে বন্দী সব মূর্তি আমরা। এই মায়া স্রোতস্বিনী উদ্দাম। বিশাল সব পাথরে আছড়ে পড়ে উচ্ছল। পাথরের মূর্তিগুলি যন্ত্রের মতন কাজ করে। থেকে-থেকে সাদা-বরফে অগ্নিশলাকার মতন শেল পড়ে। মূর্তি ধ্বংস হয়। নতুন মূর্তি আসে। থেকে-থেকে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় উপত্যকা। এ লড়াই চলবে। ধোঁয়া থেকে জন্ম নেবে আরো কৃষ্ণবরফ। পৃথিবীর সব নদীর জল হবে এরকম কালো। সব নদীকেই মনে হবে পয়ঃপ্রণালী। সব শিশুই এরকম পাথরের

মূর্তির মতন, যন্ত্রের মতন মায়াযুদ্ধ লড়বে। এরকম ভাবতেই শিউরে উঠি আমি। এক অজানা ভয় আমাকে জাপটে ধরে।

নদীর উৎসে অস্তগামী সূর্যের লাল প্রতিফলিত হয়ে নুব্রার কৃষ্ণধারা এখন গাঢ় লাল। যেন রক্তধারা ; যুযুধান সৈনিকদের রক্ত।

❑ অতিমানব

মনখারাপ করা সময়ে কোন ম্যাগাজিন পড়ার মতন মানসিকতা বিক্রমের ছিল না। কিন্তু এই ফ্লাইট সেফটি ম্যাগাজিনটি ওবর নামেই ডাকে এসেছে। আজ হেলিকপ্টারে এখানে এসেছে। এই ম্যাগাজিনে পাইলট ও ইঞ্জিনীয়াররা উড়ান সুরক্ষা সম্পর্কিত নানা কথা লিখে থাকে। করপোরাল বিক্রম ভরদ্বাজও বানাটপের কাছাকাছি মাইনাস বিয়াল্লিশ ডিগ্রী তাপমাত্রায় একটা হেলিকপ্টারের বিকল ইঞ্জিন পাল্টেআনার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা লিখেছে। লেখাটা পাঁচমাস পরে ছেপেছে। সহকর্মী আকবর নদফ, চিত্তরঞ্জন চৌদুরী এবং জর্জ অ্যান্টনিও ঐ অভিজ্ঞতার অংশীদার। বিক্রমের লেখায় ওদের কথও রয়েছে। সেজন্যেই হয়তো একটা শূন্যতাভরা সময়ে এই ম্যাগজিন ওকে কিছুটা আশ্রয় দেয়।

বেসক্যাম্প থেকে আজকের ফ্লাইং শেষে হেলিকপ্টারগুলি চলে গেলে মাইনাস ৩২.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিলেটে ফিরে বুখারির পাশে বসেছিল সে। তখনই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বন্ধ করে এসে নদফ ওকে ম্যাগাজিনটা দেয়। নিজের লেখাটি দেখার পর পাতা উল্টোতে-উল্টোতে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে যায়। উইং কমান্ডারের লেখা আর্টিকেল দেখে ও পড়তে শুরু করে। তিনি লিখেছেন, আমি তখন বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার ট্রেনিঙ স্কুল থেকে পাশ করে সবে জম্মুর হেলিকপ্টার ইউনিট-এ পোস্টিঙ পেয়েছি। আমাদের অফিসার কমান্ডিং ছিলেন একজন স্কোয়াড্রন লীডার। এ ছাড়াও ঐ ইউনিটে আরো দশজন স্কোয়াড্রন লীডার ও দু'জন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ছিলেন।

সেদিন অনেকদিন পর পাইলট স্ট্যাটে একজন ফ্লাইট অফিসারের নাম জুড়েছে। ফ্লাইট অফিসার এম. বাহাদুর। তৃপ্তি ভরে বারবার পাইলট স্ট্যাট-এ টাইপ করে নিজের নাম পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছিলো তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কোন পাইলটই শুধু আমার এই আনন্দকে ভালমতন অনুভব করতে পারবেন। এ যে কত স্বপ্ন আর সাধনার ফসল! প্রথমে ভাবি, ওটা 'ডুয়েল চেক' এর স্ট্যাট! কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখি অফিসার কমান্ডিং ঐ লিস্টের শেষ চারজনের নামের পাশে সবুজ কালিতে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট বানিয়ে লিখে দিয়েছেন, — ডিটাচমেন্ট টু লেহ্!

—হুররে! এযে আমার কতদিনের স্বপ্ন! তক্ষুণি ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিলো, -মা, স্কোয়াড্রেনের বোর্ডে টাইপ করা কাগজটা দেখে যাও, আমি আজ একজন ফুল ফ্রেজেড পাইলট!

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে দ্রুত প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সেরে ছোট একটা ব্যাগে অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে স্কোয়াড্রেনে পৌঁছে দেখি তখনো কোন পাইলট আসেনি। টেকনিশিয়ানরা ডেইলি ইন্সপেক্শান করছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে ব্যাগটা একটা বেঞ্চে রেখে আমিও ওদের সাহায্য করতে থাকি। একটু পরেই অফিসার কমান্ডিং সহ সমস্ত পাইলটরা চলে আসে। আমরা চারজন তখন স্কোয়াড্রেন লীডার কে. ডি. এস সামবিয়াল এর নেতৃত্বে কাশ্মীর উপত্যকার উপর দিয়ে এক স্বপ্নের দেশে উড়ে চললাম। শ্রীনগর ও কারগিলে রিফ্যুয়েলিং হল্ট ছিল। আমি আনন্দে আত্মহারা, পাখী হয়ে আকাশে ওড়ার আনন্দের সঙ্গে জুড়ে ছিল স্বপ্নের মতন পর্বতমালা ও তার মাঝখান দিয়ে জাঁসকর উপত্যকা হয়ে অবশেষে লেহ্ উপত্যকায় ঢোকার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। জাঁসকর উপত্যকাও লাদাখেরই অংশ। সে যে কী অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। এত মুগ্ধতার মাঝে মনোযোগ দিয়ে হেলিকপ্টার চালনা বেশ দুরূহ কাজ। দু'টো হেলিকপ্টার নিয়ে একসঙ্গে যাচ্ছিলাম আর নিয়মিত পরস্পরের সঙ্গে রেডিও টেলিফোনে কথাবার্তা বলছিলাম বলে এই মুগ্ধতা আমাকে কোন সর্বনাশের দিকে টেনে নিতে পারেনি।

সেই থেকে পরবর্তী পনের দিনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার সারাজীবন মনে থাকবে। বিশেষ করে মনে থাকবে সেই কমিটমেন্টের কথা যার জন্য ফ্লাইং অফিসার র‍্যাঙ্কেই ভারতবর্ষের এভিয়েশান হিস্ট্রিতে আমার নাম লেখা হয়ে গেছিল।

লেহ্ পৌঁছে দু'দিন ধরে আমরা নিজেদের এক্লিমেটাইজ করলাম। তৃতীয় দিন সকালেই কে. ডি. এস. আমাদেরকে নিয়ে আর্মির ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে গেলেন। সেখানকার কর্ণেল জি. এস. এর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর কে. ডি. এস. আমাদেরকে হাই অলটিচিউড ওয়ারফেয়ার স্কুলের এক বিচিত্র অভিযানের ব্রিফিং দিলেন। অভিযানের লক্ষ্য পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ গ্লেসিয়ার সিয়াচেন। কর্ণেল ডি. এস. আমাদেরকে মিলিটারী ম্যাপ দেখিয়ে সেই অভিযানের ব্যাপারে বিস্তারিত বলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় পতাকাকে আমাদের নিজস্ব পর্বতশিখর ও উত্তুঙ্গ গ্লেসিয়ারে ওড়ানো। অঞ্চলটি মনুষ্যবাসের অনুপযোগী এবং সেনাবাহিনীও সেখানে অনুপস্থিত বলে পাকিস্তান অঞ্চলটিকে বিদেশী অভিযানকারীদের খুলে দিয়েছে।

অভিযানকারীরা আগে ভারতের কাছেই অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু করাচী চুক্তি ও সিমলা চুক্তিতে এই অঞ্চলটিতে কোন লাইন অফ কন্ট্রোল আঁকা না থাকায় ভারত সরকার অনুমতি দিতে দ্বিধা করে। কিন্তু একই দরখাস্ত ওরা পাকিস্তান সরকারকে পাঠালে জিয়া ওল হক অনুমতি দিয়েছে। এখন ঐ অভিযানকারীরা নিজের-নিজের দেশে ফিরে গিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা তাদের দেশবাসীকে জানাবে। সবাই জানবে সিয়া লা থেকে কারাকোরাম লা অব্দি বিস্তৃত অংশটিতে পাকিস্তানেরই দখল রয়েছে।

HAWS অভিযানের উদ্দেশ্য ঐ অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখল অভিযানের পথ সুগম করা। আর আমাদের কাজ হবে এই HAWS অভিযানকারীদের তাজা রসদ ও চিঠিপত্র জোগানো। ওরা এতদিনে প্রথম বেস ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছে।

বিক্রম এই পাইলটকে চেনে। সারসাওযায় ওর হেলিকপ্টার ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন এই উইংকমান্ডার বাহাদুর। দারুণ আকর্ষক ব্যক্তিত্ব। প্রত্যেক পাইলট ও টেকনিশিয়ানের সঙ্গে ওর হৃদ্যতা রয়েছে। তাঁর এভিয়েশান রেকর্ডের কথা আগেই জানতো। কিন্তু আজ ফ্লাইট সেফটি ম্যাগাজিনে ওর লেখাটি পড়ে খুব ভাল লাগছে। অনেকদিন পর কিছুক্ষণের জন্যে হলেও স্ত্রী-কন্যা বিয়োগের দুঃখ থেকে ভুলে থাকতে পারছে ও। হেলিপ্যাড থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে বসতেই সহকর্মীরা ওর হাতে ম্যাগাজিনটি তুলে দিয়েছে। ও মনে মনে ভাবে, তার মানে ১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া এই যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রায় ছ'বছর আগেই HAWS অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। পড়তে-পড়তে গলা খাকারির সঙ্গে মুখে একদলা কফ চলে আসে। বিলেটের বাইরে বেরিয়ে থুতু ফেলে এসে বুখারির পাশে বসে ও আবার পড়তে শুরু করে। নব ঘুরিয়ে বুখারির আঁচ বাড়িয়ে দেয়। এখন বাইরে তাপমান মাইনাস বত্রিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এত জামাকাপড় পরে বুখারির পাশে বসেও ওর ঠান্ডা লাগে। তবু নিজের অশান্ত মনকে ধন্যাত্মক করে তুলতে ও পড়ে।

— লগ বুক অনুযায়ী ১৯৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর আমরা প্রথম খরদুঙলা পেরিয়ে নুব্রা উপত্যকায় ঢুকি। প্রায় ২০-২৫ মিনিট ওড়ার পরই গ্লেসিয়ার শুরু। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সিয়াচেন গ্লেসিয়ারের শরীর থেকে অজস্র নাকের মতন কালো-কালো শৃঙ্গ বেরিয়ে আছে। কর্ণেল জি. এস. আমাদের এই কালো বরফের কথা বলেছেন। আমরা ক্যাম্প ওয়ানের উপরে পৌঁছে ডাইনে-বাঁয়ে কোন ল্যান্ডিং প্লেস পাওয়া যায় কিনা, খুঁজি। আমাদের চেতক হেলিকপ্টারের নীচে স্কিড লাগানো নেই। একটা পুরো চক্কর লাগিয়েও এরকম কোন জায়গা না পেয়ে অগত্যা আমরা কালো বরফের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অভিযানকারী সৈনিকদের থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উপরে চেতককে আকাশেই হোভার করিয়ে দরজা স্লাইড করে তাজা রসদ ও চিঠিপত্রের প্যাকেট ফেলি। একটু দূরেই ক্যাম্প টু। ক্যাম্প ওয়ান থেকে ফ্লাইং টাইম ৮-৯ মিনিট মাত্র। অথচ অঞ্চলটি এতই দুর্গম যে পায়ে হেঁটে ক্যাম্প ওয়ান থেকে ক্যাম্প টু যেতে নাকি বারো ঘন্টা লেগেছে। অভিযানকারী দলটি এখন আর এগোতে পারেনি। ক্যাম্প -টুতেও একই পদ্ধতিতে রসদ ও চিঠিপত্র ড্রপ করে আমরা আবার খরদুঙলা হয়ে লেহ্ ফিরি।

সেদিনই ব্রিফিং রুমে নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে-করতে খবরের কাগজ উল্টোচ্ছিলাম। কাগজে কুয়ো থেকে দড়ি-বালতি দিয়ে জল তোলার একটা ছবি দেখে হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। স্যার! আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, আমরা এইভাবে সৈনিকদের হাতে লেখা চিঠি ওদের প্রিয়জনদের জন্য নিয়ে আসতে পারি!

কে. ডি. এস. উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কি ভাবে ?

আমি তখন ঐ দড়ি-বালতির আইডিয়াটা সবাইকে বলি। একথা স্কোয়াড্রন লীডার কৌশিকের চোখ চকচক করে ওঠে। তিনি আজই কে. ডি. এস.কে রিলিভ করতে অন্য একটা হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন দু'জন গ্রাউন্ড ক্র্যু। কে. ডি. এস. এর স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হচ্ছে।

দু'দিন পর আবার অভিযানকারী দলকে চিঠি ও রসদ পৌঁছুনোর জন্য আমরা রওয়ানা হই। ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮। ককপিটে বসার আগে দু'টো ভারী পলিথিন প্যাকেটের গায়ে চাইনোগ্রাফ পেন্সিল দিয়ে হিন্দিতে গোটাগোটা করে লিখি, — তোমরা চিঠি লিখে রেখ, আমরা দশমিনিটের মধ্যে ঘুরে এসে তোমাদের চিঠি নিয়ে যাবো ! ওদের নমিন্যালে রোল অনুযায়ী প্রত্যেক প্যাকেটে আলাদা করে ওদের চিঠিপত্র ঢোকাই আর চেতক এর রোটার টিপ এর ঢাকনার সঙ্গে নাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধে দু'টো হুকে সেই প্যাকেটগুলিকে ঝুলিয়ে ওজনটা দেখে নিই। না, হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই আর। একটা প্যাকেট বাঁধা দড়ি আমরা নিলাম। অন্যটা অন্য চেতকে। আজ আমার পাশে কোপাইলট হয়ে বসেছেন স্কোয়াড্রন লীডার কৌশিক। ইউনিট - এ ওর ডাকনাম- 'চাচা'।

সেদিনও ক্যাম্প ওয়ানের উপরে গিয়ে আমরা হোভার করি। অন্য হেলিকপ্টারটি ক্যাম্প -টু'র দিকে এগিয়ে যায়। পরিকল্পনা মতন ওরা ওখানে চিঠি ও প্যাকেট ড্রপ করে এসে ক্যাম্প-ওয়ান থেকে চিঠি তুলবে, আর আমরা গিয়ে ক্যাম্প টু-র চিঠি তুলে এনে একসঙ্গে ফর্মেশনে ফিরে যাব।

চিঠি ও প্যাকেট ফেলে আমরা যখন হেলিকপ্টার উপরে ওঠাচ্ছি তখন নীচে তাকিয়ে দেখতে পাই চিঠি ও রসদ নিতে আসা জওয়ানটি আমাদের স্যালুট ঠুকছে। তাঁর চোখ-মুখে পরিতৃপ্তির চমক। ক্যাম্প-টুর পথে আমরা অন্য হেলিকপ্টারটিকে ক্রশ করি। কো-পাইলট দু'জন বুড়ো আঙল তুলে পরস্পরকে 'থামস্-আপ' দেখায়।

কিন্তু ক্যাম্প টু'র উপরে পৌঁছে উচ্চতা কমিয়ে হোভার করে হুকঅলা দড়ি নামাতে লক্ষ্য করি, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকের হাতে কোন কাগজপত্র নেই। অবাক হয়ে যাই। ওরা কি অন্য হেলিকপ্টার থেকে ফেলা চিঠি পড়েনি ? আমার রাগ উঠছিলো। চাচা রেগে বলেন, — হোয়াট ননসেন্স !

চেতক এমনি ফুয়েল শর্ট রান করছে এখন। আমার নামানো রোটার টিপ এর ঢাকনায় লাগানো দড়িটাতে লোকটা ছোট্ট মতন কিছু একটা বেঁধে দেয়। মনে মনে বলি, —আরে গর্দভ হুকটায় ঝুলিয়ে দে-না।

চাচা হেলিকপ্টার উপরে ওঠায়। আমি দড়িটাকে কুয়োর জল তোলার মতন করে উপরে তুলে নিই। দেখি, একটা লোকুলা ড্রপের বাক্সের গায়ে পেন্সিল দিয়ে হিন্দিতে লেখা, —সাহেব, আমাদের কাছে লেখার জন্যে কাগজ নেই, কলমও সব শুকিয়ে গেছে ! দয়া করে কিছু লেখার সামগ্রী দিয়ে যাবেন !

পড়তে-পড়তে আমি বাষ্পারুদ্ধ হয়ে পড়ি। লেখাটি চাচাকে দেখাই। ওর চোখেও জল চলে আসে। রেডিও টেলিফোনিতে অন্য হেলিকপ্টার পাইলটের কাছে জানি যে, ক্যাম্প ওয়ান থেকে ওরা কয়েকটা চিঠি পেয়েছে, সঙ্গে একইরকম অনুরোধ সম্বলিত চিঠিও পেয়েছে। ক্যাম্প ওয়ান পার হওয়ার সময় দেখি ওখানে জমায়েত অভিযানকারীরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাদের স্যালুট করে যাচ্ছে।

লেহ্ ফিরে আমরা ফিল্ড পোস্ট অফিস থেকে সৈনিকদের জন্য নির্মিত কিছু ফ্রি ইনল্যান্ড লেটার ও প্রত্যেকের জন্যে একটা হিসেবে কাঠ পেন্সিল ও শার্পনার কিনে প্যাকেট তৈরী করে ফেলি। মনুষ্যনির্মিত যে কোন কালিই ওখানে শুকিয়ে যাবে বলে অহেতুক কোন কলম কিনি নি। এ কাজে আমাদের একজন মেকানিকও খুব সাহায্য করে ।

দু'দিন পরই পরবর্তী শর্টিতে আমরা ওদেরকে সেগুলি ড্রপ করি এবং পর্যায়ক্রমে ঐ কুয়ো থেকে জল তোলার পদ্ধতিতেই সেগুলি তুলে আনি । তখন অভিযানকারী সৈনিকদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস আমাদের ছুঁয়ে যায় । একেকজন আকাশের দিকে তাকিয়ে স্যালুটের পর স্যালুট ঠুকতে থাকে, যেন ঈশ্বরকে স্যালুট ঠুকছে । তখন আমাদের সাফল্যের পুলকও ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না ।

ডিটাচমেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি ফিরি । পনের দিন পর একটা হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন পাল্টানোর জন্য আমাকে ইঞ্জিন ও মেকানিক নিয়ে শ্রীনগর ও কারগিল হয়ে আবার লেহ্ যেতে হয় । দুপুর বারোটায় সেখানে গিয়ে পৌঁছুই ।

ক্রু রুমে বসে কফি খাচ্ছিলাম, তখনই সিয়াচেন অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প থেকে একটা ক্যাজুয়ালটি এভাকুয়েশান এর রিক্যুইজিশন আসে । এ আবার কোন জায়গা ? আমাদের ফ্লাইট কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার এম. সি. মোঙ্গা এখন ডিটাচমেন্ট কমান্ডার, এবং ঘটনাচক্রে উপস্থিত চারজন পাইলটের মধ্যে আমারই গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে । সুতরাং ঐ ফ্লাইটের কো-পাইলটেব আসনে আমাকেই বসতে হলো । তখন বুঝিনি যে আমরা কী করতে যাচ্ছি !

পুরো তেল নিয়ে আকাশে উড়ে দু'টো অবশ্যম্ভাবী অরবিটে উচ্চতা বাড়িয়ে আমরা খরদুঙলা পেরিয়ে যাই । তারপর ইয়াংকি জাংশান পেরিয়ে, নুব্রা উপত্যকা দিয়ে চলতে-চলতে সিয়াচেন হিমবাহে ঢুকি । একসময় আমরা আগে দেখা ক্যাম্প ওয়ান এবং ক্যাম্প-টু পেরিয়ে যাই । এরপরই পুরোপুরি নতুন পৃথিবী । নতুন পাহাড়; বিস্তৃত শ্বেত হিমবাহের বিশাল বিস্তার-এ যেন বরফের সমুদ্র ।

তখন দুপুর দু'টো । আমরা হুক্কায় চলছি । সরাসরি টিউব থেকে অক্সিজেন নেওয়াকে আমরা "হুক্কা" বলি । চেতক হেলিকপ্টার ষোল হাজার ফিট উচ্চতায় পৌঁছে গেলে কোথাও আর কালো বরফ দেখা যায় না । গ্লেসিয়ার এবং দু'পাশের পর্বতগাত্র-সমূহে শুধু শ্বেত সমারোহ ।

কিন্তু কোথায় আমাদের অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প ? আমরা উড়তে-উড়তে একসময় সিয়াচেন হিমবাহে উচ্চতম প্রান্ত অব্দি পৌঁছে যাই । এখানে কারাকোরাম ও সালতোরো খুব কাছাকাছি । পরে ঐ পয়েন্টেটার নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দিরা কোল । আমাদের দেশের উত্তরতম সীমা ঐ ইন্দিরা কোল । অগত্যা অ্যাবউট টার্ণ ! মোঙ্গাসাহেব ফ্লাইঙে মন দিয়ে আমার উপর ভালমতন নজর রাখার দায়িত্ব দেয় । আমি খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে একরকম হতাশ হয়ে-পড়ি — সে কী রে বাবা, কোথায় গেল মানুষগুলি ! উৎকণ্ঠায় শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় চলে আসার জোগাড় । সামান্য দেখার ভুলে কিছু মানুষের জীবন যাবে না তো ! নানারকম চিন্তা মাথায় খেলে । ক্রমে

উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে তখনই হঠাৎ আমি দেখতে পাই একজায়গায় প্রায় ১০ জন অভিযাত্রী আমাদের লক্ষ্য করে কালো ও লাল পতাকা ওড়াচ্ছে। ওদেরকে পুতুলের মতন দেখাচ্ছে। আমি মোঙ্গাসাহেবকে দেখাই।

মোঙ্গাসাহেব একটা চক্কর লাগিয়ে অনেকটা উচ্চতা কমিয়ে ফেলে। তারপর দ্রুত লো রেকি করে একটা প্রায় সমতল স্থান পেয়ে হেলিকপ্টার নীচে নামিয়ে বরফে চাকা ছোঁয়ায়। একে দুঃসাহস ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া যায়না। আমার স্পষ্ট মনে আছে ডানদিকের চাকা প্রায় ছয় ইঞ্চি বরফের ভেতর ঢুকে তারপর স্থির হয়। আর বেশী হলে অভিযাত্রীদলের সঙ্গে হেলিকপ্টার সমেত আমাদেরকেও আটকে পড়তে হতো।

আমাকে কন্ট্রোল সামলাতে বলে স্লাইডিং দরজা খুলে মোঙ্গাসাহেব নীচে নামে এবং দ্রুত অন্যদের সহায়তায় দু'জন মৃতপ্রায় সৈনিককে ঠিকমতো পেছনে চড়ায়। একজন অফিসার ও একজন জওয়ান। মোঙ্গাসাহেব হেলিকপ্টারে উঠে আবার কন্ট্রোল সামলায় এবং বেশ কসরৎ করে আকাশে ওড়ে। আমার তো এখনও ভাবলে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায়। যারা চেতক হেলিকপ্টার চালিয়েছে অথবা ওতে চড়েছে তারা বুঝবে, ঐ উচ্চতা, ঐ তাপমান এবং অঞ্চলের নিরিখে আমার এই রোমহর্ষক অনুভূতির কারণ। একচুল এদিক-ওদিকে হলেই সেদিন আমাদের খবর কেউ জানতো না!

এদিকে কন্ট্রোল প্যানেল লো-অন-ফুয়েল লাইট জ্বলে ওঠায় আমাদের চোখ কপালে। এই তেল নিয়ে কোনমতেই লেহ্ ফেরা সম্ভব নয়। এখনকার থয়েস বেস তখন সবে তৈরী হওয়া এয়ারক্র্যাফ্ট ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড মাত্র। আমরা সেদিকেই উড়তে শুরু করি। ইয়াংকি জাংশান থেকে ডানদিকের ঐ পথে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও আমার নতুন। তবে মোঙ্গাসাহেব আগে একবার এসেছেন। যাইহোক, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকায় নিরাপদেই থয়েসে নামি আমরা।

আমার লগ বুক বলে, চেতক Z-1410 স্কোয়াড্রন লীডার এম. এল. মোঙ্গা এবং আমি লেহ্ টু সিয়াচেন অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প টু থয়েস, মোট ফ্লাইং আওয়ারস - দু'ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট। এটাই ছিল সিয়াচেন হিমবাহে প্রথম হেলিকপ্টার অবতরণ, যেখানে আজও শুধু একধরণের পাইলটরাই নামতে পারেন—যারা সাহসী আর সাধারণের চাইতে অনেক বেশী ডানপিটে। শুধু একধরণের টেকনিশিয়ানরাই সফল হন, যারা সাহসী এবং সাধারণের চাইতে অনেক বেশী দেশকে ভালবাসে! ওখান থেকে বেঁচে ফিরে আসা প্রতিটি সৈনিককে আমি বলবো অতিমানব!

লেখাটি পড়ে বিক্রমের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। এই ম্যাগাজিন কি আমাদের দেশের কর্ণধাররা পড়ে? কোন নেতা কি এই ম্যাগাজিন পড়ে? জনসাধারণ তো পড়ার সুযোগই পায় না। নিজস্ব দুঃখ ভুলে গিয়ে বিক্রম জর্জ অ্যান্টনীকে পড়তে দিয়ে বলে, তুমি পড়ে বাকীদেরকে দিও!

পাশে বসে হাত সেঁকতে থাকা চিত্ত বলে, আমরা তিনজনেই পড়েছি, তুমি তখন রিফ্যুয়েলিং ও এয়ারক্র্যাফ্ট মেনটেন্যান্স নিয়ে ব্যস্ত ছিলে! তোমার লেখাটিও ভাল হয়েছে! জর্জ বলে, সব নেতাদের এখানে এনে ছেড়ে দাও! তাহলে যদি ওরা আমাদের কষ্ট বুঝতে পারে! নদফ বলে,

আর যত দাঙ্গাকারী বীরপুঙ্গব আর সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়ছে, সব ক'টাকে জেলে না ঢুকিয়ে এখানে এনে পোর্টারের কাজ করাও।

গুরমীত বুখারির আগুণটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ঠিক বলেছো! বিক্রম বলে, আমরা সব ধর্মের ষাঁড়, সীমান্তেও মরবো আবার দাঙ্গাও থামাবো! আমাদের বাড়িঘর ওরা দখল করবে, বিষয়সম্পত্তি লুটে-পুটে খাবে, এমনকি স্ত্রী-পরিবারের গায়েও হাত— বিক্রম আর বলতে পারে না। ওর বাকরুদ্ধ হয়ে আসে।

নদফ বলে, অথচ আমরা প্রয়োজনে ছুটিও যেতে পারবো না! আমরা যে অতিমানব! গুরমিত তার পাগড়ির ভেতরে উলকাঁটার মতন দেখতে একটা স্টীলের কাঁটা ঢুকিয়ে মাথা চুলকোতে- চুলকোতে বলে, ১৯৮৪ সালে আমি যখন অপারেশান মেঘদূতে বাহাদুর টপ দখলের লড়াই এ সামিল হয়েছি তখন আমার বাবা, দুই ভাই ও ছোট্ট বোনটি দিল্লীর দাঙ্গায় মারা গেছে। ও হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে, ১৯৮৯ সালে আমরা যখন শ্রীলংকায় এল. টি.টি. ইর হাতে পড়ে-পড়ে মার খাচ্ছি, আর সুযোগ পেলেই গোপণে প্রতিশোধ নিচ্ছি, তখনই ভাগলপুরে নদফের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দাঙ্গাকারীরা ওর বোনকে রেপ করলো!

নদফ বলে, অতিমানব ছাড়া এসব যন্ত্রণা বুকে নিয়ে কারা সীমান্তে লড়াই করবে?

চিত্ত বলে, তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, জনমানসেও কিন্তু নেতাদের প্রতি ঘৃণা বাড়ছে! সব কিছুর-ই একটা সীমা আছে। এরপর যদি ধর্মান্ধতা কিম্বা উগ্রজাতীয়তাবাদ কোন সিভিল ওয়ার ডেকে আনে, অথবা জনমানসের বিরক্তি ও হতাশার প্রতিফলন হিসেবে ব্যাপক কোন সামরিক জাতীয়বাদী অভ্যুত্থান হয়, তার পরিণাম কি ভাল হবে?

বিক্রমের সমস্ত অস্তিত্বে তখন আবার স্ত্রী ও কন্যার মুখ ভেসে ওঠে। স্ত্রী'র হাসি, কথা, আদর, অভিমান, কন্যার আধো-আধো উচ্চারণে কথা বলা, থপ-থপ করে হাঁটা! ও হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে, আর গ্রেসিয়ার জ্যাকেটের হাত দিয়ে থেকে-থেকে চোখ মুছতে থাকে। অসংগতির মাইনাস তাপমাত্রায় গণ-গণে বুখারি ঘিরে বসে থাকা এয়ারম্যানদের সময় থেমে থাকে।

❑ সুহানি রুৎ ফগনে দী...

বরফগলা জলে নুব্রা এখন সশব্দ। আজ একা সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে স্রোত দেখে অলোক — অপলক। অদম্য স্রোতধারা। প্রবহমান বরফের চাঁইগুলিতে আঘাত লেগে-লেগে ছিটকে উঠছে ফেনা। আজও রোদ উঠেছে। অলোকের ছায়া ব্রিজের রেলিং -এর ফাঁক দিয়ে স্রোত স্পর্শ করেই একেবেঁকে আলম্বিত — যেন ওর মানসিক বিক্ষেপের প্রতিফলন।

এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টারগুলি এয়ার মেনটেন্যান্স করে ফিরে গেছে নিজস্ব বেসে। এয়ার ও.পি.-র দু'টো হেলিকপ্টার ক্যাজুয়ালটি এভাকুয়েশন করতে কোন ফরোয়ার্ড পোস্টে-এ গেছে। গতকাল চিত্ত চণ্ডিগড় ফিরে গেছে। আজ জৈনসাহেবও লেহ্ গেছে। সেতুর উপর কেউ থামে

না। সৈনিকদের সময় কম। নানারকম ডিটেইল কাঁধে। রোজ দেখতে-দেখতে কঠিন জীবন যাপণে সৌন্দর্য-স্পৃহা আর থাকে না।

আজই অলোক মিসেস জৈনের চিঠি পেয়েছে। কষ্টের সময় স্বামীকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সস্ত্রীক সাগরে নিজেদের বাড়িতে আমন্ত্রণ। আজ রাতে কিম্বা আগামীকাল দুপুরে জবাব লিখবে অলোক। মনে মনে ভাবে, নিজের বাড়িতেই এখন আমি অতিথি, আপনাদের কাছে অতিথি হতে আপত্তি নেই!

এখন আর নদীর কাছে দাঁড়াতেও ভাল লাগে না। মনে হয় জন্ম থেকেই দেখছে। সবাই কল্পনার প্রিয়জন। কোনদিন চোখে দেখেনি। কেউ-কেউ শুধু ফটো পাঠিয়েছে কোন্ সে অজানা দেশ থেকে! কোনদিন যেতেও পারবে না! কেমন মায়াময় ঘর-বাড়ি লোকজন — বাস্তব না কল্পনা? — হে জননী মমতার মুখ!

হঠাৎ আদিম হাওয়ায় রক্তে এক মৃত্যুচেতনা জন্ম নেয়। মনে হয় সব স্বপ্ন। যে-কোন মুহূর্তে ওকে টেনে নেবে খরস্রোতার ক্রমবর্ধমান স্রোত। বড়-বড় বরফের চাঁইগুলি একে অন্যের গায়ে ঠোক্কর লেগে ভেসে যায়। প্রবল স্রোত সেতুর লোহার বিমে ছিটকে মুখে হাতে লাগলে শরীর শির-শির করে। মনে হয় তুহিন-প্রবাহে আটকে গেছে। বরফের চাঁইগুলি ওকে পাথরে-পাথরে আছড়ে ছিবড়ে করে উগড়ে দেবে শীয়োকে। শীয়োক থেকে সিন্ধু। সভ্যতার স্রোতে মিশে যাবে আর এক সৈনিকের রক্ত-মাংস। এরকম ভাবতেই অলোকের অস্থিরতা বাড়ে। অকারণেই গুমরে কান্না আসে। ও কি পাগল হয়ে যাবে? ও কি কাউকে ভালবাসে? সবই যদি স্বপ্ন, কান্না পায় কেন? হঠাৎ অজানা কারণে রেগে উঠে ভাবে, যাব না ছুটি! না চাইলে ত্রে আর কেউ জোর করে পাঠাতে পারবে না! ছুটি গিয়ে কাকে কী দিতে পারি! সবার কষ্ট বাড়িয়ে তুলি — নিজের বাড়িতে বারবার নিজেই অতিথি হয়ে —

বিলেটের সবাই বলে আজকাল ও নাকি ঘুমের মধ্যে বকে। স্ত্রী-কন্যা-মা সব্বাইকে ডাকে। আগামীকাল হয়তো রিলিভার আসবে। যদি আবহাওয়া ভাল থাকে। বছরে যে-কোন দিন যে-কোন সময় আবহাওয়া খারাপ হতে পারে লাগাতর — এই জুন মাসেও। অলোক দুর্বল হয়ে পড়েছে। আগে বুঝতে পারেনি। হঠাৎ সেতুটা কেমন নড়ে ওঠে। হাওয়ায় নাকি জলের ধাক্কায়? ভেসে যাচ্ছে নাকি? ও ছুটে পালাতে যায়। কিন্তু পা অবশ, ভাবনার বৃন্ত ছিঁড়ে ও তখন এমন বেসামাল যে-কোন রকম পতনকে আটকাতে পারছেনা। তখনই একটি ছায়া আবার ওর ছায়ার সঙ্গে মিশে যায়। ওর কাঁধে হাত রাখে কেউ।

অলোক ঘুরে দেখে নাম্বুদ্রিপাদ। মনে হয় কতদিন পরে দেখেছে। পাথরে প্রাণ পায়। ভীষণ ভাল লাগে। আর এক মুহূর্তেও না দাঁড়িয়ে নাম্বুদ্রিপাদের হাত ধরে সেতু পেরিয়ে যায় অলোক।

সেতু পেরিয়ে রাস্তাটা একেবেঁকে মাইল চারেক দূরে একটা ছোট্ট পাহাড় পেরিয়ে যায়। এবড়ো-খেবড়ো পথ। পথে বরফ নেই। পথের দু'পাশে কোথাও-কোথাও জমাট বরফ। অলোকও নাম্বুদ্রিপাদের মিথষ্ক্রিয়ায় নীরবতাই বেশি। গল্প বানিয়ে বক-বক্ করতে আর ভাল

লাগে না। সত্যি ঘটনার বিস্তৃতি সীমিত। সত্য অনুভূতির গভীরতা ও ব্যাপ্তি এত বেশি যে মুখে বলা যায় না অনুভব করতে হয়। যেমন বাঁশির সুর। নীরবতাই ওদের রামধনু। পাশাপাশি হাঁটতে ভাল লাগে। কথা বললেও ক্বচিৎ ব্যক্তিগত বিষয়। নয়তো অন্য সমস্ত জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সালতোরোর গা থেকে বরফগলা জল সরু নালাপথে গিয়ে নুব্রায় পড়ছে। তাই এক রকম ক্যাঙারুর মতন লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে হয় কিছুক্ষণ। তারপরই ওরা হাঁপাতে থাকে। একটা বড় পাথরের উপর পাশাপাশি বসে। সামনের বাঁকে বিশাল পাথরের গায়ে বুদ্ধের লাইফসাইজ রঙিন চিত্র। ওরা এগিয়ে যায়।

ছবিটা কোন লাদাখি সৈনিক এঁকেছে। এই পাথরটা এত বড় যে এর উপর একটা মিডিয়াম রেঞ্জ কামান রয়েছে। পেছনে হয় তো গোলা রাখার প্রাকৃতিক তাকও আছে। ছবিটার নিচে লাদাখিতে কিছু লেখা। দেবনাগরীতে লেখা, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ইত্যাদি। ওরা ভাল করে দেখার জন্যে অন্য একটা বড় পাথরের চাঁইয়ে উঠে দাঁড়ায়। তখনই নাম্বুদ্রিপাদ দেখতে পায় কামানের নিচে লেখা পাকিস্তানি ব্রিগেডের কোড। রিপোর্টাররা নিশ্চয়ই বুদ্ধের ছবি আঁকা এই পাথরের উপর রাখা পরিত্যক্ত কামানটা দেখেনি। নাহলে এই ছবিও নিশ্চয়ই ঐ লেখাটির সঙ্গে ছাপা হতো।

ওরা পাথরটার উপর পাশাপাশি বসে পড়ে। আগামীকাল ভোরে নাম্বুদ্রিপাদ এক ফরোয়ার্ড বেসে যাচ্ছে। কে জানে আবার কবে অলোকের সঙ্গে দেখা হবে! কে জানে আদৌ আবার দেখা হবে কি না! কি জানি কেন, একদলা ব্যথা গলায় এসে জমা হয়। কিন্তু কিছুই বলতে পারে না ও। অলোকও নিশ্চুপ। এত ভাললাগা সত্ত্বেও একটা ব্যবধান, অদৃশ্য সম্ভ্রমেব প্রাচীর থেকে যায়। এ জন্যে কেউ ভেঙে পড়তে পারে না। মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। শেষ মুহূর্তে প্রতিটি মানুষ অন্যের চাইতে আলাদা থেকে যায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে।

সমস্ত জাগতিক বিষয় উপত্যকার দুই দিকে কারাকোরাম আর একদিকে সালতোরোর উত্তুঙ্গতাব সীমারেখায় অসম্পূর্ণ। নাকি পদমর্যাদায়, অযাচিত সম্ভ্রমে? এই অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। এক-ফালি আকাশ দেখে আগামীকালের পূর্বাভাষ দেওযার মতন্ই এখানে সম্পূর্ণতা খুঁজতে যাওয়া একটি অবাস্তব প্রয়াস। এখন তাবা-রা ঝলমলে। এক-ফালি চাঁদ নিষ্প্রভ। সারি-সারি তাঁবু আর ঈগলুর মতন দেখতে রাশিয়ান ঘরগুলিব জানালা দিযে সারিবদ্ধ আলো দেখা যায। মোম বা হ্যারিকেনের আলো। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে জোরে।

গাড়িব হেডলাইট, চলমান ব্যাকলাইট দূর থেকে সুন্দর লাগে। কখনো অন্তঃসার শূন্য সৌন্দর্যও মানুষকে মোহিত করে। এই অভিনব যুদ্ধের মায়া-উপত্যকায় গতকাল ডিশ অ্যান্টেনা লেগেছে। বিশেষজ্ঞরা চিন্তাভাবনা করে ডিশের স্থান নির্বাচন করেছে। টি. ভি. সেট তো প্রায় প্রত্যেক কোম্পানিতেই ছিল — একটা-দু'টো। এতদিন জেনাবেটর চালিয়ে হিন্দি, ইংরাজি, নীল, বঙিন সিনেমা দেখা হতো। এখন সৈনিকরা দেখবে দূবদর্শন, স্টার টি. ভি., জি.টি.ভি. এম টি.ভির অনুষ্ঠান। শীতল সময়কে ভুলে থাকার চেষ্টা করবে।

সবাই এখানে আশায়-আশায় বেঁচে থাকে। একে অন্যকে আশ্বাস দেয়, দেখবি, এ যুদ্ধ থেমে যাবে!

—কবে ?

—এই তো আবার দু'দেশের কর্তারা গোলটেবিল বৈঠকে বসছে দিল্লি না ইস্‌লামাবাদে। ওদের কথা শুনে মনে হয় যেন, কালপরশুর মধ্যেই দুই দেশ সৈনিকদের সরিয়ে নেবে।

অলোকের বিশ্বাস হয় না। যুদ্ধ শুরু করা খুব সহজ। যুদ্ধ থামানো এত সহজ নয়। তবু কলের পুতুলরা স্বপ্ন দেখে। অলোকের মনে হয় ওরা সবাই অভিমন্যু। চক্রব্যূহে ঢোকার আগে কে কেমন ছিল সব—ভুলে গেছে। ঢোকার পর নিজের সঙ্গে চক্রব্যূহের সম্পর্ক যে কেবল জীবন দেওয়ার তা অনেক দেরিতে বুঝেছে। তবু একটা ক্ষীণ আশা অ্যামপ্লিফাই করে বেঁচে থাকা।

এই ডিশ অ্যান্টেনা ওর অবিশ্বাসকে আরো পোক্ত করে। সৈনিকরা এখন এক যুদ্ধের গভীরে আরো ব্যাপ্ত অন্য যুদ্ধে ডুবে যাবে। মোহাচ্ছন্ন দিন-রাত গোটা দেশ বা মহাদেশের মতন বিস্তৃত ভুগোলের সঙ্গে আবেগ-উৎকণ্ঠার তাৎক্ষণিকতার গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যাবে। যেখানে তথ্যের মিথ্যা দিয়ে নিয়ত তৈরি হচ্ছে শাসনের সত্য। আবহমান এমন সৃষ্টির মায়াজালে সমাজ ও জীবনের এক ভ্রান্ত সত্য পেয়ে যায় মানুষ। ভাবে এই সত্যই দেখাবে চক্রব্যূহ থেকে মুক্তির পথ। যারা এই মায়াজাল বুঝতে পারে, তাই আর কোন কবচকুণ্ডল থাকবে না। এই মিছি-মিছি লড়াই চলতে থাকবে।

কোন ব্যক্তি-সৈনিক এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে মুক্ত হবে ঠিকই, কিন্তু চক্রব্যূহ একই রকম রচিত হতে থাকবে। এনিয়ে কথা বলতে গিয়ে নাম্বুদ্রিপাদ বলে, লড়াই এখন পণ্য, বিধ্বস্ত বাগদাদের অসহায় শিশু, মায়েদের বিপন্ন চেহারা ও কণ্ঠস্বর যে-কেউ কিনে নিতে পারে, রহস্য কাহিনী বা বুল ফাইটের মতন উত্তেজনায় অন্ধকারে ইরাকে বোমাবর্ষণের জীবন্ত ছবি সৈনিককে ডুবিয়ে রাখে। সংবেদন পৌঁছে যায় এক অদ্ভুত অমানবিক বিচ্ছিন্নতায়। অজান্তেই বদলে যায় সব মানবিক ব্যবহার।

প্রত্যেকে মোহাচ্ছন্নের মতন কদম-কদম বাড়িয়ে যায়। কেউ মরুক কিম্বা কাউকে মারুক, মৃত্যু কিম্বা হত্যায় কী আসে যায়! সংশয়ের দোলায় সত্য ও মিথ্যা! এক পাল্লায় নপুংশকতা, অন্য পাল্লায় পৌরুষ। অস্থির কাঁটায় অর্ধসত্য। অলোকের মনে হয় কোনদিন এ যুদ্ধ থামবে না।

আজ কোন চিঠি তো নয় — একরাশ সোনাঝরা রোদ্দুর, একঝাঁক উড়ে বসা চিনেকাক। লেহ্‌তে আজ দু'টো এসেছে! এক সহকর্মী আর. টি. সেটে খবর দিয়ে হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। ও অন্য কয়েকজনের চিঠি আর. টি. তে পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা করে। অলোককে জিজ্ঞেস করলে ও মানা করে। চিঠি এরকম বেতারে শুনতে ভাল লাগে না। হয়তো সাধারণতম চিঠি — তবু!

সৈনিকদের স্ত্রী-রা সব এক ভাষায় লেখে। একটি গানের সুর ভেসে আসছে — ভলা সিপাহিয়া ডোগ্‌রিয়া ওহ্ — রশ্‌লিয়া রশ্‌লিয়া দারা — তেরি সোঙ রশ্‌লিয়া রশ্‌লিয়া ধারা — কিৎ তেরা বারা মন্দা লগ্দা ... পাশেই জম্মু ও কাশ্মীর রাইফেলস্ এর ব্যারাক। অলোক প্রায়ই শোনে। বারবার শুনে প্রতিটা শব্দ মুখস্ত। — ধারা দী চলে চলে — বল্কে দী ফুল চুনী যা — ভলা সিপাহিয়া ডোগরিয়া ... দো দিন ছুট্টিয়া আই যা — সুহানি রুৎ ফগনে দী — ভল সিপাহিয়া

ডোগরিয়া হো — অলোক শুনতে-শুনতে হাত নেড়ে বিদায় জানায় নাম্বুদ্রিপাদকে। কাল ভোরেই ও লিংকে চলে যাবে। অলোক ডোগরি গানে মনোনিবেশ করতে চায়। ও প্রিয় লড়াকু ডোগরা, অরণ্য-ঢাকা পাহাড় অপরূপ — শুধু তোমার কথা মনে করিয়ে দেয়। গাছপালা উদ্ধত-যৌবনা। তোমাকে মনোহর ফুল তোলার জন্যে ডাকে। অল্প দিনের ছুটি নিয়ে এই মনোরম বসন্তের আনন্দ উপভোগ করতে এসো। হিমশীতল খাঁ-খাঁ নির্জনতায় এই বসন্তের আহ্বান মন কেমন করে দেয়।

বিরহিনীর আকুতি গানের সুরে ভেসে বেড়ালেও সৈনিকের কোন উপায় নেই। হিমবাহে প্রতিপদে মৃত্যুর হাতছানি। স্ত্রী-র চিঠি, সন্তানে'র চিঠি, মায়ের আকুতি — একটিবার চোখে দেখার .. বিলাপ অনুরণিত স্বপ্নে ও জাগরণে। স্ত্রী'র ফটো বুকের পরিচয়পত্রে সাঁটা। ঐ হাসি পাথেয় করে সে অতিক্রম করে সমস্ত বিভীষিকা। পাহারায় কাটে বিনিদ্র রজনী। বরফ, জ্যোৎস্না, মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় কিম্বা তারাভরা, স্বপ্নভরা আকাশ নিয়ে এক-একটি বন্ধুর-মুহূর্ত, দিন-মাস-বছর কাটিয়ে দেয় ভাবী মিলনের ইচ্ছায়।

❑ চিটঠি আয়ি হ্যায়!

দু'হাতে দুই টিনভরা কাঁচা-বরফ নিয়ে তাঁবুতে ফিরতেই সুরিন্দর খবরটা বলে। রবিশংকর হাসবে না কাঁদবে! ও বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে জোরে-জোরে শ্বাস নেয়। চোখ বন্ধ করে। এভাবেই শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ। ছোট্ট পিংকুর চেহারা চোখে ভাসে। পিংকু এখন হয়তো আরো বড় হয়েছে। পাটনা থেকে লেখা শমিতার চিঠি এসেছে গতকাল।

চিঠির কথা ভাবতেই হাসি পেয়ে যায়। আগুণ লাগার পর এটিই ওব প্রথম চিঠি। শমিতার ধারণা রবিশংকরের চিঠি কেউ খুলে পড়ে। ভেজা-ভেজা চিঠি। শমিতা তো আর জানেনা ওরা চিঠি জ্যাম দিয়ে আটকায়। গরমে জ্যাম গলে গিয়ে হয়তো — শমিতার অক্ষরগুলিও কেমন ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে গেছে এতদূর আসতে।

গতরাতে হাবিলদার তপন মহান্তি চিঠিটা দিয়ে গেছে। ভুল করে চিঠিটা মেল অর্ডারলি আর্টিলারি টেন্টে রেখে এসেছিল। সেখানেও একজন সিপাহী রবিশংকর আছে।

—ক্যায়া ভাইসাহাব, ক্যায়া হুয়া? সুরিন্দরের ধাক্কায় চোখ মেলে তাকাতেই আবার মনে পড়ে যায় খবরটা! আপাতত এখান থেকে তো মুক্তি! ঝামেলা চুকলেই ছুটি। ওর তেমন তাড়া নেই। তবু সুযোগ পেলে মন্দ কী! ভাবতেই সমস্ত চেতনায় শিহরণ জাগে। পিংকু — পা-প্-পা — বলে অবাক চোখে তাকাবে, তারপরই লাফাতে শুরু করবে আনন্দে। শমিতার চোখমুখে থাকবে খুশির ঝিলিক!

তখনই আবার কী ভেবে অজানা আশংকায় বুক কাঁপে। ডকুমেন্ট অ্যাকশান পানিশমেন্টকে পরোয়া করে না ও। রেড ইংক এন্ট্রি তো আর চাকরি ছাড়ার পর বাড়ি নিয়ে যাবে না! ভয় পায় ফিজিক্যাল পানিশমেন্টকে। যদি এ বছরের ক্যাজুয়াল লিভ কেটে নেয়, অথবা কোন পোস্টে আবার পাঠিয়ে দেয় লাগাতর চার মাসের জন্যে!

নিজের চিঠির সঙ্গে শমিতা পিংকুর আঁকা কিছু ছবি খামে ভরে পাঠিয়েছে। একটা ছবি বেশ ব্যতিক্রম। তিনটে খারাপ মানুষ। সামনে বন্দুক হাতে ওর বাবা। সবার চেহারা প্রায় একইরকম। কারো বা মাথায় তিনটে চুল, কারো চারটে। সবারই থুতুনি থেকে একসারি বোতাম নেমেছে। দু'টো প্রায় সমান্তরাল রেখার মাঝে বোতামগুলো। দু'পাশের রেখাগুলি হাত আর নিচেরগুলি পা। হাত-পায়ে সমান আকারের পাঁচটা করে আঙুল। রবিশংকর ভাবে, ভাল আর খারাপ মানুষের আকৃতি তো একই রকম। শুধু ছোট্ট শিল্পীর মনে-মনে— বাবা ভাল আর ওরা খারাপ। যুদ্ধ চলছে। রবিশংকর সুরিন্দর ও রামস্বরূপকে ছবিগুলি দেখায়। ওর খুব ভাল লাগে ওদের প্রশংসা শুনে।

হাবিলদার মহান্তিও খুব প্রশংসা করে, বাঃ! ক্যায়া বাত হ্যায়! পণ্ডিতজীকা লেড়কা তো চিত্রকার বনেগা! ওর কথা শুনে রামস্বরূপ মাথা নাড়ে। রবিশংকরের খুব ভাল লাগে। মহান্তি নিজের ছেলের গল্প শোনায়। ও-ও আজ চিঠি পেয়েছে! ছেলেটা এত দুরন্ত হয়েছে যে ছুটে হাঁস-মুরগি-কবুতর ধরে ফেলে!

—হবেই তো! রবিশংকর বলে, আপনার ছেলে যে, আপনি এত বড় নিশানাবাজ! মহান্তির চোখ ছলছল করে ওঠে, ভাইসাহাব, আপনারা এত পড়ালিখা হয়েও এখানে পড়ে আছেন, আমরা তো আন্‌পড়, এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা — মহান্তির গলা বুঁজে আসে আবেগে! রবিশংকর ওকে জড়িয়ে ধরে তখুনি। এক শিশুর পিতা অন্য শিশুর পিতার আলিঙ্গনে! রবিশংকর ভাবে, সুঠাম শরীর ও প্রবল ইচ্ছা নিয়ে বীরদর্পে এই আর্টিলারি গানম্যানদের লিডার হিমবাহে চলাফেরা করে। ওদের সামনেই স্ট্র্যাটেজিক কারণে একটা পাহাড়-চূড়া থেকে বেরিয়ে থাকা বরফাবৃত নাক ও একটি মাত্র গোলায় ভেঙে ফেলেছে।

এখানে এক জায়গায় থাকলেও ওদের জীবন অপেক্ষাকৃত কঠোর। শত্রুর শেল আসতে শুরু করলেই সবাই যখন বরফের গুহায় শেল্‌টার নেয়, ওরা তখন দ্রুত অ্যাঙ্গেল পাল্টে পাল্টা শেলিং-এর প্রস্তুতি নিতে থাকে। আর এখানে শেলিং-পাল্টা শেলিং তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার! এর মধ্যে থেকেও তপন মহান্তি একজন ভাল গায়ক। পঙ্কজ উধাসের গানগুলি হুবহু গাইতে পারে। ওর ব্যাটেলিয়নে নাম আছে? ব্যাটারিতে ও সম্মানিত। কেন্দ্রিয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রি পরিদর্শনে এলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও নাকি তপন কয়েকটা গান গেয়েছে। একবার এক জেনারেল সাহেব তপনের একই গান তিনবার শুনেছে অনুরোধ করে! সেই যে— চিট্‌ঠি আয়ি হ্যায়, আয়ি হ্যায়, চিট্‌ঠি আয়ি হ্যায় ...।

প্রবাসে 'বড়ে দিনো কে বাদ বতন কি চিট্‌ঠি' পাওয়ার আকুতি সৈনিকের চাইতে বেশি করে আর কে অনুভব করবে! সুরিন্দর-রামস্বরূপের অনুরোধে তপন মহান্তি এখানেও ঐ গানটিই গেয়ে শোনায় আবার। সুরিন্দার স্টোভে চা বানিয়ে বিস্কুটের সঙ্গে খেতে দেয়। খেতে- খেতে অনেক গল্প হয়। তপন হিমবাহ সংক্রান্ত অনেক অভিজ্ঞতা শোনায়। গল্পে-গল্পে কয়েক-ঘন্টা পেরিয়ে যায়। ফরোয়ার্ড পোস্টগুলিতে গোলন্দাজ সৈনিকরা থাকে পদাতিক বাহিনীর মুভমেন্ট ও শত্রু-সৈন্যের মুভমেন্ট অনুযায়ী বেসে ফায়ারিং ডিমাণ্ড পাঠানোর জন্যে। বিভিন্ন খাঙ্গরি ও

লা'তে ছড়ানো এই যুদ্ধ তাল-তাল বরফের সমুদ্রে কামানগুলির ভূমিকা অপরিসীম।

কয়েকদিন ধরে অবশ্য গোলা বিনিময় হচ্ছে না। সবাই বলছে, যুদ্ধ থেমে যাবে! সুরিন্দর বলে, তুমি তো আপাতত ছাড়া পেয়ে গেলে, আমার নসীবটাই খারাপ! রবিশংকর কী বলবে! সিনিয়ার বলে ওকেই আগে যেতে হচ্ছে। সুরিন্দর আগে এখানে এসেছে। নিয়ম মাফিক ওরই আগে ফেরার কথা। সেজন্যে সুরিন্দরকেও সান্ত্বনা দিতে হচ্ছে। কিন্তু সান্ত্বনার কোন বাক্যই রবিশংকর সম্পূর্ণ করতে পারে না। কোন শব্দই যথাযথ মনে হয় না। সুরিন্দর কখনো আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে, আবার কখনো চুপচাপ বরফ দেখে।

সাদা-বরফ, কালো-বরফের পাহাড়, ছোট-ছোট টিলার মতন অজস্র শৃঙ্গ। কালো বরফের দু'পাশে বিশাল-বিস্তৃত সিয়াচেন। পূর্বে হিমবাহের পর আবার কালো বরফের পাহাড়। দূর থেকে প্রায় কারাকোরামের শৃঙ্গগুলির সমান-সমান উচ্চতা মনে হয়। পশ্চিমে হিমবাহের পরই সুউচ্চ সালতোরো রেঞ্জ। এয়ারফোর্সে ঢোকার আগে কোনদিন বরফ কিম্বা পাহাড় দেখেনি সুরিন্দর।

এ সময় সুরিন্দরদের ক্ষেতে জৌ আর গম। হরিয়ানার রেওয়ারি থেকে চার কি-মি দূরে ভুদপুর গ্রাম। এ সময় প্রতি-বছরই ও ছুটি যায়। বাৎসরিক ছুটিটা ফসল কাটার সময়েই নিতে হয়। এ সময়ে যার যত লোকবল সে-ই তত ফসল ঘরে তুলবে। লাঠি-গুলি সবই চলে ফসল কাটার সময়। ভাগচাষী-জমিদার লড়াই হয়। মজুররা মাথা গরম করে। ভাইয়ে-ভাইয়ে অব্দি রক্তারক্তি হয়ে যায়। ওদের পরিবারে অবশ্য এখনো তেমন কিছু হয়নি। তবু বাবা যেতে লিখেছে। কিন্তু ওর আর যাওয়া হলো না। বাবার চিঠিটা ও স্যুটকেসের সঙ্গে পুরেছে। এখন আর আগের মতন মেহনত করতে পারে না বাবা।

গতবছর বাবা ওকে রাজস্থান পুলিশের প্রাক্তন সহকর্মীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। চৌদ্দ দিন পরই ছুটি থেকে ফিরতে হয়েছে। বাপের বাড়ি থেকে নববধূর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার চাইতেও অনেক বেশি কষ্ট 'নয়ী দুলহন'কে ঘরে রেখে যুদ্ধে যাওয়া। আগেকার দিনে রাজপুত জাঠ রমণীরা আবীর দিয়ে জয়টীকা এঁকে দিত। দেবকিও ওকে জয়টিকা দিয়েছে। চোখের জল মিশেছে আবীরে। তার আগে ভোররাতে সোহাগবেষ্টনী ছাড়িয়ে সারারাতের মিলনসুখে ধ্বস্ত মেয়েটি সারা শরীরে ঠোঁট ছুঁইয়ে ওর চুম্বন রক্তধারায় মিশিয়ে দিয়েছে। ভাবলে আজও রোমাঞ্চিত হয় সুরিন্দর। দূর থেকে একটি হিমবাহের ফাটলকে প্রায়ই মনে হয় মানুষের ঠোঁট। ভ্রম ভাঙার জন্যে কখনো কাছে যায়নি সুরিন্দর। হরিয়ানার শীতে সারারাত জাগার পর জানালা খুললে সেই সকালের প্রথম রৌদ্রকিরণে দেবকীর হাই তোলা ঠোঁট যেন। তেমনি সাদা বাষ্প! হিমবাহের ঠোঁটে সেই উষ্ণতা কোথায়?

— ছিল। সুরিন্দর চমকে দেখে হিমবাহের ঠোঁট নড়ছে। — আমার গহ্বরে এখনো অনেক জলহস্তী, প্রাগৈতিহাসিক মাছ ও উদ্ভিদ অবিকৃত রয়েছে! মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে হিরোশিমা-নাগাসাকির ছাই এখানে কালো পাহাড় বানালে অতীতের সঙ্গে আজকের ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়। গত আট বছরে কিছু হতভাগা সৈনিক ও কুকুর— নিষ্প্রাণ শুয়ে আছে আমার মুখে —

সুরিন্দর ভয় পেয়ে যায় । তাড়াতাড়ি ডেরায় ফিরে আসে । বেশিক্ষণ ফাটলের সঙ্গে কথা বললে পাগল হয়ে যাবে ও । রবিশংকর ব্যাগ গোছাচ্ছে । এই ব্যাগটা বেস ক্যাম্প থেকে পাঠিয়েছে সার্জেন্ট মিত্র । সে সুরিন্দরের জন্যেও একটা ব্যাগ কিনে আনছে । রবিশংকরকে রিলিভ করবে মিত্র সাহেব ।

বাবার চিঠিতে ছিল আনন্দসংবাদ । নবজাতকের ফটোও ছিল । বাবা লিখেছে — সবাই রাজিখুশি ! যা লেখেনি সুরিন্দর তাই ভাবছে । দেবকি নিশ্চয়ই পথ চেয়ে বসে, কবে নবজাতককে দেখাবে ! হিমবাহ থেকে দীর্ঘশ্বাস ওঠে । ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায় তাঁবু । বরফ - ভরা ঝুলন্ত জেরিক্যানগুলি একে অন্যের গায়ে ঠোক্কর খায় । গত আগষ্ট মাসে ওর জীবনে প্রথম অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল । সেখানে সঙ্গী ছিল এই সার্জেন্ট মিত্র । সেই ভদ্রলোক এখানে আসছে, এক কষ্টের মধ্যে এইটুকুই সান্ত্বনা ।

রামস্বরূপের কাছে ও দড়ির গিঁট শিখেছে । প্যারাশুটের দড়ি দিয়ে ছেলেকে ঝোলানোর জন্যে ঝোলা বানাবে । এখানে তাঁবুর এ মাথা — ও মাথায় লোহার ডাণ্ডা টাঙিয়ে ঐ দড়ি দিয়েই পর্দা বানাচ্ছে । পর্দার মধ্যে ভাবনাচিন্তা করে গিঁট দিয়ে ছেলের নাম লেখে, দীপক ! নাম লেখা হলেই ভীষণ সুন্দর লাগে পর্দার উপরটা ! সারি-সারি দীপক দিয়েই দীপমালা । দীপমালায় জ্বলজ্বল করছে দীপক নামটি । হাতের পোড়া ঘা অনেকটা শুকিয়েছে ।

এ বছরের মতন দীপাবলী যেন কারো জীবনে না আসে ! হাতের তেলোর দিকে তাকিয়ে থাকে সুরিন্দর । মানুষের হাত এগুলি ? নিজের হাত টিপে টিপে দেখে সে । আঙুলগুলোতে কড়া পড়েছে । পোড়া ঘা শুকোলে হাতের তেলো দু'টি কেমন হবে ? নরম ভাবে ধরতে পারবে তো ?

রবিশংকরের ব্যাগ গোছানো সারা । কিছুই তো আর বাকী রাখেনি আগুণ । সুরিন্দর ওকে ঘুমোনোর জন্যে তাড়া দেয় । রাত দশটা প্রায় । পেচ্ছাব করার সময় আকাশ দেখে সুরিন্দর । আকাশ পরিষ্কার থাকায় চতুর্দশীর চাঁদ আজ বরফের পাহাড়ে, হিমবাহে প্রতিফলিত হয়ে সহস্র চাঁদের স্বপ্নপুরী বানিয়ে দিয়েছে । যে-দিকে চোখ যায় এক ঠা-ঠা সৌন্দর্যের মায়া ওকে আচ্ছন্ন করে ।

শোঁ-শোঁ প্রবল অসহ্য ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপটে একদঙ্গল ইয়েতির পদধ্বনি শোনা যায় । সুরিন্দর তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকে জুতো খুলে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ে । আবহাওয়া ভাল থাকলে কাল সকালে রবিশংকরকে নিয়ে হেলিপ্যাডে যেতে হবে ।

রামস্বরূপ প্যারাশুটের দড়ি দিয়েই বিশাল এক রশ্শি বুনছে তাদের মক্কাক্ষেতের পাশে গভীর অন্ধকার কুয়ার পাতাল থেকে জল তোলার কথা ভেবে । মাইনাস চল্লিশের ঠাণ্ডায় বসে প্লাশ আটচল্লিশের আগুণে রোদ আর তৃষ্ণার কথা ভেবে বেঁচে থাকা । রামস্বরূপ এখানে সুরিন্দর ও রবিশংকরের বাঁচার প্রেরণা ।

বাইরে ঘুরে এসে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে রবিশংকর দেখে রামস্বরূপ ওদের উচ্ছিষ্ট খাবারগুলি একটা খালি আমুল স্প্রের ডাব্বায় গুছিয়ে রাখে । সকালে কাকেদের খাওয়ানোর জন্যেও এই

খাবার রাখা এখন ওর প্রতিদিনের অভ্যাস ! এখন হাসতে-হাসতে বলে, কাল তুমি বেরিয়ে যাও তারপরই দুশমনকে একহাত দেখে নেবো ! আজ মহান্তিসাব আমার কথা মানতে রাজী হয়েছে । হাবভাবে মনে হয়ে ও-ই ব্রিগেড কমান্ডার !

এরকম আশা নিয়ে সবসময় প্রাণবন্ত থাকে লোকটা । এখন বেরিয়ে গিয়ে জেনারেটরটা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় । সুরিন্দর টর্চ জ্বেলে আলো দেখাতে থাকে ! রামস্বরূপ দরজাটা ভাল করে আটকে দেয় । ওরা মুখ ঢাকে ! আহা বিছানা !

রামস্বরূপ ওর তাঁবুতে গিয়ে এখন কুপি জ্বালিয়ে স্টোভ জ্বালাবে । তারপর জুতো মোজা খুলে পা সেঁকবে । অবশেষে স্টোভ বন্ধ করে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়বে ।

❑ দিন যায়, রাত আসে নীল হয়ে

পাঁচ দিন ধরে আবহাওয়া খারাপ । আজকাল অলোক প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখে । ঘুমিয়ে দেখে, জেগে-জেগে দেখে । সবার চেহারা অস্পষ্ট । ও যাকেই ছুঁতে যায়, সবাই যেন কানামাছি খেলে। জলপ্রপাত, আকাশ আর পাহাড়ে মেঘ ও রোদের জাদু, সূর্যাস্ত এবং চন্দ্রোদয়, মেঘ ও চাঁদের লুকোচরি ওকে থেকে-থেকে আনমনা ক'রে দেয় । স্বপ্ন আর সময় একাকার হয়ে যায় ।

সৌন্দর্য এখানে বিরক্তিকর একঘেয়ে বাধ্যতারই অন্য নাম । লেহ্‌তে অন্তরা ও তোড়াকে নিয়ে আসতে পারলে কিছুদিন অন্তত ব্যতিক্রম কাটবে । সহজে হিমবাহে পাঠাবে না অথরিটি । এবার গিয়েই ওদেরকে নিয়ে আসার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে হবে । টেরাঙ-টক্‌পোয় চলতে-চলতে উপত্যকা থেকে আড়াই-তিন হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছে দেখতে পায় বাঁ পাশে কালো টিলাগুলির মাঝে-মাঝে নীল সরোবর । এই গ্লেসিয়ার ডিপোজিটগুলি থাকে না । চুঁইয়ে ধীরে-ধীরে নুব্রায় নেমে যায় ।

বরফ গলছে বলে জলপ্রপাতগুলি সশব্দ এবং সুন্দরী । বিলেটের সামনে দিয়ে যে নালাটা গিয়ে নুব্রায় পড়েছে তার শব্দ কুলকুল । সকালে মৃদু, দুপুরে বাড়তে-বাড়তে বিকেলে প্রচণ্ড হয় নুব্রা । গোর্খা জোয়ানরা সামনের নালায় পি. এস. পি. শিটের লোহার সেতু বানিয়েছে । মাঝে-মাঝে কয়েক জায়গায় তেলের ব্যারেল কেটে তার নিচে পিটে আগুণ ধরিয়ে যেমন গ্রেফের লোকেরা পিচ ও পাথরের গুঁড়ো গরম করে তেমনি ব্যারেলে শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে জল গরম করা হচ্ছে । নালার হিমশীতল জলে ঐ গরম জল মিশিয়ে স্নান ও শৌচকর্মে ব্যাবহার করে, জামাকাপড় থালাবাসন ধোয় । বছরে আট মাস বরফ জমে থাকে বলে এই সুবিধা থাকে না । সেতুর-ও দরকার পড়েনা । নালা পার হয়ে একটু এগোলেই হেলিপ্যাড । প্রতিদিন দশ-বারোবার পারাপার করতে হয় ।

ফরোয়ার্ড এরিয়া থেকে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেয়ে অলোক ওর স্যুটকেস ও বেডিং হেলিপ্যাডের কাছে নিয়ে রাখে । আরো দু'ঘন্টা আগেই উড়ে যাওয়া যেত । আজ সকাল আটটা থেকেই আকাশ পরিষ্কার । কিন্তু পৌনে দশটায় হেলিকপ্টার এসে এখানে নামার আগেই ওরা

ফরোয়ার্ড এরিয়ায় ভয়ংকর গোলা বিনিময়ের খবর পায় । ছ'টি পোস্ট থেকে ফায়ারিং ডিমান্ড আসে । এমন কি বোফর্স ফায়ারিং -এর মারাত্মক আওয়াজও শোনা যায় । বোফর্স এখান থেকে কত দূরে ! সাড়ে বারোটা অব্দি হেলিকপ্টারগুলি লোড নিয়ে অপেক্ষা করতে-করতে যখন ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি, তখন্ বেস কমান্ডার নিজে এসে পাইলটদের খবর দেয়, এখন আর শেলিং হচ্ছে না, কয়েকটা পোস্টে এয়ার মেন্টেন্যান্স না করলেই নয় ! পাইলটরা এককথায় রাজী । পরপর ছয় সর্টি লাগিয়ে এখন ওরা ফিরছে । আবার গোলা বিনিময় শুরু হয়ে গেছে ।

গ্রীষ্মে লেহ্ উপত্যকা সবুজ । বিলেটের সামনে দু'টো খুরবানি গাছ পল্লবিত । কোন সহকর্মী কারগিল থেকে এনে লাগিয়েছে । অনেকদিন পর মেসের টেবিল-চেয়ারে দুপুরের খাবার । অনেকদিন পর পালঙশাক । দু'-তিনবার চেয়ে নিয়েছে অলোক । ঘুরতে বেরিয়ে দেখে এক অন্য সিন্ধুনদ । ঝুলন্ত সেতুর উপর গিয়ে আবার দাঁড়ায় । দু'পাশে সবুজের সমারোহ । পাইন, খুবরানি, নানা মরসুমি ফুল ও আপেলের বাগান । কোন্ জাদুমন্ত্রে যেন উপত্যকা জেগে উঠেছে । অবিশ্বাস্য !

ফেরার সময় এক আপেল বাগানের পাশে কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে দেখা । এক থলে বৃন্তসহ আপেল নিয়ে ফিরছে । হাত ধরে ছোট্ট কন্যা । আলোককে উইশ্ করতে দেখে মেয়েটি হাঁ করে তাকায় । হয়তো দাড়িগোঁফ দেখে ভয়ে বাবার পেটে মুখ লুকোয় । চকোলেটবার দিয়ে বন্ধুত্ব করতে হয় । মেয়েটি বলে, তোমার দাঁত হলদে, গায়ে দুর্গন্ধ ! ওর বাবা হেসে ফেলে । এই স্পষ্ট প্রতিবাদ অলোকের ভাল লাগে । ও বলে, আগামীকাল তোমার সঙ্গে দেখা করবো তখন দাঁত ঝকঝক করবে, আর গায়ে সুন্দর গন্ধ হবে ! কমান্ডিং অফিসার হো-হো হাসতে থাকে । অলোক একবার ভাবে, ছুটির কথা বলবে, পাশাপাশি অন্তরা ও তোড়াকে নিয়ে আসার পারমিশান । কিন্তু বলতে পারে না ! নিজেকে মনে হয় কাবুলিওয়ালা আর মেয়েটি ছোট্ট মিনু ! এখন কি কোন স্বার্থের কথা বলা চলে !

বিলেটে ফিরে জৈনসাহেবের কাছ শোনে জয়ন্তকে আর হাই অলটিচিউডে কাজ করতে হবে না। চণ্ডিগড়ে মেডিক্যাল বোর্ড হয়েছে । হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগেই বদলির সিগন্যাল এসে গেছে । গতকাল ও লেহ্ এসেছে । নিজস্ব জিনিসপত্র নিয়ে চণ্ডিগড় যাবে ।

কলিতারও বদলির সিগন্যাল এসেছে আজই । কলিতা যাচ্ছে জোরহাট । দু'জনকে উপহার দেওয়ার জন্যে ক্যান্টিন থেকে একটি করে নন্ স্টিকিঙ তাওয়া কেনা হয়েছে । পরদিন রাতে ফেয়ারওয়েল পার্টি । — কোথায় ওরা এখন ?

— এই ফিরলো বলে, লেহ্ গেছে ফাইন্যাল পার্চেজ অফ লাদাখ— স্পেশাল হ্যান্ডিক্রাফ্টস্!

পরদিন সকালে শেভ করে, স্নান সেরে অলোক ঝরঝরে । অনেক দিন পর সিভিল জামাকাপড় পরে শহরে যাবে অলোক । স্যুটকেস খুলে দেখে জামাকাপড়ে ন্যাপথালিনের গন্ধ প্রকট । ন্যাপথালিনের গুলিগুলো টিকটিকির ডিমের মতন ছোট হয়ে গেছে । স্মৃতিমাখানো প্রতিটি জামাকাপড় চাপে থেকে ইস্তিরির কড়া দাগ প্রকট । ন্যাপথালিনের সঙ্গে স্মৃতির এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আগে অনুভব করেনি ।

নীল জিনস্ আর আসমানী শার্টের ওপর সাদা সোয়েটার। গার্ডরুমের পূর্ণ দৈর্ঘ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় — বয়স অনেক বেড়ে গেছে ! জৈনসাহেব পাশে এসে দাঁড়ালে অলোক ভাবে— ও মজা করবে। কিন্তু অলোক সরে দাড়াঁতেই সম্পূর্ণ আয়না দখল করে নানা ভঙ্গিতে নিজেকে দেখতে থাকে। অলোকের মনে হয় — স্বার্থপর ! দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। মেয়েদের মতন ঘুরে-ফিরে দেখছে নিজেকে।

কোন অভিনেতা মঞ্চে ওঠার আগে যেমন দেখে ! যেন নেমন্তন্ন খেতে যাবে ! হাসি পায়। তখুনি মনে পড়ে, একটু আগে সে নিজেও দেখছিলো। ও স্বাভাবিক হয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করে। তখুনি ওকে অবাক করে দিয়ে জৈনসাহেব পেছনের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাঁচি বের করে একটু গোঁফ ছেটে নেয়। চিরুনি বের করে পরিপাটি করা চুলে ফাইন্যাল টাচ্ দেয়। জৈনসাহেবকে সত্যি খুব সুন্দর লাগছে।

বাস-স্ট্যান্ডে নেমেই দেখে মিছিল। অলোক অবাক। লাদাখে মিছিল দেখবে কল্পনাই করেনি। পোস্টারগুলিতে লেখা — 'ফ্রী লাদাখ ফ্রম কাশ্মীর' এবং 'লাদাখ ইজ ফর লাদাখিজ' ইত্যাদি। ওরা ডেভেলাপমেন্ট কমিশনারের অফিসে গিয়ে দেখে সমস্ত কর্মচারিরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। যেন কিসের প্রতীক্ষা। শুধু ডি. সি. সাহেব রুমে বসে কারো সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলছে। সম্ভবত টেলিফোনে। মাঝে-মধ্যে টুকরো কথা ভেসে আসছে। পোলো গ্রাউন্ড ..... সমাবেশ .... দার্জিলিং টাইপ পার্বত্য পরিষদ .... । অলোক বুঝতে পারে, লাদাখ সমস্যা নিয়ে দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা হচ্ছে।

বেস ক্যাম্পে ছিলিঙ পানচুক জানবাক এবং অন্য পোর্টার লিজ্জো নামগিয়ালের মুখে অনেক সমস্যার কথা শুনেছে অলোক। ওরা লাদাখ বুদ্ধিস্ট অ্যাসোশিয়েশানের সদস্য। সভাপতি থুপস্তান ছেবাঙকে ওরা ভালবাসে। ছেবাঙ আগে পর্যটন বিভাগে চাকরি করতো। বিয়ের পর চাকরি ছেড়েছে। বিয়ে করেছে স্তোক রাজকুমারীকে। মিছিল এসে ডি. সি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লে তিন নেতা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে। অলোককে অবাক করে দিয়ে ছেবাঙ হাসে। সানগ্লাস খুলে বাঁ হাতে নিয়ে ডান-হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দেয়, হাউ আর ইউ মিস্তার মিতরো ?

—আই এ্যাম ফাইন, থ্যাংক ইউ ! অলোক মনে মনে ভাবে, এই না হলে নেতা ! ছেবাঙ হেসে এল. বি. এ'র সাধারণ সম্পাদক রিগজিন জোরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। পাশেই গৈরিক পোশাকের উপর মাথায় লাল টুপি, চোখে কালো চশমা — লামা থিক্‌সে রিম্পোশে, থিক্‌সে গুম্ফার অধ্যক্ষ, অল লাদাখ গোম্পাজ অ্যাসোশিয়েশানের সভাপতি। ছিলিঙ পানচুক ও লিজ্জো নামগিয়ালের কাছেই অলোক-এর ফটো দেখেছে। ওরা বলে খান্‌পো রিম্পোশে। থিক্‌সে গুম্ফায় এর পূর্ববর্তী কয়েক জন্মের মৃতদেহ রাখা আছে ? পানামিক সুছান্ — উষ্ণ প্রস্রবণে স্নানের পর তোলা খান্‌পোর ফটোর কপি ওরা বুক পকেটে রাখে।

কচি লামা, যুবক লামা, পৌঢ় লামাদের ধর্মীয় পোশাকের নিচে বিদেশি জুতো। চোখে বিদেশি সানগ্লাস। অলোকের হাতে একটা ইংরেজিতে ছাপা লিফলেট ধরিয়ে তিন নেতা ডি. সি.

-র কামরায় ঢুকে যায় । লিফলেটে মূল দাবি পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন । দেশের বৃহত্তম জেলায় একটাও ডিগ্রি কলেজ নেই । জনসাধারণের এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধ পীড়িত । তবু রাজ্য - সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সৎমায়ের মতন । নানা বয়সী লামারাও সাধারণ মানুষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্লোগান দেয়। লামাদের মুখে স্লোগান শুনবে স্বপ্নেও ভাবেনি অলোক । যুদ্ধ এমনি সব ব্যতিক্রম দৃশ্য সৃষ্টি করতে পারে !

কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতারা গম্ভীরমুখে ডি. সি.র কামরা থেকে বেরিয়ে আসে । তারপরই হাত মুঠি করে শূন্যে নিক্ষেপ করে । সমবেত ভিড় আরো জোরে স্লোগান দিতে শুরু করে । ডি. সি. অলাদাখি বলে এবং হয়তো দেশি-বিদেশি পর্যটকদের শুনিয়ে ইংরেজি স্লোগান ।

হাইড্রেল প্রজেক্ট, অল ওয়েদার জাতীয় সড়ক, লোকসভায় বেশি প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি দাবি। অলোক ও জৈনসাহেব লেহ্‌তে ফ্যামিলি আনবে বলে ডি. সি. অফিস থেকে এয়ারলিফ্‌ট ফর্ম নিতে এসেছে। কিন্তু কর্মচারীরা মনোযোগ দিয়ে ভিড় দেখছে । ওরা জিজ্ঞাসা করলে একজন গম্ভীরগলায় বলে, কাম তুমোরো !

আজ ওদের বিন্দুমাত্র সময় নেই । সামনেই বিশাল ধর্মচক্র । পর্যটকের ভিড় উপচে পড়ছে। শ্রীনগরে ঝামেলা শুরু হওয়ার পর থেকে অনেক ভারতীয় পর্যটকও গ্রীষ্ম কাটাতে আসে। সৈনিকরা দল বেঁধে শহর দেখতে বেরিয়েছে । অথবা মেয়ে দেখতে । রেস্টুরেন্টগুলিতে ভিড়। ধর্মচক্রগুলি লোকসমাগমে এখন প্রবল গতিতে ঘুরছে । কেউ বা জোরে বলে, ওঁম মণিপদ্মে হুম, ওঁম মণিপদ্মে হুম... কেউ আবার নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে ধর্মচক্র ঘোরায় । অলোকের চোখ চঞ্চল । পরিচিত কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ।

জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ তিব্বতি শরণার্থী ও তাদের বংশধর । তিব্বতি ও লাদাখিরা পরস্পরের সঙ্গে হিন্দিতে ভাব বিনিময় করে । শিশুরা ছোটবেলার খেলার সময়ই মাতৃভাষার পাশাপাশি হিন্দিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে । ফুটপাথে ইংরেজিতে 'ফ্রী লাদাখ' লেখা নানা রঙের টি - শার্ট বিক্রি হচ্ছে । স্থানীয় শাকসব্জি, বাদাম, কাজু ও খুরবানির পসরা সাজিয়ে রাস্তার দু'পাশে প্রৌঢ় ব্যবসায়ীরা । মেয়েরা আপেল ও কলা বিক্রি করছে । ওদের কাছেই সৈনিকদের ভিড় বেশি । স্থানীয় উৎপাদন আকারে ছোট কিন্তু রসালো । ওরা হাসিমুখে সারা-বছরের রোজগার করে নেয় ।

ফেয়ারওয়েল পার্টির হৈ-হৈ, নাচগান, খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা মিউজিক টি. ভি. -র উদ্দাম নাচ দেখে । অলোক জয়ন্ত'র ট্রাঙ্ক স্যুটকেস গোছাতে সাহায্য করে । ও আগামীকাল চলে যাবে । পার্টির পরই কলিতা আর নন্দ সিং বাইরে বেরিয়ে গেছে । জৈনসাহেব ও সার্জেন্ট দুবে একটা চারপাইয়ের দু'দিকে বসে ক্যারাম খেলছে । ওরা দিন গুণছে— কবে পোস্টিং আসবে ! দুবেসাহেব আগামীকাল বেসক্যাম্পে যাবে ।

রাত নয়টা । বাইরে পেচ্ছাব করতে বেরিয়ে শোনে লাদাখি লোকগীতির সুর । জুলে ক্যান্টিন থেকে ভেসে আসছে গান । আজ অব্দি যেখানেই ছিল, স্থানীয় ভাষা ও গান বেশ শিখেছে অলোক । কিন্তু লাদাখে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশার সুযোগ পায়নি বলে দু'-

একটা সৌজন্যমূলক সম্বোধন ছাড়া আর কিছুই শেখা হয়নি। ওর খারাপ লাগে। বিলেটে তখনো এম. টি. ভি চলছে। মাইকেল জ্যাক্‌সনের গানের সঙ্গে অর্ধউলঙ্গ নারীপুরুষ উদ্দাম। সার্জেন্ট দুবে উঠে চ্যানেল পাল্টে দূরদর্শনের খবর ধরে। কোথাও খরা, কোথাও বন্যা, কোথাও ধ্বংস, কোথাও মৃত্যু আর সবকিছু ছাপিয়ে উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদের ঢালাও ব্যবসা। মুসলমান মৌলবাদীরা বলছে অযোধ্যায় রামমন্দির হবে না। বিশ্ব হিন্দু-পরিষদ বলছে বাবরি মসজিদ ভেঙে দেব! বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত। রাজনীতিজ্ঞরা ঝোপ বুঝে যে যার মতন কোপ বসাচ্ছে। এই আমাদের দেশ! এই সব নোংরা লোকেদের দেশকে রক্ষা করার জন্যে হিমবাহে এত কষ্ট করছে সৈন্যরা। ঝাঁকে ঝাঁকে মারা যাচ্ছে প্রতিদিন। অলোকের ঘেন্না করে। ওরা শুতে যাবে তখনই কলিতা ও নন্দ সিং ভি. সি. পি. ও ক্যাসেট নিয়ে ঢোকে। ডিশের কানেকশান সরিয়ে কার্ডে ভি. সি. পি. লাগাতেই রঙিন পর্দায় অন্যতর দৃশ্য। একটি ফুলের বুক থেকে দু'টি ভ্রমর মুখ তুলতেই দেখা যায় পুরুষের মুখ আর খোলা স্তন।

স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে অলোক শুধু মাথাটা বাইরে রাখে। নিমেষে মন থেকে বাইরের জগৎ সরে যায়। পাঁচ মিনিটেই শরীর গরম। কানে ঝিঁ-ঝিঁ। শিরা-উপশিরায় রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয়। কপালের দু'পাশে দপ্‌দপ্ দপ্‌দপ্। ও স্লিপিং ব্যাগের ভেতর মাথা ঢোকায়। কিন্তু উচ্চকিত শীৎকারের শব্দ সমস্ত চেতনা অবশ করে দেয়। ও স্ফীত, দৃঢ় হয়। অসহ্য লাগে। ও কানে আঙুল চাপা দেয়। ওরা সবাই এতক্ষণ ধরে সহ্য করছে কেমন করে! অলোকের বন্ধচোখেও চলতে থাকে দুই কৃষ্ণপুরুষ ও এক শ্বেত রমণীর ওরাল সেক্স ও আরো সব বিকৃত যৌনক্রীড়া। চেষ্টা করেও এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে ও অন্তরাকে মেলাতে পারে না। উত্তাপে ছটফট করে।

একসময় চরম উত্তেজনায় স্লিপিং ব্যাগ মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে। তখন দেখে অন্ধকার। কখন আলো চলে গেছে। একজনের নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। কে সেই মহাপুরুষ? অন্য সবক'টা চারপাইয়ে উথাল-পাথাল চলছে। মচর-মচর শব্দ।

দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখে স্পিতুক গুম্ফার উপর ঘন মেঘ। সারা আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া হাই ক্লাউড। চাঁদ মেঘের আড়ালে। আগামীকাল আবার আবহাওয়া খারাপ হাওয়ার আশংকা জাগে। তখুনি মনে হয় আজ দূরদর্শনে যে স্যাটেলেইট পিকচার দেখিয়েছে সে অনুযায়ী তো কাল এরকম হওয়ার কথা নয়। অলোক আবার আকাশের দিকে তাকায়। ভাল করে দেখে। স্পিতুক গুম্ফার উপর স্ট্র্যাটো কিউমুলাস ক্লাউড। এছাড়া যাদের হাই ক্লাউড ভাবছিলো এতক্ষণ — দ্রুত ভেসে যাচ্ছে অথবা ডানা নেড়ে উড়ে যাচ্ছে। এত রাতে আকাশে পাখির ঝাঁক কোনদিন দেখে নি অলোক। চোখ কচলায় ও। এক শ্বেতাঙ্গিনীর যোনী ও স্তন-যুগল মেঘের টুকরোর মতন সারা আকাশে! ও কি পাগল হয়ে যাবে! ওর কান্না পেয়ে যায়। প্রতিজ্ঞা করে আর কোনদিন ব্লু দেখবো না।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতল হয়ে আবার বিলেটে ফিরে অন্ধকার মেঝে থেকে স্লিপিং ব্যাগ তুলে নেয়। দু'একজন এখনো সশব্দে ছটফট করছে। ঘুমোতে গিয়ে অলোক চেষ্টা করে অন্তরাকে

ভাবতে। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও বিফল হয়। একী হলো ? এক শ্বেতাঙ্গিনীর যোনী ও স্তনযুগল থেকে কোনমতেই রেহাই পায় না। ও তখন ভাবতে শুরু করে, অন্তরা মরে গেছে — অলোক মরে গেছে — ও এখন সংযমহীন এক কামুক পুরুষমাত্র। এরকম ভাবনায় ও ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

❑ ফ্রন্টে মূষিক পেছনে মার্জার

আবার বেসক্যাম্প। এখন শুধু পাহাড়ে বরফ। নদীর দু'পাড়ে এবং শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে নেমে আসা জলপ্রপাতের দু'দিকে সবুজ। লাদাখি গোলাপের গাছগুলি বড় বড় এক মানুষ দুইমানুষ সমান উচ্চতা। লাল, গোলাপি ও ফ্যাকাশে ফুল। সার্জেন্ট দুবের টেলিগ্রাম আসায় অলোক এত তাড়াহুড়ো করে রিলিভ করতে এসেছে। গ্রামে দুবে সাহেবের বিষয় সম্পত্তি বেদখল হয়েছে। বিদায় জানিয়ে বিলেটে ফেরার সময় শোনে ঢাকের শব্দ। বুকটা কেমন করে ওঠে। এখানে কে ঢাক বাজায় ? দুবেসাহেব বলে, মারাঠা রেজিমেন্ট নুব্রার ওপারে গণেশ-পূজা করেছে। বিলেটে ফিরে নিমন্ত্রণপত্র পায়। সারা দুপুর চিঠি লেখে। ঢাকের শব্দ আর কাঁসরের বাজনা সব চিঠিতে ঢুকে যায়। বিকেলের দিকে হঠাৎ সর-সর শব্দে নিমন্ত্রণপত্রটা চলতে শুরু করে। আর একটু হলেই ওটা ইঁদুরে নিয়ে যেত। রাকেশ কৌশিক এক বিশাল ইঁদুরের মুখ থেকে কেড়ে আনে। অলোক বলে, আহা, গণেশের উপর তো ইঁদুরের জন্মগত অধিকার — আজ তো ওরও পূজা।

রাকেশ বলে, আসাম রেজিমেন্ট হলে অধিকার বের করতো, নাগারা ইঁদুরের যম !

অলোক আবার চিঠিতে মন দেয়। কিন্তু ঢাকের শব্দ আর কাঁসরের বাজনায় স্মৃতি-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে কলম। শৈশব ও কৈশোরের নানা রঙের দিনগুলি ঢাক ও কাঁসরের শব্দে দোল খায়। শুধু এই বাজনাই ওকে মাতিয়ে রাখে কতক্ষণ ! অনায়াসে ভুলে যায়, বেসক্যাম্প। ভুলে যায়, শৈত ও জীবনের এই কষ্টকর অধ্যায়।

এই বাজনাই বিকেলে টেনে নিয়ে যায় মন্দিরে। কিন্তু সেখানে গিয়েই এই ঘোর, এই তাল কেটে যায় এক নিমেষে। মন্দিরেও অফিসার জে. সি. ও. ও সাধারণ সৈনিকদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। ওরাও যে যার র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী প্রসাদ পায়। র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী বসার জায়গা। গণেশ-ঠাকুর যেন ব্রিগেড কমান্ডার। ঢাক ও কাঁসির কনসার্টে এ যেন এক নতুন ধরণের ড্রিল। পূজা প্যারেড। প্রসাদ প্যারেড। আর্মির লোকেরা এ রকম ব্যবস্থায় অভ্যস্ত। ওদের অনভ্যস্ত চোখে খুব খারাপ লাগে। তক্ষুণি ওরা বেরিয়ে আসে। এ মন্দির নামক কন্‌সেনট্রেশান ক্যাম্প থেকে। তুষারঝড় ওদের চলার গতি কমাতে পারে না। চোখ বন্ধ করে, একটু-একটু তাকিয়ে, ওরা পড়ি কি মরি উর্ধ্বশ্বাস ? নুব্রা ব্রিজ পেরোতে না পেরোতেই ঝড়ের প্রাবল্য প্রলয়ের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অলোক আছাড় খায়। রাকেশ ওকে টেনে তোলে। রাকেশ পিছলে পড়ে। অলোক ওকে তুলে ধরে। এরপর দু'জনেই আছাড় খায় একসঙ্গে। তখন অগত্যা হামাগুড়ি দিয়ে, আবার কখনো বুকে হেঁটে আন্দাজে এগিয়ে যায়। চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ সূচের মতন তুষার ঝাপ্‌টা। এই প্রাকৃতিক

বিপর্যয়েও ঢাকের শব্দ, কাঁসির শব্দ আর তার সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের চিৎকার — গণ্‌পতি বাপ্পা মৌরিয়া ... ওদের পিছু ধাওয়া করতে থাকে।

বিলেটে পৌঁছে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে অলোকের। সঙ্গে প্রচণ্ড গা ব্যথা। ঝড় থেমে যায় সন্ধ্যার আগেই। কিন্তু যন্ত্রণা বাড়ে শরীরে। বিনা রিজার্ভেশান ট্রেনে আসার যন্ত্রণা আর বিনা এ্যাক্লিম্যাটাইজেশনে এত উচ্চতায় এসে এই বিপর্যয় ওকে কাবু করে ফেলেছে। নিস্তেজ শরীরে — মাথা থেকে পা অব্দি গণ্‌পতি বাপ্পার বাহনরা ছোটাছুটি করে। অলোক কিছুই করতে পারে না। ক্রমে তলিয়ে যেতে থাকে কোন্ অতলে! মাঝরাতে হাই টেম্পারেচার দেখে সহকর্মীরা ওকে সিক কোয়ার্টারে নিয়ে যায়। এখন ক্যাপ্টেন নাম্বুদ্রিপাদ নেই যে বিলেটে এসে দেখে যাবে। ওখানে ডিটেইন করে নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে একটা ইনজেকশান দেয়। তারপর আর কিছুই বলতে পারে না।

জ্ঞান ফিরে আসে সকাল সাড়ে সাতটায়। তাপমান সামান্য। কোমরে একটু ব্যথা রয়েছে শুধু। ওরা কী চিকিৎসা করেছে কে জানে! সকালে ব্রেক-ফাস্টের পর একপেগ ব্রান্ডি খেতে দেয়। বিকেলের মধ্যেই অলোক পুরো ঠিক হয়ে যায়। রাতে আবার সামান্য টেম্পারেচার এলেও পরদিন ওকে সিক কোয়ার্টার থেকে ছেড়ে দেয়।

অক্টোবর সঙ্গে করে নিয়ে আসে আকাশভরা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। ওয়েস্টার্ণ ডিস্টারবেন্স আসছে। উপগ্রহ চিত্র দেখে লেহ্ থেকে সহকর্মী জানিয়েছে, উত্তর পাকিস্তান আক্রান্ত। ওরা অক্টোবর থেকেই লাগাতর তুষারবর্ষণ। পাশের বিছানায় গোঁফদাড়ি বোটকা গন্ধসহ ছটফট করে রাকেশ কৌশিক।

ভীষণ হুজুগে! ইঁদুরের উৎপাত বেশি বলে পোর্টারদের সঙ্গে কথা বলে মুরগি গ্রাম থেকে তিনটা বিড়াল - শিশু আনিয়েছে। রাতে ওর স্লিপিং ব্যাগের তলাতেই বিড়াল শিশুদের বিছানা। ইঁদুরের ভয়ে ওরা এসে লুকিয়ে থাকে। প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের আগে ন্যাৎসীবাহিনীর হাতে মিত্র-শক্তি যেমন নাস্তানাবুদ।

পরদিন থেকে ও বিড়ালগুলির বুকে-পিঠে প্যারাশুটের দড়ি আলতো করে বাঁধে। তারপর লট্‌কে নিয়ে বারবার ইঁদুরের ভোজের পার্টি কিম্বা সভা-সমিতির জমায়েতে প্যারাড্রপ করে। অন্য সহকর্মীরা বাজি ধরে। একে-অন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে পর্যুদস্ত কমান্ডোদের রণক্ষেত্র থেকে প্যারালিফ্‌ট করতে বাধ্য হয় রাকেশ।

দু'তিন দিন এরকম করার পর একটা ছোট ইঁদুরের মৃত্যু হয়। রাকেশ ধৈর্য ধরে সঙ্গে থেকে বিড়াল-শিশুদের প্রথম ইঁদুর ভক্ষণ করায়। চুহা ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার কর্ণেল ঢাই কে জি. দু' একবার দলবল নিয়ে বাধা দিতে আসে। প্রায় আড়াই কে. জি ওজনের ইঁদুরটাকে রাকেশ ঐ নামেই ডাকে। অলোক ডাকে, সাদ্দাম হুসেন। পক্ষে-বিপক্ষে বাজির রেট বেড়ে যায়। এক-একজন যেন শারজা স্টেডিয়ামে বসা তেলকুবের। জর্জ বুশসম-বিক্রমে রাকেশ কৌশিক বিড়াল - ছানাদের দিয়ে এয়ারঅ্যাট্যাক করে। এক পেগ দুই পেগ, থেকে বাজির দর পুরো বোতলে পৌঁছে যায়।

এরপর থেকে আশ্চর্য - রকমভাবে মার্জারপুঙ্গবদের বিক্রম বেড়ে যায় । আর প্যারাড্রপ করাতে হয় না । রোজই দু'একটা লাশ ফেলে দেয় । ক্রমে ছোট থেকে আয়তনে বাড়তে থাকে ওদের শিকার। বড় ইঁদুরের দিকে নজর । রাতে আর ঘুমায় না বিড়ালের বাচ্চারা । জিহ্বায় একবার রক্তের স্বাদ লাগলে কারো মুক্তি নেই । সব প্রাণীই তখন নিশাচর । ঝাঁপিয়ে, টুটি টিপে ধরে, ঝটপটানি থেকে তারিয়ে-তারিয়ে আনন্দ-পাওয়া প্রকৃতির হিংস্রতম অনুভূতি । পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সত্য এই শিকার । বিড়াল - শিশুরা সেই স্বাদ পেয়েছে ।

আকাশবাণীর খবরে বলে এ-দেশে এখন দুর্গোৎসব । মিলনের উৎসব দশ্হরা । অলোক ভাবে কার সঙ্গে কার মিলন ? দুর্গার সঙ্গে অসুরের মিলন, ধনীর সঙ্গে গরিবের, শাসকের সঙ্গে শোষিতের, বিড়ালের সঙ্গে ইঁদুরের । একরাতে বিড়ালেরা শিকারসহ রাকেশের বিছানায় ঢুকে পড়ে । রাকেশ গভীর ঘুমে পাশ ফিরলে শিকার ওর পিঠের তলায় চাপা পড়ে । অগত্যা ওরা আবার শিকারে বেরোয় ।

প্রতি-রাতে অলোক হেডসেট কানে লাগিয়ে আকাশবাণীর উর্দু সার্ভিস, বিবিধ ভারতী, নেপাল কিম্বা সিলোন থেকে অনুরোধের আসর, সিবাকা গীতমালা অথবা সৈনিক ভাইদের জন্যে প্রচারিত ফিল্মিগীতের অনুষ্ঠান শুনতে-শুনতে ঘুমোয় । তারপর একসময় বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টিপাতের মতন শব্দ কিম্বা অজানা ভাষায় কথাবার্তা শুনে ঘুম ভাঙে । তখন সেট অফ করে । অন্য কোন দেশে তখন সবে সন্ধ্যা অথবা দুপুর । হয়তো নাটকে প্রেমালাপ চলছে । এখানে প্রখর বিরহ । অলোক উপুড় হয়ে শোয় । স্লিপিং ব্যাগের ইনারটাকে উরুসন্ধিতে ঠেলে দেয় । আবার ঘুমোনোর চেষ্টায় ছটফট করে । স্বপ্নের মেয়েটি খুব জ্বালায় । অলৌকিক বিষাদমাখা মুখচ্ছবি কষ্ট দেয় । সমস্ত অস্তিত্বে ইঁদুর দৌড়ায় ।

সে-রাতে রাকেশের চিৎকারে সবার ঘুম ভাঙে । রেডিও ফিটার জর্জ অ্যানটনি ইমারজেন্সি আলো জ্বালায় । বিড়াল পুঙ্গবরা আরেকটা ইঁদুর মেরে লাশ ফেলেছে রাকেশের নাকের উপর । ও লাফিয়ে ওঠে । পিঠের তলায় মৃতদেহ । অলোক টর্চ জ্বালিয়ে দেখে সাদ্দাম হুসেন সীসের বক্সে শেল্টার নিচ্ছে ।

মাঝরাতে তখন ইঁদুরের পিছনে বেড়াল, বেড়ালের পেছনে রাকেশ । ঘন্টাখানেক পরিশ্রম করে ও তৃতীয়-বিশ্বের তিনটি বিড়ালকেই বেঁধে ফেলে । হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে এনে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখে ।

❑ ফায়ার ফায়ার !

রাকেশ ভাবে, অদৃষ্টের অদৃশ্য দড়িতে বাঁধা এবং নিয়ন্ত্রিত এই জীবন । এখানে সবাই একক। পৃথিবীর সমস্ত বিচার ব্যবস্থায় নিঃসঙ্গতা একটি কঠোর শাস্তি । সৈনিকরা বিনাদোষে একাকী । — কর্তব্য পালন ! এক হাজার সৈনিক এক সঙ্গে থাকলেও প্রত্যেকেই একা । হাত-পা একই ছন্দে চলতে থাকে । শরীর দুলতে থাকে সমান লয়ে । কিন্তু প্রত্যেকের মন থাকে আলাদা-আলাদা জায়গায়। একাকিত্বের সঙ্গে একাকিত্ব যতই যোগবিয়োগ গুণ ভাগ করো না কেন, ফল একাকিত্বই।

এই যে ঘন্টাখানেকের রোদ, লেহ্ থেকে হেলিকপ্টার উড়েও খরদুঙলা ক্লিয়ার না থাকায় আবার ফিরে যায়, বিকেলে আবার তুষারপাত, সেই তুষারপাত চলে লাগাতর ; দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী ? রাকেশের অপেক্ষার দিনগুলি দীর্ঘতর হতে থাকে । বিড়াল তিনটিকে পরদিন ও লিজ্জো নামগিয়ালের সঙ্গে মুরগি পাঠিয়ে দেয় । কর্ণেল ঢাই কে. জি আর দু' একটা বড় ইঁদুর ছাড়া ওরা সবই সাফ করে ফেলেছে এই এক মাসে । যারা বেঁচে আছে বিড়ালদের অনুপস্থিতিতেও ওরা আর বেরিয়ে আসে না । একেই বোধ হয় আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় বলে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স । শত্রু একদম শেষ করে দিও না । দুর্বল করে দিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে আনন্দ পাও ।

এগারোই অক্টোবর আকাশ পরিষ্কার হলে রাকেশ লেহ্ ফেরে । ওর বদলে আসে রবিশংকর গুপ্তা । রবিশংকরকে তিন দিন এ্যাক্লিম্যাটাইজেশান করিয়ে ফরোয়ার্ড বেস থেকে রঘুনন্দন মিশ্রাকে রিলিভ করায় অলোক । রঘুনন্দন ভাল গাইতে পারে । বিশেষ করে রফির গাওয়া গানগুলি । নুব্রার স্রোতে এখন আর আগের মতন উদ্দামতা নেই । রাতে দু'পারে বরফ জমে যায় । ওপারে সেই বুদ্ধের ছবি আঁকা পাথরটার সামনে বড় পাথরে পা ঝুলিয়ে বসে সেই সন্ধ্যায় অনেক ক'টা গান শোনায় রঘুনন্দন । ফেরার পথে হিমবাহের নানা অভিজ্ঞতার গল্প শোনায় । অ্যার্টিলারি হাট থেকে ওদের জে. সি. ও -র জন্মদিনের চা বিস্কুট খেয়ে বেরোতে গিয়ে গতকালই কেমন ফাঁড়া গেছে ওর ! ওর গানে মুগ্ধ জে.সি. ও. এগিয়ে দেওয়ার জন্যে হাট থেকে বেরোতেই একটা গোলা এসে দু'হাত সামনে পড়ে । দেখতে না দেখতেই একটা স্প্লিন্টার এসে সোজা লাগে জে. সি. ও.-র বুকে । তক্ষুণি, 'হায় রাম' বলে জে. সি. ও. রঘুনন্দনের কোলে ঢলে পড়ে ।

গোলন্দাজ জওয়ানরা ক্ষেপে যায় । ওরা তাড়াতাড়ি সব ক'টা কামানে ফায়ারিং শুরু করে এবং গান স্পটে যত গোলা মজুদ ছিল সব শত্রুদের সম্ভাব্য বাসস্থানে পাঠিয়ে, তারপর ফিরে আসে । অন্ দ্য স্পট শহীদ হওয়া জে. সি. ও. -র জন্মদিন এরকম ভাবে পালন করতে হবে ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি । ফেরার সময় নুব্রার স্রোতে যুবক চাঁদের ভেঙে খান-খান প্রতিবিম্ব দেখে মনে হয় আজ কোজাগরী পূর্ণিমা । এই চাঁদের নিচে জন্ম ও মৃত্যু কত পাশাপাশি । যুদ্ধক্ষেত্রে ও শ্মশানে বসেও মানুষ ভাবে জীবনের কথা । অলোকের মনে পড়ে শৈশবের কিছু স্মৃতি । তীর্থমুখ ফরেস্ট ডাক-বাংলোর মাধবীলতা বেষ্টিত বারান্দার আলো - ছায়ায় জীবনের প্রথম চুম্বন । কৈশোরের প্রথম ভাল লাগা ছোট্ট মেয়েটি হঠাৎ প্যাঁচার ডাকে চমকে কেঁদে ফেলে । ওর মা ছুটে আসে । ওর কি এখনো মনে আছে সেই চুমুর কথা ! খুব জানতে ইচ্ছে করে ।

বিয়ের পর প্রথম কোজাগরী সেই মধুবন কলোনির ভাড়াবাড়ির ছাদে । পরস্পরকে খুঁজে নিতে-নিতেই ভোর হয়ে যায় । বারবার মিলন সুখের ক্লান্তিতে শেষ রাতে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরে বাড়ির মালকিনের ডাকে জেগে ওরা জড়-সড় । তাড়াতাড়ি বেডশীট মুড়ে দু'জনে নিচে নেমে আসে । এরপর কতদিন মালকিনের চোখে তাকাতে পারেনি ও । অনিচ্ছা সত্ত্বও চাপে পড়ে আজ ব্রান্ডি খেয়েছে দু'পেগ, এমনি স্মৃতিরা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে গরম জামাকাপড়ের মতন জড়িয়ে থাকে সবসময় । অথরিটি পারমিশান না দেওয়ায় অন্তরা আর তোড়াকে লেহ্ নিয়ে আসার স্বপ্ন বাস্তব হয় নি । কত কথা জমে আছে অন্তরা'র । ছুটি গেলে রাতের পর রাত জেগে গল্প শুনিয়েও ওর কথা শেষ হয় না । শেষ হয় না মায়ের কথা । শেষ হয় না তোড়ার । বাবার বুকেও জমা হতে থাকে কত ক্ষোভ - অভিমান, কত গল্প কথা ! না জানি আবার কবে কাছে পাবে সব্বাইকে !

অলোক সবাইকে কাছে পেতে চায় । গোড়ালি সমান নতুন বরফের উপর দিয়ে এগিয়ে যায় টলোমলো পা-য় । দিনক্ষণ উৎসবকে ম্লান করে শুধু ফায়ারিং, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ, কমান্ডো অ্যাটাক, মৃত্যু আর মৃত্যু সব সময় আচ্ছন্ন রাখে । আজ দীপাবলী । উৎসবমুখর দেশ শুধু সৈনিকের কল্পনায় । ক্লান্ত দেহ-মনে বুখারি ঘিরে বসে ওরা স্মৃতির উৎসবে বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হতে থাকে ।

এমনি বিষণ্ণ সময়ে টেলিফোন রাতের নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে বেজে ওঠে । অলোক রিসিভার উঠিয়ে দূর থেকে অস্পষ্ট কিছু কথা শুনতে পায় । ঠিকমতন বুঝতে পারে না । ও চেঁচিয়ে বলে, জোরসে বোলিয়ে, তেজ বোলিয়ে — কুছ সমঝ্মে নহী আ রাহা — তখন এক্সচেঞ্জের অপারেটর সাহায্যে এগিয়ে আসে । ও চেঁচিয়ে বলে, ফায়ার, ফায়ার !

ফরোয়ার্ড বেসে সর্বস্ব পুড়িয়ে দীপাবলীর আগুণে নিঃস্ব হয়েছে সুরিন্দর ও রবিশংকর । বিকেলে শেষ আওয়ারলি কন্ট্যাক্ট না করায় দুঃশ্চিন্তায় ছিল অলোক । কাছাকাছি দু'টো পোস্ট ক'দিন আগেই শত্রুর কবল থেকে পুণরুদ্ধার করা হয়েছে । যে কোন মুহূর্তে আক্রমণের সম্ভাবনা । এমনি দুঃশ্চিন্তার মধ্যেই আর্মির ল্যান্ড লাইনে এ খবর পেয়ে অলোক নির্দেশ দেয় ওরা যেন দশ মিনিটের মধ্যে রেডিও রিলেতে কনট্যাক্ট করে — সিক্রেট ফ্রিকোয়েন্সি নাম্বার টু !

পরদিন তুষারপাত । সারাদিন ছটফট করে অলোক । জেনারেটর আর জেরিক্যান বিষ্ফোরণে দীপাবলী ক'জনের জীবনে আসে ! তারপরই নাকি ধুঁয়াদার শেলিং । অলোক জিনিসগুলি লিস্ট করে । প্যারাশুটের দড়ি ইত্যাদি দিয়ে বেঁধে কয়েকটা প্যাকেট তৈরি রাখে । আজ ওরা সকালে ও সন্ধ্যায় সাসের আর. টি. নিজেদের ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করে কথা বলেছে । ওদের কল আসতেই বিলেটের সবাই ছুটে এসে নিঃশব্দে প্রতিটা উচ্চারণ গিলে খায় । সারাদিন সেট অন, সারারাতও সেট অন রাখবে ঠিক করে ওরা । পালা করে রাত জাগবে সবাই । নিজের ট্রেড জব না হওয়া সত্ত্বেও অ্যান্টনির এই প্রস্তাব আপ্লুত করে অলোককে । সন্ধ্যার কন্ট্যাক্টে রবিশংকরকে বলে, যখনই পারবে কন্ট্যাক্ট করো, যে - কোন অসুবিধা জানিও, আমরা সব সময় মনিটর করছি, ওভার

— সুকরিয়া সাহাব , ওভার অ্যান্ড আউট !

অ্যান্টনি চিন্তিত, না জানি ওরা কেমন করে চার্জ করছে ব্যাটারি !

অলোক বলে, সাসের একটা সোলার চার্জার আছে, কিন্তু ক'দিন ধরে তো সূর্যই দেখা যায় নি।

— পদাতিক বাহিনীর এক্সচেঞ্জও তো ঐ ব্যাটারিতেই চলে ! কাল আবহাওয়া ভাল না হলে তো দেখছি পরশু থেকে কন্টাক্টই হবে না ! এই দুঃশ্চিন্তা সবাইকে গ্রাস করে । সে রাতেও কেউ ভাল করে খেতে পারে না । বুখারি'র পাশে বসে নব ঘুরিয়ে উত্তাপ বাড়িয়ে, কমিয়ে ওদের আলোচনায় তখন শুধু যুদ্ধ আর অগ্নিকাণ্ড ।

❑ অপারেশনস্ নর্মাল

কল্প বিজ্ঞানভিত্তিক হলিউডি সিনেমার সেটের মতন এই সাপ্লাই বেস ।

পূর্ববর্তী অভিনেতা কার্পোরল রবিশংকর গুপ্তা হেলিকপ্টারে করে ফিরে গেছে । কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশে অলোক ওকে রিলিভ করেছে । নতুন ভাবে আবার সবকিছু সেট করে — অপস্ নর্মাল-রিপোর্ট দিতে হবে ।

রবিশংকর ও অর্ধমৃত নায়েক মহাদেবকে নিয়ে হেলিকপ্টার উড়ে যেতেই সুরিন্দর ও রামস্বরূপ ওর লাগেজ তুলে নেয় । তারপর চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে চলতে থাকে । খুব উঁচু চড়াই নয়, কিন্তু ওর খালি হাতেই বেশ কষ্ট হচ্ছে । অনেক কষ্টে ওদের পেছন-পেছন এগিয়ে যেতে থাকে । বেসক্যাম্প থেকে সারে চার-পাঁচ হাজার ফিট বেশি উচ্চতা মানিয়ে নিতে সময় লাগবে । বাঁদিকে পুড়ে যাওয়া রাশিয়ান হাটটা দেখিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরিন্দর । দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামস্বরূপ। অলোকের বুক থেকেও না জানি কেন, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তখন । ওখানে দাঁড়িয়ে ওরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার এগোয় । দুর্ঘটনার বিশদ বর্ণনা শুনে ভীষণ খারাপ লাগে । এই সুরিন্দরও ওকে গোর্খা রীড্জ -এ এক জ্বলন্ত জতুগৃহ থেকে উদ্ধার করেছে এই তো গত আগস্ট মাসে। ওদের সঙ্গে চলতে-চলতে অলোকের স্মৃতিতে ঐ ভয়ংকর দিনের দৃশ্যগুলি জেগে ওঠে ।

নিজেদের ডেরায় জিনিসপত্র রেখে রামস্বরূপের টানাটানিতে ওর অন্ধকার তাঁবুতে ঢুকতে হয়। রামস্বরূপ লঙ্কার আচারে বেসন মাখিয়ে পাকোড়া ভাজে । অলোক দু'একটার বেশি খেতে পারে না । আট-দশটা পাকোড়া ভেজেই কড়াই নামায় রামস্বরূপ । অলোকের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে বমি-বমি লাগে। মাথা ঘোরে, ঠিক যেমনটি প্রথম এসে হয়েছিল গত বছর ডিসেম্বরে রামস্বরূপ ওকে একটি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেতে দেয় । তাড়াতাড়ি ফিরে জুতো খুলে স্লিপিং ব্যাগে ঢোকে আলোক । চার-পাঁচদিন আগেই ও প্যাকেটে করে এই নতুন স্লিপিং ব্যাগ দু'টি পাঠিয়েছে । এখন ওতে রবিশংকরের গায়ের গন্ধ ।

রবিশংকর হয়তো এখন কোর্ট অফ এনকোয়ারিতে জেরার জবাব দিচ্ছে । গত দু'দিন সুরিন্দর ওকে কোন কাজ করতে দেয়নি । খাবার আনা, তরকা লাগিয়ে খেতে দেওয়া, নিজে খাওয়া, বিকেলে বরফ আনা, রাতে দুধ বানানো সব ও নিজের হাতে করে । অলোক স্লিপিং ব্যাগে

শুয়ে-বসে অফিশিয়াল কাজগুলি সারে। আর বেস ক্যাম্প থেকে নিয়ে আসা থ্রিলার পড়ে। তিন - চার ঘন্টা বাদে একবার করে উঠে জুতো গলিয়ে পেচ্ছাব করতে যায়। আর ফিরে এসে গরম জল বা কফি খেয়ে আবার স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ে। কাছে-পিঠে শেল পড়ে। এ. এন. ১২ বিমান এসে র‍্যাশন ড্রপ করে যায়। দু'দিনেই শেষ হয়ে যায় সঙ্গে আনা থ্রিলারটি।

তৃতীয় দিনে সুরিন্দর ওকে লঙ্গরে নিয়ে যায়। অনেক দূর। প্রায় একমাইল হবে। কালো পাহাড়ের টিলাগুলিতে বাসস্থান তৈরির মতন সামান্য সমতল পাওয়া যায় না। সেজন্যেই এত ছড়িয়ে থাকে এই সাপ্লাই বেসের সৈনিকরা। লঙ্গর পেরিয়ে আরো মাইলখানেক দূর অব্দি সৈনিকরা থাকে। স্টোর দেখিয়ে ফেরার পথে সুরিন্দর ড্রপিঙ জোন ও স্মোক জেনারেটর হাট দেখায়। ঐ হাট থেকে নির্গত রঙিন ধোঁয়া দেখেই এ. এন. ১২ বিমান থেকে ড্রপিং হয়।

দূরে স্থবির স্নো-ট্রাক ও চলমান স্নো-স্কুটার দেখায় সুরিন্দর। রবিশংকর ও স্নো-ট্রাকের সঙ্গে ফটো তুলতে গিয়ে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের কথা বলে। এইটুকু ঘুরে কোনদিন অলোক এত পরিশ্রান্ত হয়নি। মনে হচ্ছে সমস্ত জীবনী-শক্তি শেষ। কিন্তু সবকিছু সুরিন্দর করে দিলে খারাপ লাগে। একটু বিশ্রাম নিয়ে আজ নিজেই ডালে তরকা লাগায় অলোক।

বিকেলে সুরিন্দর কোনমতেই ওকে বরফ কাটতে সঙ্গে নেয় না, আপনি বিমার পড়লে আমার রিলিভ হতে আরো দেরি লাগবে! ও বেরিয়ে গেলে অলোক পেট্রোল ভরে জেনারেটর তৈরি রাখে। তারপর রামস্বরূপের সাহায্য নিয়ে জেনারেটর চালায়। আলো জ্বলে ওঠে। চার্জারে ব্যাটারি লাগায় চার্জ করতে। ততক্ষণে সুরিন্দর ফিরে আসে। রামস্বরূপ ওকে বলে, মিত্রসাহেবের হাতে জাদু আছে। আজ ছাব্বিশ হ্যাঁচকাতে জেনারেটর চলেছে। হেসে ফেলে।

বরফ কাটার জন্যে আরো চব্বিশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে আজ ভোরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে ওদেরকে প্রায় দু'ঘন্টা বরফের গুহায় কাটাতে হয়েছে। সে এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। মনে হয় ওরা যেন আদিম যুগের গুহাবাসী।

সে কী কঠিন কাজ এই বরফ কাটা। প্রত্যেক কোপে বুকের রক্ত ছলকে বেরিয়ে আসতে চায়। এক প্রাণপণ লড়াইয়ের অন্য নাম একটিন পাকা বরফ। শুধু জল খাওয়ার জন্যে এত কষ্ট করতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি কোনদিন। এভাবে যুদ্ধের ভেতরে কষ্টকর প্রাতঃকৃত্য সারা দিয়ে শুরু দিনগুলিতে বরফ-কাটা, জেনেরেটর চালানোর মতন যুদ্ধ লড়ে সৈনিকরা মরিয়া হয়ে। এখানে এসে সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় ওর।

একদিন রামস্বরূপের তাঁবুতে আসে কিষণলাল। রামস্বরূপ পরিচয় করায় 'মেরা গ্রাহী' বলে? গ্রাহী মানে একই গ্রামের লোক। কিষণলাল রামস্বরূপের গ্রামের লোক নয়। তবে একই রাজ্যের। বাড়ি জয়পুর জেলার ভাটেরি গ্রামে। বিলোনিয়ার হেমন্ত সরকারের কাছে এই গ্রাহীর অর্থ জেনেছে অলোক। ও 'গ্রাহী' বলে পরিচয় করিয়েছিল অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে। সেই গ্রাহীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। মনে পড়ে টাকা দিতে বিলোনিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে ওদের বাড়িতে গেলে ওর মা অলোককে একসঙ্গে মাছ-মাংস-ডিম-দই আর মিষ্টি দিয়ে ভাত খাইয়েছে আদর করে। ফেরার সময় বুকে জড়িয়ে বলেছে, আমার পুতে-রে দেইখ্য বাবা!

কে জানে, কোথায় আছে হেমন্ত এখন ? কোন্ ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারেনি আর। রামস্বরূপের গ্রাহী কিষণলাল এই কোম্পানির ধোবি। এখানে ধোওয়া-টোওয়ার বালাই নেই। ওকে এম. আই. রুমে ডাক্তার সাহেবের সহায়ক ডিটেইল করা হয়েছে। নার্সিং অ্যাসিস্টেন্টের সঙ্গে থেকে-থেকে কোন্টা মাথা-ধরার বড়ি আর কোন্টা পেট-ব্যথার ও জেনে গেছে। পদাতিক সৈনিকরা তাই মজা করে ওকে-ও ডাক্তারসাহাব বলে। ছুটি থেকে দেড় মাস দেরিতে ফিরে এখন চার্জট্রায়ালের আতঙ্কে ভুগছে। রোজ একবার কোয়ার্টার মাস্টারের অফিসে অথবা সিনিয়ার জে. সি.ও.-র কাছে ধর্ণা, সাহাব, তাড়াতাড়ি করিয়ে দাও ! প্রমাণপত্রগুলি ভাঁজে-ভাঁজে ছিঁড়তে চলেছে। জেলমার্কা টুথপেস্ট দিয়ে পেছনে কাগজ লাগিয়ে প্লাস্টিক প্যাকেটে ভরেছে। সুরিন্দর দেরি করে আসার কারণ জানতে চাইলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ ছলছল করে ওঠে, ক্যায়া বতাউঁ সাহাব।

দু'মাসের ছুটিতে সৈনিক সারা বছরের জমানো পারিবারিক সমস্যার কতটা সমাধান করতে পারে! বুঝে উঠতেই লাগে কিছুদিন। তারপর সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার আগেই ছুটি শেষ। সমাধান আর হয়ে ওঠে না। একট জোড়াতালি সমাধানের জন্যে চাই সময়। সেজন্যে ছুটি থেকে দেরীতে ফেরাই সৈনিকদের সবচাইতে বড় অপরাধ। সবার উপরে ডিসিপ্লিন, না হলে যুদ্ধ চলবে কেমন করে ?

অলোকের আবার মনে হয় — চক্রব্যূহ ! একপাল্লায় পৌরুষ এবং অন্য পাল্লায় নপুংশকতা। সমস্ত অনুভূতিই আজ অর্ধসত্য ! এই না বুঝতে পারা দোদুল্যমানতা ওকে কষ্ট দেয়। কি জানি বাড়িতে সবাই কেমন আছে ! সেদিন পাকা-বরখ কাটতে-কাটতে ক্লান্ত। তখন্ সুরিন্দর কিষণলালের খবর দেয়। অবশেষে শাস্তি হয়েছে — আঠাশ দিনের বেতন কাটা যাবে ওব। বরফ কাটতে-কাটতে জায়গাটা গুহার মতন হয়ে পড়েছে। অলোক বরফের টুকরোগুলি টিনে ভরে নেয়। তারপর এসে কালো বরফে বসে। তখন কারাকোরামের আকাশে সূর্যের শেষ ম্লান আলো।

সুরিন্দর উঠে বরফ কাটতে শুরু করে। অলোক চোখ বন্ধ করে জোরে-জোরে শ্বাস নিতে থাকে। বন্ধ চোখে দেখতে পায় কিষণলালেল কাতর মুখ। ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না ওর। তখন্ কুঠারের ঘায়ে একটা বড় চাঁই বেরিয়ে আসতেই আর্তনাদ করে ওঠে সুরিন্দর। অলোক চমকে ওঠে। বরফের চাঁইটা কয়েকপ্রস্থ প্যারাশুটের কাপড়ে আটকানো। একপাশে কালচে ছাপ।

প্রথমে অলোক ভাবে সুরিন্দরের মাথায় লেগেছে বুঝি ! পরমুহূর্তেই সূর্যের শেষ ম্লান আলোয় এক অদ্ভুত দৃশ্যে হতভম্ব হয়ে যায়। স্পষ্ট একজন মানুষের মুখ। মুখের ছাল মাংস বরফের চাঁইয়ের সঙ্গে উঠে এসেছে। স্বচ্ছ বরফের আস্তরণে ঢাকা কঙ্কালের উপর পেশির আস্তরণ। ঐ মুণ্ডুর কানের কাছে মুখ আরেকটা মাথা। ওরা কী করবে এখন ? আশপাশ থেকে বরফের টুকরাগুলি টিনে ভরতে থাকে। সুরিন্দর গিয়ে ইনফ্যান্ট্রির অ্যাডজুটেন্টকে খবর দেয়। খবর পেয়ে অনেকেই দেখতে আসে। কিছু কাক নিঃশব্দে বসে আশেপাশের কালোট টিলায়। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় কিছুই করা যায় না। ওরা ফিরে আসে। শুধু কাকেরা নিশ্চুপ পাহারায়। হিমবাহের অন্ধকারে ওদের চোখ চকচক করে।

নিজেদের ডেরায় অলোকরা এসে ঢুকতেই শত্রুর গোলা আসতে থাকে । আজ একেবারে কাছে-পিঠে । সবকিছু ছেড়েছুড়ে ওরা গিয়ে পাহাড়ের অন্য ঢালে বরফের গুহায় শেল্টার নেয় । এদিক থেকেও আর্টিলারির কামান গর্জে ওঠে । ঘন্টাদুয়েক ভয়ংকর যুদ্ধ চলতে থাকে । তারপরই সব চুপচাপ । ওরা হতভম্বের মতন ভাবতে থাকে । এই নীরবতার অর্থ বুঝতে পারে না । আর্টিলারি থেকে অল ক্লিয়ার হুইশলও বাজে না । ওরা বেরোতেও পারে না ।

এমনি দিশাহারা সময়ে হঠাৎ একটা তীব্র গোঙানির আওয়াজে রামস্বরূপ বাইরে মুখ বের করে দেখে কেউ একজন হামাগুড়ি দিয়ে আসছে । রামস্বরূপ আর সুরিন্দর বেরিয়ে গিয়ে দ্রুত টেনে আনে আহত লোকটাকে । স্প্লিন্টারে ক্ষত-বিক্ষত ওর মুখ, বুক ও পেট । রক্ত ও তাজা বরফে মাখামাখি শরীর । মুখ দিয়ে গলগল রক্তের সঙ্গে বলে লাম্বা, সবকো মার দিয়ে সালে লোগ — কুপির আলোয়, টর্চের আলোয় বীভৎস লাগে ওকে । হাবিলদার মহান্তিকে তিন-চার দিন আগে রিলিভ করেছে হাবিলদার লাম্বা । আজ পূর্ণশক্তি নিয়ে ওরা শত্রুর গোলার জবাব পাঠাচ্ছিল সঠিক নিশানায় । একটু সময়ের মধ্যেই ওদের একটি কামানকে নিস্তব্ধ করে দিতে পেরেছে । সীমান্তের ওপার থেকে ভেসে এসেছে আর্তনাদ । কিন্তু পরমুহূর্তেই দু'টো গোলা ঠিক দু'টো কামানেই এসে পড়ায় ষোলজন গোলন্দাজের পনেরজন তক্ষুণি মারা গেছে । শুধু লাম্বা প্রায় ষাট গজ এবড়োখেবড়ো বরফে রপথ অতিক্রম করে এখানে পৌঁচেছে । কিন্তু হায় ! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে - ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওদের চোখের সামনে । ওরা কিছুই করতে পারে না । একটু বিরতি দিয়ে-দিয়ে শত্রুর গোলা আসছেই । আজ ওরা এত প্রচণ্ড হয়ে উঠল কেমন করে !

পোর্টেবল আর. টি. অন্ করেও, সারারাত টিউন করেও বেস ক্যাম্প বা লেহ্‌র সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারে না । গোলাগুলি থামার পর ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করে ভোর ছ'টায় নিজেদের ডেরায় ফিরে মেন সেট টিউন করে শেষ পর্যন্ত কন্ট্যাক্ট হয় । কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টার পাঠানোর প্রতিশ্রুতি পায় ওরা । ওয়েদার জানায় — ফেয়ার, অল পাসেস্ — ক্লিয়ার !

সকালে পদাতিক সৈনিকরা অশ্রুসজল চোখে ষোলজন বীর গোলন্দাজের শরীর কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে হেলিপ্যাডে শুইয়ে দেয় । দু'টো চিতা হেলিকপ্টার সারাদিনের চেষ্টায় বদলি মিডিয়াম গানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর সৈনিক পৌঁছে দেয় । ফিরিয়ে নিয়ে যায় মৃতদেহগুলি। অলোকের মতন প্রত্যেকের দুঃখ সেদিন শরীর ছেড়ে গলায় জমাট বাঁধে । সবার আওয়াজ ফ্যাসফেসে । মাথায় যন্ত্রণা । সবাই সেদিন উন্মাদের মতন কথাবার্তা বলছে পাইলটরা অ্যাডজুটেন্টকে বলে গেছে, যে তিনটি কামান থেকে কাল শত্রুরা গোলা পাঠাচ্ছিল সে তিনটিই শেষ করে দিয়েছে আমাদের বোফর্স শেষরাতের শেলিং-এ। একই জায়গায় আবার কামান ইনস্টল করতে কম করে সাতদিন লাগবে ওদের, যেমন আমাদের লাগবে কম করে তিনদিন, তার আগেই কমান্ডো অ্যাটাকে ঐ শৃঙ্গ দখল করে ফেলতে পারবো আমরা, আপনি সৈনিকদের বোঝান — আমরাই জিতব !

এই জয়-পরাজয়ের ভাবনা আজ আর কোনরকম মানসিক পরিবর্তন আনতে পারে না । ওরা নিরাসক্ত । ঐবরফ-চাপা মানুষ দু'টির মতন । কতদিন ওরা চাপা পড়ে আছে, আরো

কতদিন চাপা পড়ে থাকবে কে জানে ! তবু কেউ বলে, ওরা শোনে । কেউ আদেশ করে । ওরা তা পালন করে ।

পরদিন ছিলিঙ পানচুক জানবাক আর লিজ্জো নামগিয়াল অন্য দুই ইনফ্যান্ট্রির জোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে সাবধানে বরফ কেটে বের করে মানুষ দু'টিকে । আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে পরস্পরকে পাথরের মূর্তির মতন । কাঁধের র‍্যাঙ্ক দেখে বোঝা যায় একজন কুমায়ুন রেজিমেন্টের সুবেদার আর অন্যজন সিপাহি । ভিড় করে দেখছে নিঃশব্দ কাকেরা ।

মুখগুলি সদ্য বরফ হওয়া মৃতদেহের মতন ফ্যাকাশে নয় । অনেকটা ধূসর । অ্যাডজুটেন্ট সাহেব বলেন, আট বছর আগে এই কুমায়ুনি বীরেরা হিমবাহে এসেছে । আর ফিরতে পারেনি । শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জড়াজড়ি করে বাঁচার চেষ্টা করে গেছে । পায়ে সাধারণ বড় বুট । শরীরে সাধারণ উলের জামা-কাপড়ের উপর কোট-ফার-কা । এই ঠাণ্ডায় মারাত্মক এই পোশাক-কল্পনা করা যায় না । অথচ এরাই প্রথম শত্রুকে হটিয়ে এই হিমবাহ দখল করেছে ।

হেলিকপ্টারে ঢোকানো সম্ভব নয় বলে পরদিন স্কিডবোর্ডে বেঁধে জোড়া মৃতদেহ চিতা হেলিকপ্টারের নিচের স্কিডে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । ১৯৪৮ সালের ১৩ এপ্রিল আকাশ থেকে প্যারাজাম্প করে নেমে এসেছিল এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা । আজ আট বছর পর আকাশপথেই ফিরে যাচ্ছে ঝুলতে-ঝুলতে । কেউ কমান্ড দেয়নি, তবু সাপ্লাই বেসের সমস্ত সৈনিকরা আন্তরিক স্যালুট জানায় ।

আজ খবর এসেছে নতুন বেস দখলের । গত রাতে সত্যি-সত্যি কমান্ডোরা দখল করে ফেলেছে ঐ পাকিস্তানি বেস ও আশপাশের সমস্ত পোস্ট । আগামী তিন দিনের মধ্যেই পদাতিক সৈন্যরা পালা করে উঠে যাবে নতুন বেসে । থেকে যাবে শুধু স্কেলেটন স্টাফ ।

ওদের জন্যে নির্দেশ, পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে থাকো ! সুরিন্দর যতক্ষণ জেগে থাকে বিড়বিড় করে কী যেন বকে । অলোকের ভয় হয়, ও পাগল হয়ে যাবে না তো ? চ্যানেলে ওর রিলিভার পাঠাতে অনুরোধ জানায় অলোক । বেন্ট কমান্ডার জানায়, মুখার্জি ছুটি থেকে ফিরেছে আজই ! পরশু নাগাদ টারম্যাক প্যারেড শুরু করবে !

— কোন্ মুখার্জি স্যার !

— ডি. মুখার্জি, স্প্লিন্টারে দু'টো আঙুল উড়ে গেছে যার — ওর ঘাঁ শুকিয়েছে এখন !

অলোক সবসময় নানা প্রসঙ্গে কথা বলে ব্যস্ত রাখে সুরিন্দরকে ! ও বিরক্ত হয় না ! কিন্তু অনেক সময়ই উল্টোপাল্টা জবাব দেয় । থেকে-থেকে কথার খেই হারিয়ে যায় । সুযোগ পেলেই আর. টি. -তে নানা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি টিউন করে গান শোনায় অলোক ।

৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রেডিও জানায় মৌলবাদীরা বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলেছে। সারা দেশে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। বি. বি. সি. ও রেডিও ইসলামাবাদ জানায় দিল্লির সংখ্যালঘু সরকারের পতন ঘটবে আজ-কালের মধ্যেই । শোক ছেয়ে যায় ওদের ফ্রন্টে। শোক ছেয়ে যায় প্রত্যেক সৈনিক শিবিরে । হিন্দু-মুসলমান সৈনিকরা পাশাপাশি যুদ্ধ করছে এখানে শত্রুব বিরুদ্ধে । ভগ্নহৃদয়ে আরো সজাগ এবং সতর্ক হয়ে থাকে ওরা । প্রতিদিন রিপোর্ট পাঠায় —অপস্ নর্মাল !

❑ এয়ারলিফ্‌ট

চারদিকে ঘূর্ণির মতন বরফের গুঁড়ো উড়িয়ে চিতা হেলিকপ্টার দু'টি আকাশে উড়তেই কারাকোরাম লঙ্ঘন করে প্রথম সূর্যকিরণ সুবেদার বাহাদুর সিংহের পাথর-কঠিন চেহারাকে আলোকিত করে অজান্তেই। ফরোয়ার্ড বেস কমান্ডার, অ্যাডজুটেন্ট ও উপস্থিত সমস্ত সৈনিকরা পা ঠুকে রাউন্ড স্যালুট জানায় ? অসংখ্য সুই এর মতন বরফের কণারা ওদের গাল ও নাক বিদ্ধ করছে। শরীরের এই দু'টি অংশই শুধু আপাতত অসহায়। এখন তাপমান মাইনাস চল্লিশের থেকেও নীচে নেমে গেছে। দশমিনিট আগেই সে দেখেছে মাইনাস উনচল্লিশ ডিগ্রি। কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানে রোদ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আকাশে মেঘ না থাকলে এখানে তাপমান এক লাফে এক ডিগ্রি নেমে যায়।

অন্যসময় অজান্তেই সবার গ্লেসিয়ার-গ্লাভ্‌স সহ হাত উঠে আসতো নাক ও গালে। বার-বার উঠে আসতো। এখুনি সবার হয়তো উঠে আসবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ফরোয়ার্ড বেস-এর সমস্ত সৈনিক হেলিপ্যাডে সারিবদ্ধ ; কেউ-কেউ বিক্ষিপ্ত দাঁড়িয়ে স্যালুট জানাচ্ছে। প্রত্যেকের নাক দিয়ে ঘন সাদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস; সুদূরতম কোষ সমূহ থেকে এই নিঃশ্বাস; নাভিমূল থেকে এক প্রবল দুঃখবোধের তাড়নায় সমস্ত উত্তাপ নিঙড়ে বেরিয়ে আসে।

দেখতে-দেখতে হেলিকপ্টারটি দূরে — বহুদূরে সালতোরো ও কারাকোরামের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসমূহের মাঝে একটা প্রশ্নবোধকের নীচে ঝুলে থাকা বিন্দুর মতন অলোক ও সমস্ত সৈনিকের মনে ঝুলতে-ঝুলতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর আর কোনো শব্দ নেই। শুধু শো-শো হাওয়ার দাপট। সবাই ভারবাহী উটের মতন ঘপাৎ-ঘপাৎ থপ-থপ করে এগিয়ে যায় নিজস্ব গুহার দিকে। প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আঠারো হাজার ছ'শো ফিট উচ্চতার এই ফরোয়ার্ড বেসে এর চেয়ে বেশি জোরে চলার কোনো উপায় নেই। বাতাসে অক্সিজেনের স্বল্পতা আর দু'দিন ধরে তুষারপাত না-হওয়ায় জায়গায়-জায়গায় কঠিন নিরেট বরফ বেরিয়ে এসেছে। পাথরের মতন — এতে গুলিবিদ্ধ হয় না, শেল পড়লেও ফেটে চৌচির হয়ে যায়! — হায়!

জনশূন্য এই খামখেয়ালি প্রকৃতির রাক্ষুসে গতি ও শ্মশানসম স্থিতির কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুবেদার বাহাদুর সিংহ তাঁর তেত্রিশ বছর চাকরি জীবনের শেষ কয়টি দিন পৃথিবীর সর্বোচ্চ এই যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়ে গেলেন। দীর্ঘ একাত্তর দিন। একেকটা দিন এখানে একেক সপ্তাহের মতন দীর্ঘ।

আড়াই মাস ভাত খাননি, সবজি খাননি, রুটি খাননি, মাংস খাননি, এমন-কি মদও খেতে পারেননি। তার মানে এই নয় যে এই ফরোয়ার্ড বেসে এসব জিনিস দুষ্প্রাপ্য। বাহাদুর সিংহ খাননি হজম হতো না বলে। খেয়েছেন শুধু দিনে কয়েকমুঠো কাঠবাদাম, কাজু, কিশমিশ অথবা চিনেবাদাম, সঙ্গে মিল্কমেড-এর কৌটো কেটে প্রকৃতির বরফ স্টোভে গরম করে তৈরি করা দুধ।

গতকাল দুপুরে অলোক ওর গুহায় আজকের এয়ারলিফ্‌টের কমফার্মেশন দিতে গেলে জোর করে বসিয়ে দেয় । গুহার ভেতর সারিবদ্ধ জেরিক্যানের পেটে ও ফাঁকে বরফ ঢুকিয়ে তৈরি উঁচু জায়গায় দু'টি স্কোয়ার প্যারাশুট পেতে তৈরি বিছানায় বসে অলোক । সুবেদারের সহায়ক ওর নির্দেশ পেয়ে শুকনো পেঁয়াজের গুঁড়ো সামান্য গরম জলে ভিজিয়ে নিয়ে স্টোভের উপর মেসটিন বসিয়ে দেশি ঘিয়ে ভাজে । তার মধ্যে ভেজে নেয় আধকেজিটাক কাজুবাদাম।

সুবেদার ওকে বিশেষ হরিয়ানি উচ্চারণে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মিত্রসাহেব, আপনি একটা প্রশ্নের জবাব দিন, এয়ারফোর্সের ফৌজিরা আমাদের তুলনায় বেশি লেখাপড়া জানে, এই গ্লেসিয়ারের নাম সিয়াচেন কেন ? অলোক অপ্রস্তুত হেসে বলে, কী যে বলেন, লেখাপড়ার নিরিখে তুলনা না করাই ভাল, কোনো ব্যক্তির চেয়ে অন্য কেউ দু'টো ক্লাশ বেশি পড়াশুনো করে থাকতে পারে, সে তো আপনার বাড়িতেও —

— আরে-আরে ভুল বুঝবেন না, আপনিও আমার ছোটভাইয়ের মতন, আর এই শেষ দিনে যে উপকারটা করলেন, না-হলে এই বরফের পথে চারদিন ধরে কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় লিঙ্কে চলতে হতো, সে যে কী কষ্টের ! — আসলে এতে আমার কোনোই ক্রেডিট নেই । আগামীকাল দু'টি হেলিকপ্টার ড্রাই র‍্যাশান আর মেইল নিয়ে আসবেই । ব্যাকলোড বলতে তো শুধু দু'জন পেশেন্ট, হ্যাপো হয়েছে গুলজারিলাল আর চিল্ড ব্রেইন হয়েছে সুব্রহ্মনিয়মের —

— হ্যাঁ, গুলজারির ফুসফুসের রস বরফ হয়েছে, বাঁচবে কি না, কে জানে ! ডাক্তার ক্যাপ্টেনসাহেব আর নার্সিং অ্যাসিস্টেন্ট দু'জন তো পালা করে হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে সেঁক দিয়ে যাচ্ছে, মালিশ চলছে অবিরাম — কাল সকাল-সকাল চৌতালা এলে হয় ।

অলোকের হাসি পেয়ে যায় । সমস্ত হরিয়ানি সৈনিকরাই দেখছি চিতাকে চৌতালা আর এম. আই. ১৭ হেলিকপ্টারকে দেবীলাল বলে । সুবেদারের সহায়ক তামিল ছেলেটি কাজুবাদাম ভাজার উপর গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুন ছিটিয়ে রেখে দিয়ে বলে, সুব্রহ্মনিয়মের নাকটা নাকি কেটে ফেলতে হবে স্যার ? ওর আওয়াজ কাঁপে ! আধো-আধো হিন্দিতে সম্ভ্রম ও উদ্বেগ মেশানো । বাহাদুর সিংহ সেটা লক্ষ্য করেই ওর কাঁধে আলতো হাত রেখে পিতার মতন দরদী আওয়াজে বলে, — কী জানি বাবা, আমার আর ভাবতে ভাল লাগে না — ছেলেটা এত চৌকশ; এই বরফের সমুদ্রে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে ডিশ অ্যান্টেনা লাগিয়েছে — তোরা সবাই এখন ব্রিফিংরুমে গেলেই এতগুলি চ্যানেল দেখতে পাচ্ছিস — এসব করেই ছেলেটা — একটু থেমে আনমনা বাহাদুর সিংহ বলেন, — সহায়ক ছেলেটি গরম জলের টিন থেকে তুলে ওদের একটা ফ্রুটি দেয় । লেহ্‌-থয়েস বেসক্যাম্পে অনেকবারই এরকম ফ্রুটি গরম করে খেয়েছে অলোক । কিন্তু গোলমরিচ লবণ ছেটানো কাজুবাদাম এই প্রথম । সে জিজ্ঞেস করে, — সুবেদার সাহাব আপনার ছেলে-মেয়ে কজন ?

— এক ছেলে আর এক মেয়ে - ব্যাস পরিবার নিয়োজন হা - হা-হা-

—তাই ভালো, মানুষের পদভারে পৃথিবী এখন কাঁপছে ! ছেলে মেয়ে এখনও পড়াশুনো করে ?

— জি হা, মেয়েটা বারো ক্লাশ পাশ করে এবার কলেজে ভর্তি হয়েছে — ওর ঠাকুর্দা পাত্র দেখেছে, ছেলে ব্যাংকে ক্লার্ক।

—বিয়ে দিয়ে দেবেন ? আর পড়াবেন না ?

— যদি শ্বশুরবাড়ির লোকেরা রাজি থাকে, পড়াব — না হলে পড়ে লিখে আমার মেয়ে তো আর ব্যারিস্টার হবে না।

অলোক হেসে বলে, — কেমন করে জানেন, হবে না — চেষ্টা করতে দোষ কোথায় ? সুবেদার মাথা নাড়ে। ওর চোখ দু'টি টানা-টানা বড়-বড়। মোটা পাকানো গোঁফের উপর রাশভারি চেহারায় এখন শুধু একজন প্রবাসী পিতা ছাড়া আর কেউ-নেই ! পাখি হওয়া এই দৃষ্টি বড় সংক্রামক। পাশে বসে থাকা অন্য পিতারও বুক কেমন করে। অলোকের মেয়ের বয়স সবে দুই বছর-এখন অনেক কথাই বলতে পারে। আগরতলা থেকে মায়ের চিঠি, বোনের চিঠি, ভাইয়ের চিঠি আসে, সবার চিঠিতে ওকে নিয়ে কত কথা, কত গল্প, শুধু ক বর্গের উচ্চারণটা ত বর্গ দিয়ে করে ! অলোক ভাবে, আগামীকালের হেলিকপ্টারে যদি অন্তরার চিঠি আসে ! লেহ্ থেকে রেডিও টেলিফোনিতে সহকর্মীরা চিঠির খবর জানিয়েছে।

—আপনি বললেন না মিত্রসাহেব — সিয়াচেন — ছেলেটা এখন আট ক্লাশে উঠেছে, গেলেই এসব প্রশ্ন করবে — সে নাকি এয়ারফোর্সের পাইলট হবে ! ছেলের কথা বলে বাহাদুর সিংহের চোখ চকচক করে। একটু আগের উদাস পিতা আর এ মুহূর্তের গর্বিত পিতার আশান্বিত চেহারা আলাদা। অলোক হেসে বলে, সিয়াচেন একটা তিব্বতি শব্দ— যার অর্থ হলো গোলাপের বাগান।

—আসলে আকাশ থেকে এই হিমবাহের উঁচু-নিচু কালো বরফের টিলাগুলিকে গোলাপের পাপড়ির মতন দেখায় আর মাঝে-মধ্যে সাদা বরফের আস্তরণ যেন পাপড়িগুলিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে —কল্পনাটা খারাপ না — আমরা থাকি, লড়াই করি, কষ্ট পাই বলে রাক্ষুসে মনে হয়; আকাশ থেকে কিন্তু এই বিশাল অথৈ হিমবাহকে দারুণ লাগে ! বাহাদুর সিংহ হেসে বলে, তা তো বটেই, এই জন্যেই তো দু'দেশের বাবুরা আকাশ থেকে দেখে যায়, দিল্লি আর ইসলামাবাদে একের পর এক মিটিঙ করে, কোনো সুরাহা হয় না — যুদ্ধ চলতে থাকে। মরছে তো সাধারণ সৈনিক, মরছে কিষাণের সন্তান, খরচ হচ্ছে সাধারণ কিষাণের টাকা — গড়ে নাকি প্রতিদিন সাত কোটি — হায় !

অলোক বুখারির কাছে এগিয়ে বসে। হাত সেঁকে। ওরাও হাত সেঁকে। ডাবল লেয়ার কোফ্রেখ জুতোর ভেতরে পা অবশ হয়ে আসছে। অলোক ভাবে, উঠতে হবে। নিজের গুহায় ফিরে কোফ্রেখ জুতো খুলে পা-গুলি সেঁকতে হবে। এইটুকু অসাবধান হলে কোন বিপদ নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুটি টিপে ধরবে কে জানে ? তাছাড়া ভীষণ

পেচ্ছাব পেয়েছে। অনেকক্ষণ ধরেই পেয়েছে।

অথচ বাহাদুর সিংহকে আজ যেন কথায় পেয়েছে! কোনোদিন নিজের সম্পর্কে বাহাদুর সিংহকে বলতে শোনা যায় না — আজকের মতন কথা তো সে কোনোদিনই বলেনি! গম্ভীর প্রকৃতির অফিসার। অধীনস্থ সৈনিকদের সন্তানের মতন ভালোবাসেন আবার শাসনও করেন। সবাই ওকে বেশ সমঝে চলে। সামান্য ফাঁকি টের পেলে থাপ্পড় মারতেও কসুর করেন না। অ্যাডজুটেন্ট কিংবা কমান্ডার তাই ওর উপরেই সব ছেড়ে রেখেছেন। সপ্তাহখানেক আগে লিঙ্কে এসেছে ওর রিলিভার। বাহাদুর সিংহের মতন সাতফুট না-হলেও নতুন সুবেদার বেশ লম্বা-চওড়া এবং রাশভারি, বাহাদুর সিংহেরই গ্রামের ছেলে রামফল। তিনি ওদের আলোচনা শুনছেন আর মিটি মিটি হাসছেন। চুপচাপ গরম ফ্রুটি আর কাজুবাদাম খাচ্ছেন। ওর এখনো দু'বছর চাকরি বাকি। বাহাদুর সিংহের মতন অসাবধান কথা বলে নিজের ওজন খোয়াতে চান না। তার উপর এই প্রবল শৈত্য ও উচ্চতায় নিজেকে এখনো মানিয়ে উঠতে পারেননি।

অবশ্য কেউ-ই কোনোদিন সম্পূর্ণ মানিয়ে উঠতে পারে না। তবু নিজের পা দু'টিকে বিশ্বস্তভাবে সামনে-পিছনে নিয়ন্ত্রণ করা, হাত দু'টিকে বারবার নাক ও গালের সামনে নেওয়ার অভ্যাস রপ্ত করতে এখানে বেশ সময় লেগে যায়। সাধারণ জওয়ানদের কষ্ট অনেক বেশি। সময়মতন গোলা ছোঁড়া, শত্রুর গোলার জবাব দেওয়া ছাড়াও ওদের বিস্তব কাজ থাকে। ড্রপিঙ জোনে এ এন-১২ বিমান কিংবা এম আই-১৭ হেলিকপ্টার থেকে কেরোসিন, পেট্রোল ও অন্যান্য টিনফুড যা ড্রপ করে যায় সেগুলি সংগ্রহ করে গুদামজাত করা এখন হারকিউলান টাস্ক। চারজন সৈনিকের সারাদিন কেটে যায় একটা-একটা কেরোসিন কিংবা পেট্রোলের ব্যারেল ড্রপিঙ জোন থেকে টেনে হিঁচড়ে স্টোর অবধি আনতে। উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো বরফের পথ। স্নো-ট্রাক এখানে অচল, স্নো-স্কুটারও সবখানে চলে না। এই কষ্টের পর সামান্য সুযোগ পেলেই অকাতরে ঘুমোয় একেকজন। এই শৈত্যের বাধ্যবাধকতা না থাকলে কে কাজ করতে চায়! তাই কড়া ডিসিপ্লিন এবং নিয়মিত দেশাত্মবোধে প্রেবিত করা, শত্রুর প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব সামলাতে হয় প্রত্যেক সিনিয়র জে সিও-কে। ওদের মুখে এরকম কথা মানায় না। বাহাদুর সিংহের চাকরি শেষ বলে হয়তো অজান্তেই কিছু মনের কথা বেরিয়ে এসেছে।

দুই সুবেদারই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ঠিক আছে স্যার!

বাহাদুর সিংহ দরজা খুলতে এগিয়ে যায়। বাইরে প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট। ওহার দরজায় তাই ভারী স্প্রিং লাগানো। একজন বেরিয়ে টেনে না-ধরলে পরবর্তীজনের ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সুবেদার রামফল বলেন, — বাহাদুর স্যার চলে গেলে ভুলে যাবেন না, মাঝে-মধ্যে আসবেন স্যার!

—অবশ্যই, অবশ্যই ! আপনিও আসবেন, পঁচিশ-ত্রিশ কদম দূরেই তো থাকি ! অবশ্য এখানে এটই অনেক দূরত্ব !

— আমি দেখেছি, অবশ্যই যাব !

অলোক গুহার বাইরে পা রাখে । আর তখনই সালতোরোর দুই শৃঙ্গের মাঝখান দিয়ে একটা বিশাল আগুণের গোলা প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ে দশহাত সামনে । নিরেট বরফে ফেটে ছিটকে পড়ে চারপাশে । অলোকের কানের পাশ দিয়ে একটা স্প্লিন্টার পাশের বরফের টিলায় ঢুকে একটা চাঁই খুলে আনে । সুবেদার বাহাদুর সিংহ বলে, হে রাম !

তারপর অলোকের বাঁ হাতে লুটিয়ে পড়ে ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় কামানগুলি গর্জে ওঠে মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ষণে সালতোরোর শৃঙ্গগুলি কাঁপে । ঘন-ঘন বরফের ধস্ নেমে আসে । সারারাত থেমে-থেমে গোলা বর্ষণ চলতে থাকে । সারারাত নানা পাহাড়ের অজানা সব খাঁজ থেকে অদৃশ্য কাকেরা ডাকতে থাকে ক্র্যাও-ক্র্যাও-ও !

অলোকের সহকর্মী সুরিন্দর বলে, আমি বলিনি স্যার, এরা আসলে কাক নয়, এরা সব দুই দেশের সাধারণ দুঃস্থ সৈনিকের অতৃপ্ত আত্মা, বেঁচে থাকতে যারা সীমা পার করতে পারেনি; মরে গিয়েও তারা সেই সীমা খুঁজে না পেয়ে এই প্রবল শৈত্যে ওড়া-উড়ি করে । অন্যসময় একবারও ডাকেনা, শুধু অহেতুক গোলাবর্ষণের প্রতিবাদে চিৎকার করে অদ্ভুত কাটা আওয়াজে ক্র্যাও-ও-ও ক্র্যাও-ও-ও — গোলা থামাও — ক্র্যাও-ও-ও, ক্র্যাও-ও-ও—যুদ্ধ থামাও ....!

আজ সুতফুট লম্বা মানুষটির লাশ হেলিকপ্টারে ঢোকানো যাবে না জেনে একটা প্যারাশুটের স্কিডবোর্ডে শুইয়ে প্যারাশুটের স্ট্র্যাপ দিয়ে ভালমতন বেঁধে, ভারতের জাতীয় পতাকা দিয়ে মুড়ে হেলিকপ্টারের নীচে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । এক সপ্তাহের মধ্যে পরপর দু'বার এরকম এয়ারলিফ্ট করলো চিতা হেলিকপ্টারগুলি । তার চোখের জল দুগালে গড়িয়ে বরফ হয়ে যায় । অলোক নামতে-নামতে গ্লাভসের পিঠ দিয়ে গাল মোছে ।

□ তমসো মা জ্যোর্তিগময়, মৃত্যুর্মা অমৃতংগময় !

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। ঠিক কত তারিখ কে জানে! সুরিন্দর তাঁবু থেকে মুখ বের করতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাপটা মারে। গরম জল বোতলে নিয়ে বেরিয়ে কোনমতে প্রাতঃকৃত্য সেরে ফিরে আসে।

তাঁবুতে ঢুকে হাত মুখ ধুয়ে ফুটন্ত জলে মিল্কমেড আর কফিপাউডার মিশিয়ে ও অলোককে ডাকে, স্যার উঠুন, ওয়েদার বলুন, ফেয়ার — অল ক্লিয়ার — সুরিন্দরের আওয়াজে উল্লাস। কতদিন পর সে এই কাঙ্ক্ষিত রিপোর্ট দিতে পারবে! সুরিন্দর শত্রুসৈন্যের ফেলে যাওয়া টুথপেস্ট নিয়ে দাঁত মাজতে যায়। নিজেরটা ভুলে বরফের গুহায় ছেড়ে এসেছে। এ বেসে উঠে আসার পর আজ লাগাতর কুড়ি দিন আবহাওয়া খারাপ। কুড়ি দিন একবারও শত্রুর গোলা আসেনি। পাহাড়ের গা ঘেঁষে তৈরি পাকিস্তানি হেলিপ্যাডটাকে সুরিন্দর ও অলোকের পরামর্শ নিয়ে মজবুত করেছে পদাতিক সৈনিকরা। সুরিন্দরের অনুমান সঠিক হলে আজই ট্রায়াল ল্যান্ডিং হবে। তখনই নেমে আসবে ওর রিলিভার। তারপর সুরিন্দর উড়ে যাবে।

অলোক ধড়মড়িয়ে উঠে চ্যানেল অন করে। পাখির কাকলির মতন ডাকাডাকি করছে কয়েকজন সহকর্মী। সুরিন্দরের হাত থেকে গরম কফির গ্লাস নিয়ে বিশ্বাস হয় না। ভোরবেলার স্বপ্নের ছোঁয়া তখনো অলোকের সমস্ত চেতনায়। এ'কদিন একবারও চা-কফি করে খাওয়ায়নি সুরিন্দর। গতকাল রাতেও আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। মাঝরাতে একবার প্রচণ্ড হাওয়ায় জেরিক্যানের ঠোকাঠুকিতে ঘুম ভেঙেছে। এ ছাড়া আর কোন শব্দ এখানে হয় না। রাতভর একরকম নির্বিঘ্নেই ঘুমোচ্ছে ওরা এই কুড়ি দিন। এর মধ্যেই হয়তো আরো এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসবে। মাঝরাতে সারা শরীরে ঘুম নিয়ে বুঝতে পারেনি কোনদিকে হাওয়া বইছে! বোঝার চেষ্টাও করেনি। তাঁবুর ফাঁক-ফোকর দিয়ে তীব্র ঠাণ্ডা ঢুকছে। স্লিপিঙ ব্যাগের উপরের অংশ একটু ফাঁকা রেখে শুধু কোল্ড ক্রিম লেপা নাকের ডগা! ঐ একটি অঙ্গে ঠাণ্ডা লাগলেও কিছুই করার নেই।

তখন সুরিন্দরের নাক ডাকছিল। আহা ঘুম! কত প্রতিকূল পরিবেশেও ক্লান্তি ঘুম এনে দিতে পারে সৈনিককে। অলোক স্লিপিং ব্যাগের ভেতর রাকা গরম জলের বোতলটা গলার কাছে এবং দুই কানে চেপে এক-দুই-তিন-চার গুণতে-গুণতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। গুণতে-গুণতে ঘুমোনো ওর ছোটবেলার অভ্যাস।

এই সকালে জোড়া দেওয়া প্যারাশুটের ফাঁক দিয়ে সূর্যের কিরণ হঠাৎ তির্যকভাবে অলোকের জ্যাকেটে পড়ে। সুরিন্দরের উল্লাসে সাড়া দিতে গিয়ে গলাটা ফ্যাসফেসিয়ে ওঠে। দুই চুমুক কফি খেয়ে আওয়াজ বেরোনোর মতন পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেট অন্ করে ওয়েদার জানায়। সুরিন্দরের রিলিভার বেশ কিছুদিন ধরে বেসক্যাম্পে হেলিপ্যাডে প্যারেড করছে।

দ্বীপেশ মুখার্জির স্যুটকেসে অলোকের দু'টো চিঠি রয়েছে। তাছাড়া দু'টো সিজ ফায়ার সিলিন্ডার, কোর্ট অফ ইনকোয়ারির রিপোর্ট, আরো অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসছে। আহা ! কতদিন ভাত খাওয়া হয়নি ! তুষারবর্ষণ বেড়ে যাওয়ায় ওরা কেউই আজ-কাল লঙ্গরে যায় না । প্রতিপদে মৃত্যুভয় নিয়ে কত চলা যায় ! বোর্ণভিটা, মালটোভা অথবা হরলিক্স মেশানো কৌটোর দুধের সঙ্গে কয়েক মুঠো কাজু, বাদাম ও কিসমিস খেয়ে বেশ বেঁচে আছে ওরা গত কুড়ি দিন । মানুষ অভ্যাসের দাস ।

একদিন রামস্বরূপ আর সুরিন্দর থালার পেছনে পাকিস্তানিদের ছেড়ে যাওয়া খালি মদের বোতল দিয়ে ওদেরই রেখে যাওয়া আটার রুটি বেলেছিল । কিন্তু সঙ্গে তাওয়া নেই । স্টোভের আগুণে সরাসরি সেঁকে আধপোড়া রুটি খেতে বিদ্ঘুটে । সঙ্গে কেরোসিনের গন্ধ । তবু ওরা খেয়েছে । আর তারপর তিনজনেরই সেকী পেটব্যথা ! ডাইজিন চারটে করে খেয়েও সেই রুটি আর হজম হয় না । সুরিন্দর বলে, এতে নিশ্চিত বিষ মেশানো ছিল ! রামস্বরূপ ব্যথায় কেঁদে ফেলে । সেই থেকে ওরা প্রতিজ্ঞা করে আর কোনদিন এরকম খাবে না । এই ঠাণ্ডায় পেটখারাপ হয়ে বারবার প্যান্ট খোলার মতন শাস্তি আর কিছু নেই । ওরা ড্রাই-ফুডেই ভাল আছে ।

জোর করে হলেও হাসে । বরফ কাটে হাঁপাতে-হাঁপাতে । শরীরের জোর ক্রমহ্রাসমান তা টের পাওয়া যায় বরফ কাটার সময় । আট-দশবার আইস এক্স চালিয়ে মাথা ঘোরে । মিনি জেনারেটর চালু করতে পঞ্চাশ-ষাট কখনো দেড়শো - দুশো ঝটকায় দড়ি টানতে হয় । পালা করে টেনেও দম বেরিয়ে যেতে চায় । দাড়ি গোঁফে বরফ জমে ভারি । আলো জ্বললে স্টোভের পাশে আধঘন্টা বসে ফোঁসফোঁস করলে তবেই বরফ গলে হালকা হয় ।

বেসক্যাম্প থেকে চিতা হেলিকপ্টার ওড়ার খবর পেয়ে দু'জনেই জ্যাকেট-ট্রাউজার কোফ্ল্যাখে ভারি হয়ে হেলিপ্যাডে যায় । টালমাটাল এবড়ো-খেবড়ো বরফের পথ । সুরিন্দরের বেডিং দু'জনে হাত পাল্টে-পাল্টে নেয় । বড়জোর পাঁচ কে. জি. ওজন হবে । এখানে মনে হচ্ছে পঞ্চাশ কে. জি. । হেলিপ্যাডে অনেক সৈনিক । তিন-তিন জন মৃত্যুপথযাত্রী । এতদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় নানা পোস্টে মারা গেছে মোট নয়জন । প্রত্যেকেরই হ্যাপো — হাই অলটিটিউড পালমোনারি ওডেমা । দু'টো মৃতদেহ এখানে এসেছে । বাকিদের সারাদিনে আনা হবে । হেলিকপ্টারে মৃত্যুপথযাত্রীদেরই টপ প্রায়োরিটি দেওয়া হয়। মৃতদের জন্যে এত তাড়া নেই । রামস্বরূপ বলে, ওরা তো পাখিই হয়ে গেছে !

দ্বীপেশকে নামিয়ে হেলিকপ্টার দু'জন পেশেন্টকে নিয়ে যায় । দ্বিতীয় হেলিকপ্টারে অন্য পেশেন্টের পাশে উঠে বসে সুরিন্দর । অন্যখানে বিদায় জানাতে সৈনিকরা একটা ফিল্মিগীত গেয়ে থাকে, যানে ওয়ালে হো সকে তো লোট্কে আনা.... ! এখানে এরকম কেউ ভাবে না । সুরিন্দর হাত নাড়ে । হাত নেড়ে বিদায় জানায় রামস্বরূপ, দ্বীপেশ আর অলোক। ট্রায়াল ল্যান্ডিং -এর সফলতায় পাইলটরা হাত নাড়ে । টাইগার ও সমস্ত সৈনিকরা হাত নেড়ে

অভিনন্দন জানায় । অলোক দেখে, মৃতদেহ দু'টিও হাত নাড়ছে । সঙ্গে-সঙ্গে গ্লাভ্‌সে চোখ কচলায় ও । ভাল করে তাকিয়ে দেখে মৃত দুই সৈনিকের হাতে বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে চারটে কাক । এরকম দৃশ্য অভিনব । ওদের পাখার রঙ আর মৃতদের জ্যাকেটের রঙ একই রকম।

হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে তাঁবুতে পৌঁছে স্টোভ জ্বালিয়ে অলোক বোর্ণভিটা বানায় । তারপর দ্বীপেশের আনা কোর্ট অফ ইনকোয়ারি রিপোর্ট খুলে পড়ে । ইনকোয়ারি টিমের পক্ষ থেকে কমান্ডিং অফিসারকে পাঠানো রিপোর্টের কপি এটি । রিপোর্ট অনুযায়ী (১) সৈনিকদের অন্যমনস্কতাই আগুণ লাগার মূলে । সৈনিকদের আরো সতর্ক থাকা উচিত । (২) তাঁবুতে উন্নত একটা করে জেনারেল ফায়ার এক্সটিংগুইসার থাকা উচিত । অলোকের হাসি পায় । এক্সটিংগুইসার দিয়ে বাইরে আগুণ নেভানো যাবে । কিন্তু ভেতরের আগুণ ? শীতল হিমবাহে সৈনিকরা কত ধরণের আগুণে পোড়ে, কেউ তার খবর রাখে কি ? দহণ কি মানুষকে অসর্তক করবে না ? ভাবতে-ভাবতে মন কেমন করে ওর !

বাড়ির চিঠি পড়ে, পারিবারিক গল্প করে দুপুর ও বিকেল কাটে । বিকেলে আকাশ আবার ঢেকে যায় । কতদিনের জন্যে কে জানে ! দিনের আলো থাকতে থাকতেই বরফ কাটার কাজটা সারতে হবে ভেবে টিন হাতে বেরিয়ে পড়ে ।

দুই টিন বরফ ভরতেই আলোকের শরীর এই মাইনাস বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমানে ঘেমে একসার । এখানে অবশ্য তাঁবু খুব কাছে । এভাবে বরফ কেটেই তৈরি হয় বরফের গুহা । এক মাস আগে শত্রুসৈন্যদের ব্যবহৃত প্লাস্টিকের কৌটো, মগ, স্টোভও ওবা ব্যবহার করে । ওদের জমানো কেরোসিন-পেট্রল এখনো চলছে । দুই টিন একসঙ্গে বয়ে আনতে বেশ কষ্ট । প্রতি দুই কদমে একবার করে জিরিয়ে টিন দু'টি নিয়ে তাঁবুতে ফেরে অলোক । টিন রেখে প্রথমেই ও নিজের তেলচিটে গামছাটা নিয়ে চেনের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুক পিঠ বগল ও উরুসন্ধি মোছে । না হলে এক্ষুণি ঘাম বরফ হয়ে আক্রমণ করবে । বুকের পাঁজরে আঙুলের ছোঁয়া লাগলে হারমোনিয়মের রিডের মতন সারেগামা হয় । রামস্বরূপের সাহায্যে জেনারেটর চালিয়ে দ্বীপেশের আনা নতুন একশো ওয়াট বাল্বের আলোয় স্লিপিং ব্যাগের উপর ওরই আনা চাল-ডাল নিয়ে পাথর-কাঁকর বাছে । বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা-লঙ্কা কুচিকুচি করে কেটে নেয় একটা থালায় । কতদিন পর সব্জি খাবে অলোক! বিবর্ণপ্রায় বাঁধাকপির পাতাগুলি রঙিন করে তোলে ওকে । প্রেশার কুকারে ঘি ঢেলেই অন্তরার কথা মনে পড়ে । তিনরকম স্বাদের খিচুড়ি রাঁধতে পারে অন্তরা ।

আজ তাপমান আরো নেমে গেছে । ইংরেজি বছরের শেষ দিন । মাইনাস আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস । সর্বোচ্চ তাপমান মাঝ দুপুরে প্রখর রোদে মাইনাস বত্রিশ ডিগ্রি ছিল । দ্বীপেশের আনা টেলিপ্রিন্টারের রাফ কাগজে শব্দজব্দ খেলতে-খেলতে খিদেটা হঠাৎ ভীষণরকম চাড়া দেয় । কতদিন ভালমতন খায়নি ওরা । অলোক দুধ গরম করে মালটোভা মিশিয়ে আনে। রেডিও টেলিফোনি সেট অন্ করা আছে । দু'জনেই চুমুক-চুমুক খেতে

থাকে। এত গরম যে জিহ্বা জ্বলে যায় । তবু ভাল লাগে । হাতে উত্তাপ ভাল লাগে । ভেতরটা উষ্ণ হয় । ওরা বর্ষশেষের অনুষ্ঠান শোনে । জনপ্রিয় সব হিন্দি গান । অলোক ভাবে, বেঁচে থাকলে আগামী-বছর এমন দিনে আমি অন্তরার পাশে থাকবো কোন পীস্ স্টেশানে ! তোড়াকে কোলে নিয়ে বসে কোন থিয়েটারে বসে প্রোগ্রাম দেখবো ।

ঘড়ঘড়-ভজভজ-ঘজঘজ আওয়াজে চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে যায় । জীবনের দীর্ঘতম বছরটি পেরিয়ে যাচ্ছে । এমনি আরো এক বছর পর ডিসেম্বরে বদলি হবে । ততদিনে যুদ্ধ থামবে কিনা কে জানে ! ঘজঘজ ধরণের শব্দটা নতুন বছরের গানগুলিকে ঢেকে দিচ্ছে । খারাপ আবহাওয়ার জন্যেই হয়তো এই আওয়াজ ।

যাদের জন্যে ওরা লড়ছে অথবা যাদের বিরুদ্ধে; কেউ ভালমতন জানে না, কী যুদ্ধ চলছে ! কেমন আছে ওরা — কেউ খবর রাখে না । অভিমানে গলা বুঁজে আসে । দ্বীপেশ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে — কী পারলে না তো ?

অলোক সম্বিত ফিরে পায় । শুধু একটি ঘর খালি । অলোক কিছুতেই সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারছে না । সে দ্বীপেশের দিকে তাকায় । দ্বীপেশ হাসে, খুব ভালো লাগে ওর হাসি । এ কয়দিনে চোখগুলি কোটরে ঢুকেছে । দাড়ি বাড়ছে । বাইরে হাওয়ার তাণ্ডব চলছে। জেরিক্যানের ঠোকাঠুকি দ্রুতলয়ে । দ্বীপেশ বলে, তোমাকে বললাম— একটা শব্দ মানব সভ্যতার প্রয়োজনে, অন্যটা ভারতীয় ক্লাসিক্যাল মিউজিকের— পারলে না তো ? দেখ. বৌদিকেও দেখতে পাবে এখন । দ্বীপেশ তিন আঙুল অলা ডান হাত দিয়ে লেখে A! অলোক হেসে ফেলে ! দু'টি শব্দ এভাবে ভাবেই নি ও ! একদিকে হয়ে যায় PEACE আর অন্য দিকে হয়ে যায় ANTARA !

এমনি পুলকিত সময়ে হঠাৎ প্রচণ্ড হাওয়ায় স্কিড বোর্ডের দরজা হা হয়ে যায় । রাশি-রাশি বরফ তীক্ষ্ণ সূচের ঝাঁকের মতন চোখ-মুখে গেঁথে যায় । স্লিপিং ব্যাগে, বিছানায় জমা হয় দুধের গুঁড়োর মতন । স্টোভ বুঁজে যায় । দ্বীপেশ তাড়াতাড়ি স্টোভের হাওয়া খুলে দেয়। না হলে স্লিপিং ব্যাগের উপর রাখা কাঠের ফাট্টা কেরোসিনের বন্যা হবে । একক্ষণ যা ছিল বুখারি এখন তা-ই হয়ে পড়বে মরণ ফাঁদ । অলোক তাড়াতাড়ি জুতো গলিয়ে দরজা স্কিড্‌বোর্ড টেনে বরফের ঝড়থেকে তাঁবুর ভেতরটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে । কিন্তু পারেনা। কী প্রচণ্ড ঝড় ! দ্বীপেশ উঠে গিয়ে দু'টো জেরিক্যান ঠেস্ দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে । জেনারেটর ঘটঘট আওয়াজ করে থেমে যায় । অন্ধকার । পেছনে প্রচণ্ড হাওয়ার চাপ । দু'জনেই দরজার সামনে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে স্কিড্ বোর্ডে পিঠ ঠেকিয়ে । এত পোষাক পরেও ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে ওরা ।

দ্বীপেশ কাঁপতে-কাঁপতে জিজ্ঞেস করে বাইরে এখন তাপমান কত হবে ?

— মাইনাস পঞ্চাশ বা একান্ন ! আর. টি. সেটে নতুন বছরের গান হচ্ছে । অলোক পা দিয়ে টেনে টেনে স্টোভটাকে কাছে আনে । বাইরে দুমদাম শব্দ । হয়তো স্টোর উড়ে গেল

অথবা লঙ্গর উল্টে গেল। হাওয়ার গতিবেগ কত হবে ? উইন্ড চিল ফ্যাক্টর মাপার যন্ত্র সব বাইরে। সেগুলিও হাওয়ায় উপড়ে নিয়েছে কিনা কে জানে !

ঠাণ্ডা ধমনীতে ঢুকছে। ঠকঠকি থেকে শূন্যতা। ধীরে হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল, কানের লতি ও নাকের ডগা অসাড় হয়ে পড়ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে জিহ্বা, শুকনো তালু, শুকিয়ে যাচ্ছে গলা। দু'জনে মিলে চেষ্টা করেও স্টোভ জ্বালাতে পারছেনা। দেশলাই ঘষে-ঘষে ওরা ব্যর্থ ! তাহলে কি অক্সিজেন শেষ ? ওরা কেমন করে বেঁচে আছে ? দ্বীপেশ কেঁদে ফেলে, আর বোধ হয় বেঁচে ফিরবো না ! ওর গলা বুঁজে আসে। প্রাণপণে জুতোর ভেতর আঙুল নাড়ে। দু'জনে একই স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে দ্বিতীয় ব্যাগটা ওপরে চাপায়। জোরে-জোরে শ্বাস নেয়। পরস্পরকে জড়িয়ে গালে-গাল ঘষে। দ্বীপেশ অনেক কষ্টে বলে, আমাকে বৌদি ভাবো, আদর করো, তাহলে হয়তো —

ওরা বেঁচে আছে কি ? অলোক নিজেকে চিমটি কাটে। দ্বীপেশ ওর প্যান্টে হাত ঢুকিয়ে উরুসন্ধিতে আঙুল চালায়। তারপর পাগলের মতন বিড়বিড় করে, আদর করো মিত্রদা — এই বর্তমান, সুপ্রিম কমান্ডার — এই বু-খা-রি — ওর আওয়াজ ভাঙা ! ও গালে চুমু খায়। অলোকের হাতে দ্বীপেশের নেতিয়ে পড়া শরীরে মৃদু স্পন্দন। এখন বুঝতে পারে শেষ মুহূর্তে কুমায়ুনি বীরেরা জড়াজড়ি করে ছিল কেন ? ঐ দৃশ্য ভাবতেই শিউরে ওঠে অলোক। দ্বীপেশের কানে চুমু খেয়ে বলে, উষ্ণ হও — আমার বুখারি — গরম হও — !

মনে হয় ওর ঠোঁট লাগলো পালকে। শুকনো খসখসে। দ্বীপেশ কি তবে পাখি হয়ে পড়ছে ? অলোকেরও এখনই উড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। বড় বেশি ভারি হয়ে পড়েছে এই সৈনিক জীবন !

স্যাটেলাইট মনিটর থেকে নানা অ্যাঙ্গেলের ভিশন ভি.ডি.ও স্ক্রিনে দেখছে তাবড়-তাবড় সব রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাধ্যক্ষরা। হঠাৎ আবার পর্দায় ঝিরিঝিরি তুষারপাত ! ওদের মধ্যে একজন নিজের বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতে ঘুষি মেরে আফশোস করে, নেচারকে আমরা এখনো ওভারকাম করতে পারলাম না !

কম্পিউটর হঠাৎ দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলতে শুরু করে, হে মহারাজ ! এইরূপে উভয়পক্ষে দেবাসুর সংগ্রামতুল্য ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহস্র-সহস্র পরাক্রান্ত বীর — নিহত ... করিশুণ্ডাকার ছিন্নবাহু সকল, লিঙ্গ সকল, মহাবেগে কখন উদ্বেষ্টন ও কখন বিচেষ্টন করিতে লাগিল ... জীবিত যোধগণ শোনিতলিপ্ত কলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ — শাট আপ ! রাগে চিৎকার করে ওঠে অপারেটর। সমস্ত সাবস্ক্রাইবার সেনানায়কদের স্ক্রিনে তখন সরাসরি আনফিল্টারড স্যাটেলাইট ভিশন ফিড করে। কম্পিউটার বিড়বিড় করতে থাকে। এফ. এম. স্পিকারে শোনা যায় রুষ্ট কণ্ঠ, কী হলো ? ওন্‌লি ক্লাউডস্ আর ভিসিবল! স্যাটেলাইট ভিশন অ্যাঙ্গেল পাল্টাও —

— রজার স্যার ! তখুনি স্ক্রিণে শুধু সাদা-বরফের বুকে কালো-কালো কিছু দেখা যায়। অপারেটর আবার সিগন্যাল ফিল্টার ব্যবহার করে । হাবিজাবি সব তো আর হিজ হাইনেসকে ফিড করা যায় না । তক্ষুণি এক অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পায় অপারেটর । আবার দুই যুযুধান পক্ষের কামানগুলি গর্জাচ্ছে । এক্ষুণি অনেক রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখা যাবে । মনে-মনে খুশি হয় সে । পাশাপাশি একটা দুঃশ্চিন্তা দানা বাঁধে মনে । ভিশন ক্লিয়ার হলে কম্পিউটর খুলে দেখতে হবে— । কিসের জন্যে খানিক আগে সাবোতাজ !

ততক্ষণে বিন্দুগুলি বড় হয়েছে আরো । অপারেটর ভুরু কোঁচকায় । এত লো ফ্লাইং, এত কম স্পিড— কী ওগুলো ? মাইগ্রেটিং বার্ড ? যতদূর জানে ঐ পয়েন্টে এ সময় মাইগ্রেটিং বার্ডদের যাওয়ার কথা না । ও তখন থ্রি. ডি. অন করে । তাড়াতাড়ি আবার সাবস্ক্রাইবারদের কানেক্ট করার আগেই ক্যাও-ক্যাও, কুলুর-কুলুর অদ্ভুত ডাক শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে অপারেটর । তখুনি মনিটরের স্ক্রিন ভেদ করে কাকের মতন এক ঝাঁক পাখি অপারেশনস রুমে ঢুকে পড়ে ।ওদের ডানার ঝাপটায় চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে অপারেটর । চোখ-মুখে অন্ধকার দেখে । চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ও রিমোট কন্ট্রোল অপারেশান রুমের সাবজিরো টেম্পারেচারকে ক্রমে চারিদিকের হিটিস্ ব্লোয়ারে গরম করতে শুরু করলে এক সময় থ্রি. ডি. এফেক্ট ভ্যানিশ হয়ে যায় । অবাক হয়ে সে নিজেকেই বলে, হাউ দিজ সুপার-ন্যাচারাল বার্ডস অ্যাপিয়ারড ? স্যাটেলাইটের ভিশন অ্যাঙ্গেল বারবার পাল্টে কারেন্ট পিক্চারের জন্যে অপেক্ষা করছে সুপ্রিম কমান্ডাররা ।

অপেক্ষায় দিন গুণছে অন্তরা ও যুযুধান দুইপক্ষের অসংখ্য সৈনিকের স্ত্রী-রা । অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে মায়েরা— কবে তাদের সন্তান ঘরে ফিরবে !

অবচেতনে তলিয়ে যেতে-যেতে অলোক হঠাৎ অনুভব করে মৃদু উষ্ণতা । কিসের উত্তাপ ? ধীরে-ধীরে যা দূর করে দিচ্ছে সমস্ত অস্বস্তি । আরো উত্তাপ বাড়লে ও চোখ মেলে দেখে জলে ভাসছে । আশে-পাশে দ্বীপেশ নেই । আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে । মনে হচ্ছে, হিমবাহ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে এক বিশাল বুখারি । নিমেষে শুষে নিয়েছে তুষারঝড়। উত্তাপে গলিয়ে দিয়েছে বরফ । কারাকোরাম সালতোরোর উচ্চতা ছাপিয়ে বিশাল বুখারির নল আকাশ ভেদ করেছে । মনে হয়, কত সহস্র বছর পর হিমবাহগুলি গলছে । সমুদ্র হয়ে পড়ছে । বিশাল-বিশাল ঢেউ ভাসিয়ে দিয়েছে ফরোয়ার্ড বেস ও সমস্ত সৈনিকদের । জলোচ্ছ্বাস ছুঁয়েছে সমস্ত অবজারভেশান পোস্ট ।

দু'দেশের সৈনিকরা অকূলে ভাসছে । কে বা ভারতীয়, কে-ই-বা পাকিস্তানি ! মানুষ প্রাণপণ সাঁতরে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চাইছে । ভাসতে-ভাসতে ওরা দেখছে, কিছুক্ষণ আগে যেখানে ছিল যুদ্ধক্ষেত্র, চরম শীতল হিমবাহ, সেখানে এবং দূরদূরান্তের জল উত্তাপে

বাষ্প হয়ে দ্রুত ঢেকে দিচ্ছে আকাশ। কোন তারা দেখা যাচ্ছে না।

ওরা তখন অনেক দূরে মহাকালের স্রোতে শ্যাওলার মতন ভাসছে। সভ্যতার কোন হদিশ এ মুহূর্তে অলোকের জানা নেই।